বাজনা ক'রে, আলো ক'রে, পুতুল নাচ করে, খুব জাকজমকে যায়, তখন মনে হয়, আমার এমনি বর হবে। তার পর কালবৈশাখে ঝড় ওঠে, সব আঁধার হয়ে যায়, আমরা তখন মার আঁচোলের কাছে, দুয়ো-সুয়োর গল্প শুনতে শুনতে, ঘুমিয়ে পড়ি, যখন দুদিন পরে বিয়ে হয়, শুভদৃষ্টির সময়, কজন সেই সন্ধ্যার পুতুল খেলতে খেলতে বর দেখার মত, সোন্দর মুখখানি দেখ্‌তে পায় বোন্! বল! যা আমরা ভাবি, তাই কি আর হয়? আমাদের আশা সাধ সব ওই রকমের। তবে কেন আমরা অমন ক'রে থাকি, যা আমাদের জোটে, তাই ভাল। ভগবান্ আছে, সর্ব্বশুচি অগ্নি আছে, আমরা কেমন ক'রে তাঁদের ফেল্‌ব, ফেল্‌তে পারি কি?

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী সর্ব্ব-সুখ-মোক্ষ-দাতা

আমাদের আবার সুখ-দুঃখ কি? যার ধ্যানেই মোক্ষ! যে হাতে তুলে নিয়েছে, তারই সুখ দুঃখ, আমাদের আবার মন কি —যার মনে আমি, যার বাইরে আমি, বার ও ভেতর সবই তার।

'তাতে আমাতে চিতে স্বতন্তরী নই'

তোকে এ সব কথা লিখ্‌তে আজ আমার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে। মেয়ে মানুষে কি তার দেবতা বুঝে না। তাকে কি এ আবার শেখাতে হয়। যার কাছ দিয়ে হাওয়া চলে গেলে বোঝা যায়, সে কে! সে ত জন্মাবার আগে থেকে ঠিক হয়ে থাকে, লক্ষ্মী বোন্ আমার! মনটা ভাল কর, মনকে নিজের বশে আন, সেই মন কুড়িয়ে স্বামীর পায়ে ফেলে দে, সব শান্তি হবে। তখনত' আর দুঃখু কাকে বলে, তাও জান্‌বি নি।

তোকে আর কতই বোঝাব, মেয়েমানুষ চোখের তাকানিতে বুঝে ফেলে। তাকে কি আর সব কথা রচে দিতে হয়। আপনার বড় আপনার বলেই তোকে গালাগালি করি, খুব বকি, রাগ হয়, তার পর কান্না আসে, সব বাঁধ ভেঙে যায়, শুধু ভাবি, আমার মায়ার কি হ'ল। অথচ ভেবে কোন ফলই হ'ল না।...

কাকার অসুখের সময়, যখন আমরা ওয়ালটেয়ারে ছিলাম, তখন যখন তোকে কমলের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেখেছি, তখন কি অত ভেবেছি। তখন ঠাকুরঝিতে ও আমাতে কত হেসেছি, তখন কত রকমই মনে হ'ত, কত সাধই হ'ত, তখন কি অত ভেবেছিলুম যে, আমাদের সে হাসি এখন কান্নায় দাঁড়াবে। সব বদল হয়ে গেল, কাকা নগেনকে বেশী পছন্দ কর্‌লে, তাতে কি ঠিক মানুষের হাত

ছিল আর তুই ত তখন বড় হয়েছিলি, তখন কেন আমায় ভেঙে বল্লিনি। আমার মনে কত সন্দেহ হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলাম, হেসে চলে গেলি, তখন বল্‌লি "দিদি! কি যে বল, তার ঠিক নেই, যাও, ভাল লাগে না"—যেটা এত ভাল লাগার জিনিস, সেটা ভাল লাগে, এ কথাটা বল্‌তে তখন এত কি বাধা ছিল। এখন কেবল বুক চাপ্‌ড়ে মর্‌বে। কেন? তখন বল্‌লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত? এখন ত' তা হ'লে এ মহাভারত র'চা হত না। না, মেয়ে মানুষে সব পারে, কেবল প্রাণের কথা চিরকাল লুকিয়ে রাখ্‌বে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌বে, পুড়ে মর্‌বে, সমস্ত জীবন ধ'রে জ্বলে জ্বলে ছাই হবে, সব ছারখার কর্‌বে, তবু গোড়ায় তাকে বদ্‌লাবার কোন চেষ্টাই কর্‌বে না। সে যেন গরীবের সোনার কৌটোর চাবি-কাটিটার মত প্রতিপদে ভয়ে ত্রস্তে নিজের আঁচোলে গেরো দিচ্ছে। সব পারে, কেবল ওই কথাটা ব'লে ফেল্‌তেই যত বাধা। আমাদের হায়! সবই অমনি। মুখ ফুটেও ফোটে না। মায়া! তখন যদি একবার আমায় আভাসে বল্‌তিস্‌, তবে আর এমন হ'ত না। আমায় এখন দোষী কর্‌লে কি হবে বল। মানুষে কি সব বুঝে গড়ে নিতে পারে, তবে আর ভগবানের দরকার কি ছিল? কি আর বল্‌ব, তোর কথা ভাবি, আর চোখ ফেটে জল আসে। ইচ্ছা করে··· তোর গলা ধ'রে খুব খানিক কাঁদি, আয় দুজনে কাঁদ্‌তে বসি, আর তো আমাদের কোন বল নেই, কিছু ত কর্‌তে পার্‌ব না, শুধু কাঁদ্‌তে পার্‌ব, তবু কেঁদে যদি কতক ভার নামিয়ে দিতে পারি···কিন্তু যখন সংসারের দিকে তাকাই, তখন ভাবি না, সে কি হয়, আমরা জন্মেছি মা হয়ে, জন্মেছি সবার মঙ্গলের জন্যে—দুঃখে যদি চোখের জল পড়ে, তবে সে সংসারের অমঙ্গল হবে। না বোন্ আমাদের সব সইতে হবে, সংসারের জন্যেই আমরা। সে কি আর অত ক'রে নষ্ট কর্‌লে চলে। আমরা যে সংসারের মা!

সে দিন তোদের বাড়ীর ব্যাপার শুনে আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি। নগেন নাকি কমলকে গালাগালি করেছিল। ছিঃ ছিঃ! এ সব কি? কমলকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—বলে হেসে চলে গেল। "ও নগার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওটা পাগল।" বল্‌ছিল আজ জমিদারীতে যেতে হবে। এমনি রোগা হয়ে গেছে, আর মুখখানা যেন কালিপানা হয়ে গেছে। সবই আমাদের অদৃষ্ট। নইলে ঘর বর আর কি মন্দ হয়েছিল!

আজ 'বিষবৃক্ষ' থিয়েটার হবে, যাবি? ও বল্‌ছিল যাবে। বিকাল বেলা তবে গাড়ী পাঠিয়ে দেব···না তোর গাড়ীতেই আস্‌বি। ঠাকুরঝি ত আর আস্‌বে না—তিনি তাঁর ঠাকুরের শেতল হয়ে গেলেও ত আস্‌তে পারেন। আসিস্,

লক্ষ্মীটি,—না, আমি আর তোকে ঝাঁটা মার্‌তে চাইব না, আসিস্‌ লক্ষ্মীটি! অমরও যাবে ব'লে পাঠিয়েছে।

(হারু মাষ্টার—রজনী)

তারিফ আছে তোমার রজনী দা, তারিফ্‌…বেসক্‌! কি আর বল্‌ব। খুব বাধিয়েছ, এখন টেঁকাতে পার তবেই। আমি এখানে ঠিক বাগিয়েছি। দেখ, মামলা বাধান চাই, যাতে দুদিকেই কিছু বেরোয়…আর আমাদেরি সে বুঝ্‌লে কি না "স্বকার্য্যম্ উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ, দারৈরপি ধনৈরপি"…বুঝ্‌লে রজনী দা। রজনী দা, তোমার নামটি বেশ, তুমি যে ঘোর অমানিশা, তার কোন সন্দেহই নাই। অন্ধকার না হলে কাজ ভাল হয় না, ওই জন্যে প্যাঁচাকে আমি বড় ভালবাসি, ওইত লক্ষ্মীর বাহন। দেখ, ও কমলবাবু ত যাচ্ছে, এই সময়ে যদি বিশেষ রকমে গোল বাধাতে পার, তবেই ত বলি বাহাদুর! রজনী দা, তুমি একবার চট্‌ ক'রে কলকাতায় রাতারাতি আস্‌তে পার? কি জান…সেখানকার হাল খবর একটু সমঝে চল্‌তে হবে। কমলবাবু যখন নিজে আসরে নেবেছে, জান্‌বে, তখন সহজে কাউকে ছাড়্‌ছে না। তায় লেখাপড়া-জানা লোক। এক কাজ কর। দুটো চারটে সরাও, তার পর চাপাও, নইলে ত আর গতিক দেখি নে। হ্যাঁ দেখ, তোমার সেই থাকিবেটীর জ্বালায় দাদা, বুঝ্‌লে কি না বাসায় ত দাদা টেঁকা দায়। আমায় যেন কর্ত্তাভজার চাঁই পেয়েছে। কেবলই বেটী ধম্মের ডাক্‌ ডাকে। বলি যত এই কাজটা কর, ততই বলে, 'মা গো, মান-সম্ভ্রম নেই, ইজ্জতের ভয় কর না, ধম্মভয় নেই'…হ্যা! হ্যা! বেটী যেন ধম্মকে আঁচলে গেরো দিয়েছে। আবার তুমিও নাকি বল্‌ছ ধম্মভয় ত আছে, আরে দাদা! ভয় কর্‌লেই বুঝ্‌লে কি না ধর্ম্ম ঘাড়ে চাপে, ও ত জানাই আছে। আর মান-সম্ভ্রম ও ত রাস্তার ঠিকরে, দুটো কুড়োলেই হ'ল। বলি আমার যে এই বিধি, এই কাল বেগুণে রঙ, খোঁচা চুল, গিরগিটির ঠ্যাঙের মত দুখানা পা, এই পেঁচার মত চোখ দিয়ে পাঠিয়েছ, যে দেখে সেই বলে 'মা গো কি বিটকেল্‌।' কেন বাবা, একটু ছিঁটে-ফোঁটা কুসুমফুলের রঙ্‌ দিলে কি তার ক্ষতিটা হ'ত। না, যখন সবাই এমন বলে, আমিও ঠিক তেমনি ক'রে যাব। নচ্ছারমীর চূড়ান্ত কর্‌ব। লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌ব। ওই সর্ব্বনাশ করাতেই আমার আনন্দ। ওই আমি চাই, ওই আমার ধাতে বনে।…হা হা!

দেখ, কেউ এই জন্ম থেকে আমায় পছন্দ কর্‌লে না। যারা সোন্দর, তারা কেমন প্রেম কর্‌ছে, লোকে কত তাদের আদর কর্‌ছে, কিন্তু আমি বাবা কি, যদি কার পেছনে যাই, কিছু বলি' ত অমনি নাক সিঁট্‌কে ফস্‌কে চলে যায়।

আর সোন্দরের বেলা হাসি ঢলে গড়িয়ে পড়ে···কেন এই রকম হয়? আমার বেলা এ কেন? আমি দেখ্‌ছি, আমায় যে গড়েছে সেই আমার সর্ব্বনাশ করেছে, কেন না, সেই এই কুগড়ন গড়ে, দশমাস পূর্ণ হবার আগেই আমারে এই জগতে পাঠিয়েছে। এই দেখ না, আমার একটা পা বড়, একটা পা ছোট —একটা টেড়া আর একটা বাঁকা, তা যখন আমি সোন্দর নই, তখন সোন্দরের মত কাজ কেন কর্‌ব, আমি আমার মত কাজই কর্‌ব। কি বল রজনী দা, ওই হেনার বাড়ীর কুকুরটাও আমায় দেখ্‌লে চেঁচিয়ে ওঠে। হ্যা! হ্যা ও ঠিক, আমিও তেমনি কর্‌ব। ও সব পীরিত টীরিত আমার ভাল লাগে না···সর্ব্বনাশেই মজা। কেমন দেখতে আর হাস্‌তে,···অমনি হাস্‌ব। রজনী, তুমি যদি আমার সহায় হও, আমি তোমায় দাওয়ানী দেবই। আমার ও সব কাজ দরকার নেই। ও ধম্মে আমার বাতিক বৃদ্ধি হয়। যা বল্লুম, সব খুব গোপনে চাল্‌তে হবে। বুঝ্‌লে কি না? আবার ওই হেনা বেটী কি বলে জান···বলে, মানুষ এমন বিটকেল্ চেহারা জন্মায়, এ আমার ধারণাই ছিল না, আশ্চর্য্য, আমার কুকুরটা, কাকেও কিছু বলে না, ওকে দেখ্‌লেই ঘেউ ঘেউ করে।" আমিও আছি তাগে তাগে, ও সোন্দর হেনার মাথাও খাব এক দিন। তখন বুঝ্‌বে কেমন হারু মাষ্টার। দেখ রজনী দা, তুমি হলে প্রাণের ইয়ার, তাই তোমায় এ সব বল্‌লুম·· কি জান, এ দুনিয়ার এ সব বারঝাঁকাগুলো আমার একেবারেই ভাল লাগে না। বাবুটি যেমন সরল সোজা, আমি তেমনি ঘুণ, বিরল, এমন···সাজিয়েছি যে সর্ব্বনাশ হতেই হবে। এতেই আমার বড় আনন্দ। মোদ্দা তুমি রজনী দা বাইতে ছেড় না···আমি ঠিক আগুন দিয়েছি! জ্বলতেই হবে, পুড়তেই হবে···

(হেনা—যূঁই)

ভাই গোলাপী!

তোর ওখান থেকে এসে শুনলুম, বাবু এসেছিল, একটুও বসেনি, তখনি চলে গেছে। তুই সে দিন বল্‌ছিলি না যে···"নগেন তোকে সত্যি ভালবাসে, তোর জন্যে মরে, ওর কি কোথাও যাবার রাস্তা রেখেছিস্।" হুঁ···এই আজ পাঁচ দিন আসেনি। ওলো সবাই মরে লো···সবাই মরে, কত বা আবার সমরণে যায়। দূর্ দূর্···তুই যেমন, ওদের সবই ওই রকম। আমার এখান থেকে গিয়ে হীরের বাড়ী সমস্ত রাত আড্ডা দিয়েছে। আচ্ছা, তুই বল্, এতে রাগ হয় কি না? আর সে মুখপুড়ীকে ত তুই জানিস্। তার চিরকালই ওর ওপর টাঁক। সাধ ক'রে কি আর আমরাও অমন হই। কখন একটাতে চুপ ক'রে থাক্‌বে না। ওরাই ত আমাদের শেখায়

…আবার আমাদের ওপর রাগ করে। আর ওই হারু মাষ্টার আছে—ওই উনুনমুখো—বলেছে 'কি বাবু আপনার হেনা, একবার হীরের গান শুনুন, দেখ্‌বেন, এক একখানা চোখঘোরানির দাম লাকটাকা।' রজনীটা এসেছিল, সেই বল্‌লে। মড়া যে তার পর থেকে এ দিকে আসেনি, নইলে এবার এলে থেংরে বিষ ঝেড়ে দেব। ওই জন্তেই ত হতভাগাদের দেখ্‌তে পারি নি। আহাম্মকের রকম দেখেছিস্, গান আর চোখ্ ঘোরাণ হ'ল সমান তুলনা, আ মরি…আর কি! সত্যি কথা বল্‌তে কি গোলাপী, আমার আর ওকে ভাল লাগ্‌ছে না। কি বাপু, সমস্ত রাতই নাচ সমস্ত রাতই গান…আর নয়ত সমস্ত রাতই 'মণি! মণি! মণি!' হ্যাঁ, দেখ্‌না ভাই, গা জ্বালা করে—ভালবাসেন তবে আর কি—মাথা কিনেছেন…আর কি? ঘরে মাগ রাখিস্ কেন? মাকে সেদিন বল্লুম—মা বল্লে কি—'তুই ভারি নেমকহারাম, তোকে ঘর ক'রে দিলে, বাড়ী ক'রে দিলে, জুড়ি ক'রে দিলে, মোটর ক'রে দিলে, সোনা জহরৎ হীরে মতি পান্নায় মুক্তোয় মুড়ে দিলে, অমন চাঁদপানা ছেলে, অত রূপ, তোর তাতেও মন ওঠে না। তোর যা খুসি করগে যা—ওর ভাইকে যে তোর এত দরদ, সে দেবপুত্তুর—সে যদি তোর কাছে না আসে, কিছুতেই আর তোর মন ওঠে না। সে ভাল মানুষের ছেলে যদি তোর কাছে না আসে—যত অন্যায় অনাছিষ্টি তাই—যা রয় সয়, তাই ভাল। ওলো চুলোমুখি তুই কি মনে করিস্—সব ছেলেই নষ্ট? তা নয় লো আবাগী তা নয়।'—আমার এমন রাগ হ'ল। সে দিন ওস্তাদ এল, রাগে তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি! আমার আর ও সব ভাল লাগ্‌ছে না। চুলোয় যাক্ গে। আমি অমন ঢের দেখেছি।…

কাল রাত্তিরে আমি নিজে সন্ধ্যার পর ওর বাড়ী গিয়েছিলাম—দেখি, ওপরে নিজের বৈঠকখানায় বসে বসে মদ খাচ্ছে—আমি যেতেই যেন কত তটস্থ। হারু মাষ্টার দেখি আজকাল আর সঙ্গ ছাড়ে না, সেও মদ ঢাল্‌ছে—আমি যেতেই অঙ্গভঙ্গী ক'রে বল্‌লে, 'আয়াহি বরদে দেবি!—এমন না হলে টান, বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া—বন্ধু, তোমার প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল বন্ধু।' আমি তার সঙ্গে সে দিন আর কথা কই নি। তার পর সে কত কাঁদুনি, শুনে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার যো—শুধু তাকে অনেক কায়দায় চেপে রেখেছিলুম। একবার মনে হয়েছিল, সত্যিই বুঝি ভালবাসে, আমি যখন গিয়েছিলুম, সেই সময় তার সেই কে বন্ধুদাদা না কি…কমল এসেছিল, যেই দরজার গোড়ায় এসেছে—হারু মাষ্টার ত গেলাস ফেলে ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠ্‌ল—আর বাবু টল্‌তে টল্‌তে এ্যাঁ—এ্যাঁ ক'রে উঠ্‌ল। কমল খানিকটা দাঁড়িয়ে সবারি দিকে এমন তাকালে যেন জ্বল জ্বল করে উঠ্‌ল। আমার বুকের ভেতর পর্য্যন্ত গুর্ গুর্ ক'রে উঠ্‌ল। ভয়ে, লজ্জায় যেন আমার

চোখ বুজে গেল, আমি ঠিক বুঝ্তে পার্লাম না, সমস্ত শরীরে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্ল, সমস্ত শরীর কেঁপে মাথার ভেতর পর্য্যন্ত কেমন-কর্তে লাগ্ল। আমার ইচ্ছে হলো, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই। হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল, কেন অমন মনে হ'ল, তা জানি না। তার পর দেখি চলে গেছে। ওদিকে হারু মাষ্টার চাদরটা মাথায় না বেঁধে—সেই বিট্‌কেলে স্থুরে গান ধ'রে দিলে—

"এসেছিল ময়না পাখী,
চলে গেল—গয়না পরে"

ওত নেশার ওপরে খুব হেসে উঠ্ল—আমি তাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলাম, তার বাড়ীর ভেতরের ঘরের দিকে। সেই ঘরে কমলের একখানা ছবি রয়েছে—আমায় বল্লে, 'হাথ মণি! স্থন্দরী গেছেন তাঁর বোনের সঙ্গে থিয়েটার দেখ্তে—এসে রাত্রিতে যখন দেখ্বে, তখন খুব মজা হবে এখন।' আমি কিন্তু তাতে বড় রাজী ছিলুম না, গোড়াতেই মনে হয়েছিল, আজ মজা বড় স্থবিধের নয়···কিন্তু ভাই দেখ্, যত সেই ছবিখানার দিকে তাকাই, ততই যেন বুকের ভেতর কেমন কর্তে লাগ্ল—কি সোন্দর আর কি জোয়ান। শুনেছি, এখন বিয়ে হয় নি। দেখ্ গোলাপী, তুই ঠিক বলেছিস্, যাদের মাগ নেই, তাদের কাছে থাকাই ভাল···তারা তবু একটু দরদ করে। এই জন্যেই একে আরো দেখ্তে পারিনে।—কি সোন্দর, মাইরি দেখ্লেই যেন ভালবাস্তে ইচ্ছা করে। উঃ, কি চেটাল বুক, আর কেমন লম্বা—কি থাক থাক শতানে চুল আর টক্‌টকে গোলাপের আভায় রং যেন ফেটে পড়্ছে। মাইরি, তোকে আর কি বল্‌ব।—এ পাখী যদি না ধর্তে পারি, তবে মিছেই পাখী পোষার সাধ। এ পাখীর ঠোঁটে ঠোঁট না মিলালে বৃথাই জন্ম।—মার যেমন কেবল টাকা, টাকা, টাকা, কেন্ না, এ রাস্তায় এসেছি—বলে কি মন প্রাণ সব ভাসিয়ে দিতে হবে নাকি? এসেছি স্থখের জন্যে, যাতে স্থখ হয়, তাই কর্‌ব। টাকায় কি স্থখ হয়? ওঃ, একে যদি না পাই—উঃ, আমি··· আমি···বিষ খাব, জলে ঝাঁপ দেব, যেমন ক'রে পারি, তাকে আমি চাইই চাই।···

আর দেখ্, ওর গিন্নীটে রাত্তিরে যখন থিয়েটার থেকে ফির্লে, রাত তখন ছটো বেজে গেছে। মাগী ভাই সত্যি বল্‌তে কি···আশ্চর্য্য স্থন্দরী; আমাকে তোরা স্থন্দরী স্থন্দরী করিস্, আমি তার পায়ের কাছেও দাঁড়াবার যুগ্যি নই। সত্যি ভাই, আমি অমন চোখ কখন দেখিনি—সে যদি পুরুষ হত ত তোর আমার মত কত অপ্সরী তার ধূলোয় লুটোবার জন্তে প্রাণ দিত। চোখের উপর চোখ পড়্লে প্রাণটা যেন ছাঁৎ ক'রে ক'রে ওঠে। উঃ বাবা, আমি মেয়ে মানুষ

তাই, আমারি এমনি হয়—না জানি পুরুষের কি হয়। ইচ্ছে করে চোখের উপর চোখ রেখে সব ভুলে যাই। উঃ, কি চোখ! এমন মাগ ছেড়ে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াতে ভালও লাগে। কিন্তু মাগী বড় ঝাঁঝালো—আমায় যে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করেছিল, আমি ত পালাবার পথ পাইনে। ঝাঁটার দাগ একদিন তুল্‌ব। নইলে ঠাণ্ডা হবে না।

অসুখ বিসুখ সব মিথ্যে—ও সব ন্যাকামি ন্যাকামি, আমায় সে দিন দেখ্‌তে পাননি ব'লে—তাই শয্যা নিয়েছিলেন, বিরহে···কাঁদুনি কত, 'আমি ভালবাসিনি'—'এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না'—হেসে মরি গোলাপী—হেসে মরি—পুরুষ দেখ্‌তে না পেলে শয্যা নেয়। এই কথাগুলো শুন্‌লে···আমার আপাদমস্তক জ্বালা করে। সবাই ভালবাসে—যে আসে, সেই বলে ভালবাসি—ঠিক যেন তোতা পাখী—মুটেও ভালবাসে, মেথরও ভালবাসে, রাজপুত্তুরও ভালবাসে! জ্বালাতন। আমাদের নষ্ট ওরাই করেছে—ন ধর্ম্মায় ন দেবায়···না মানুষায়—আমাদের কি ক'রে রেখেছে বল্ দেখি। আমাদের আবার ভালবাসে! দূর্, দূর্!

বল্‌ছে ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে যাবে—এইবার ওকে ঠিক ছাড়্‌বার পথ হবে। আমার আর ওকে ভাল লাগ্‌ছে না। ইতি— তোরই হেনা।

(ইন্দু—মায়া)

দেখ্ মায়া, আমি সে দিন তোকে যা বল্লুম, তাই ঠিক, তোর সঙ্গে আমার মতের মিল হ'ল না। অমরও তাই বলে—তোর মত·· ছেলে মানুষ কি না। তুই যে রাত্তিরে সেই গাড়ীতে বল্‌লি—যে কুন্দর মরা খুব সুন্দর, হাঁ তোর ও কুন্দ কুঁদ-ফুলেরই মত, তার যতটুকু প্রাণ, সেইটুকুই তার দান। সূর্য্যমুখী তার সমস্ত প্রাণটা দেবার রাস্তা খুঁজেছিল—তবু সে পারে নি—পাছে কাঁটা ফোটে, সেজন্যে বুক পেতে দিতে পারেন, তবু আর কাউকে স্বামী কি দেওয়া যায়···যদি বা দেওয়া যায়, তবে তা কি চোখের সামনে, তা দেখে থাকা যায় গা···আমার স্বামীটিকে যদি আর একজন বুকে ক'রে নেয়, ···এই অবধি তার দৌড় তিনি আর সইতে পার্‌লেন না—অমনি এক কাপড়ে বেরিয়ে গেলেন, আমি না গেলে স্বামী সুখী হবেন না। তা ত নয়, সতীনের স্বামীর সুখ আমি চোখে দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুই যে কুন্দকে এত ভাল কেন বল্‌লি—আমি ত কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমি বাপু সোজাসুজি বুঝি ও কমলমণিই শিরোমণি—এমন না হলে বাঙলার মেয়ে, দুবার কাঁদ্‌লে, দুবার ঝগড়া কর্‌লে, একবার চোখ ঘোরালে, সবাইকে আদর কর্‌লে, সবাইকে আপনার কর্‌লে, যে যেখানে আছে, সবাই কমল কমল কর্‌লে, সাপ যে সাপ হীরে সেও মাথা নীচু ক'রে রইল, এই ত বাঙলার

মেয়ে, তা নয় ; ফুল লতা পাতা, দীর্ঘ নিশ্বেস, বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না···এ দিকে সব যায়···দেখ্ ছুঁড়ি, ও সব আমার ভাল লাগে না। তোর যেমন নবেলী বুদ্ধি, তেমনি তোর ভাল লাগ্‌ল। ওর সঙ্গে রাত্তিরে—মহা ঝগড়া, সে বলে সূর্য্যমুখীই ভাল, আমি বল্লুম, আমাদের সুখোর মাও তার স্বামীর ছেলে হয়নি ব'লে এবার একটা বিয়ে দিচ্ছ্‌ল—সেও যা, সূর্য্যমুখীও তাই। কেন নিজে হাতে বরণডালা সাজালেন, উলু দিলেন, তার পর আবার পালিয়ে গেলেন কেন—সতীনের সুখটুকু আর চোখে দেখ্‌তে পার্‌লেন না। স্বামী যদি দশটা বিয়ে করে, তা তোর কি, স্বামীর ঘর ছেড়ে যাবার অধিকার কি? তাকে না ব'লে কোন কাজ কর্‌বার অধিকার কার? যাদের স্বামীর কথা ছাড়া মর্‌বার অধিকার নেই, তারা আবার নিজের বুদ্ধি চালায়! আমি বাপু তাকে ভাল বল্‌তে পারি নি। বরণডালা···তোরা বল্‌বি, বরণডালা যখন সূর্য্যমুখী সাজিয়েছিল···তখন সে তার চিতাই সাজাচ্ছিল—মনে মনে মর্‌বার কল্পনাই করেছিল—কখন নয়,—সব মেয়ে-গুলোই স্বার্থপর। ও বল্লে—না···সূর্য্যমুখীই সব চেয়ে ভাল—আমি বল্লাম, হ্যাঁ, সূর্য্যমুখী ফুলটা ভাল—ও মাগীটা নয় ;—তোমার ওকালতি এখানে চল্‌বে না—এ সব আমাদের রাজত্ব, এখানে তোমার ও নথি নিয়ে এস না, তুমি মাগ ত্যাগের মামলা কর গে—তুমি এর কি বোঝ? তখন একেবারে চুপ। তার পর বল্‌লে—দেখ ইন্দু! মানুষের সব সুখ পাওয়া এক রকম আর দুঃখ আর এক রকম—সকলে দুঃখ সইতে পারে না। কে বল্‌বে যদি তোমার সংসারে আজ কোন বিপদ্ ঘটে, দুঃখ পাও, তুমি কি সে সইবে, দেখ্‌দিকনি আমি কেন দুঃখ পাব? অতশত বোঝ্‌বার সময় নেই—যা হবে তা হবে। আর ওই যত নষ্টের মূলই ওই কুন্দ, তুই ভাল বল্‌লে আমি কিছুই শুনব না। বিয়ে করাটা বেশ ভাল লাগে আর ঝড় ঝাপটের বেলা, আমি মরব, আমি মর্‌ব রব পড়ে যায়, যখন কাজললতা মাথায় দিয়ে, বাসর-ঘরে আড়ে আড়ে—চাঁদপানা মুখের পানে তাকাও—তখন ত মনে থাকে না—নিত্যি আকাশে চাঁদ থাকে না। তখন মনে কর, আহা, দিদিরা কি কর্‌ছে, মানুষকে কি এমন করে গা, কানমলা, নাকমলা, তার পর আরো কত কি তখন—বেশ দয়া হয় ; আর নিজে যখন কান মল্‌তে পাও না, তখনই অমনি আমি মর্‌ব! দূর, তুই ছুঁড়ি যেমন, তোর সঙ্গে চিরকাল আমার ওই জন্যে ঝগড়া। সব মেয়েগুলোই একলা রাজিত্বি কর্ত্তে চায়। আমিও ভালবাসিনি—মাগো একলা নাকি কার ঘর চলে। ওরা যা করে করুক, তোর আমার তা দেখ্‌-বার দরকার কি? আমি যদি চুপ ক'রে থাকি, তাকে আপনিই একদিন বুঝ্‌তে হবে। আর তার শক্তি কি যে সে নড়ে। তা ত নয়, গোড়া থেকেই কেবল স্বার্থের গেরো দিতে সুরু কর্‌বে—শেষ স্বার্থও থাকে না, আসলও থাকে না, বাঙালীর মেয়েগুলোর মত এমন বোকা মেয়ে আর কোথায় আছে, আমার ত মনে হয় না। নিজেদের ঘর

সামলাতে পারে না, আবার এত। তোর যেমন বুদ্ধি—আবার বলেন চলবে কিসে, আমরা না হ'লে।···মরণ আর কি!

চুলোয় যাক্ গে—হ্যাঁরে, সে রাত্তিরে নগেন ছিল,—ঝগড়া-টগড়া করে নি'ত। উনি বল্‌ছিলেন—নগেনকে ডাক্তারেরা হাওয়া বদল করতে বলেছে—ও নাকি ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে। তা তুই এক কাজ কর্—সঙ্গে যা—তা হলেই পেত্নীর হাত থেকে এড়ান পাবে। আমার কথা শোন্, নিজে বল্, যে, আমি যাব। আর না হয়, বলিস্ যদি ত আমি নিজে না হয় তাকে বলি। তুই দিনরাত যদি অমনি ক'রে বেড়াস্, তা হ'লে, আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব···আর আমি মাথা খুঁড়ে মলেই বা তোর কি বল্, বরং সেই উকীল মিন্সেরই অনেক মুস্কিল। থাক্···মাথা না হয় নাই খুঁড়্‌লাম, তুই এক কাজ কর্···যা ক'রে হয় নগেনের সঙ্গে চল্। সেখানে গিয়ে খুব কবিত্ব করবি এখন। আমিয়ো মিহিরকে নিয়ে যাই। আর ওর কথা···ও ওর আইনের নথি আর খানা নিয়ে থাকুক। আমরা বেড়িয়ে আসি। নগেনেরও মন ফিরে যাবে, আমাদেরও বেড়ান হবে। আজই তা হ'লে ঠিক কর্···আমি গোছাতে আরম্ভ ক'রে দিই। দু দিন ত একটা ঝগড়া পাকাতে হবে···নইলে সেখানে গিয়ে ভাত বেশী ক'রে খাব কি ক'রে? বেশ মজা হবে এখন, চল্ আমরা বেড়াতে যাই। আর তোরও খুব কাব্যের ফোয়ারা উঠ্‌বে এখন।

কমলের নাকি আবার শুন্‌ছিলাম, জমিদারীতে যেতে হবে···কি জমি নিয়ে গোল বেধেছে—ভাল ফ্যাঁচাং আর কি? বিষয়টা ভাগ হয়েও নিষ্কৃতি নেই···দিন-রাতই মামলা বেধে আছে।···আমার স্নেহ নিস্···আর ঠাকুরঝিকে আমার প্রণাম দিস্। ইতি

তোর স্নেহের

ইন্দু দিদি

(রজনীকাণ্ড—নগেন)

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়

প্রবল-প্রতাপেষু—

ধর্ম্ম-অবতারেষু,

আপনার আশীর্ব্বাদ ও হুকুম কড়ারে যেরূপ ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিবার, সেইরূপই করিয়াছি। এখানকার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। রাইয়তরা কেহই বাকী খাজনার সঙ্গে চাঁদা দিতে স্বীকার হয় না। সবাই কয়···চাঁদা দিব কিসের লেগে? চর লইয়া যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়···তখনই বাঁশখালির পথে সাঁকো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। সকল রাইয়ত বলে, আমরা কমল বাবুরে খাজনা দিব,তোমারে দিব না। মাজিষ্টর সাবের সঙ্গে কমল বাবু স্বয়ং এখানে আসিয়াছিলেন। সইবের কানে অনেক কান-কথা লাগাইয়াছেন। পয়াণ সর্দ্দারের দুইটা লোক একেবারে জখম, পয়াণের আশা নাই। পুলিসের

ভালমানবী খরচ অনেক হইয়াছে···তারা···এখানকার রাইয়তরা···আমলারা সকলেই আমাদের হাতে। সদরের দুই জন জরিপওয়ালা কমলবাবুর হইয়া কি সাক্ষী দিয়াছে যে, ওই চর ও জমি আমাদের হিস্তার ও নক্সার মধ্যে পড়ে নাই। তাহাদের একেবারে নিকাশ করিলে সুবিধা হবার কথা। গোকুল গাঙ্গুলীর সেই ব্রহ্মোত্তর জন্য পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দিতেছিল···বামনরে সায়েস্তা থানায় আচ্ছা করিয়া কশা হইয়াছে। হুজুর ধর্ম্মাবতারের নামে একেবারে যা-তা-বকাবকিগুলি আমাদের প্রাণে সয় না। রাইতদের ধর্ম্মঘট করাইয়াছে···নূতন মহাল একেবারে বিদ্রোহী···কাচারী লুট করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। ফসল এবার খুব হইয়াছে—এরা কেবল টাকা দিবার চায় না। কমলবাবুর দাওয়ান নাকি বলিয়াছেন—রজনী দত্তকে জেল দিবই। হুজুর মা বাপ্—আপনার জন্য জান কবুল করিয়াছি। হুজুর বিচারক ইতি প্রণাম—

অনুগত—

শ্রীরজনীকান্ত দত্ত।

(মায়া—ইন্দু)

দোহাই ইন্দুদিদি! আমি তোমার কাছে যাব···আমি আর পারি না। আর এক দণ্ডও এখানে টেঁক্‌তে পার্‌ব না···এ বাড়ী আমার নরক ব'লে মনে হচ্ছে। ইন্দুদিদি! তুমি কি বল, বাড়ীতে বেশ্যা আস্‌বে আর আমি চুপ ক'রে তাই দেখ্‌ব। এ কে সইতে পারে বল। সে রাত্রে থিয়েটার থেকে ফের্‌বার সময় তুমি বল্‌লে···'ওলো, তোর ঘরে আলো জ্বল্‌ছে···আহা, বেচারা তোর জন্যে···জেগে ব'সে আছে।' ঠিক্‌ আমার জন্যেই সে জেগে বসেছিল। দোহাই, আমি আর এখানে থাকৃতে পার্‌ব না। সেই বেশ্যা মাগী আমার বাড়ীতে···আর আমি তাই ব'সে ব'সে দেখ্‌ব, আর চুপ ক'রে থাক্‌ব। তোমরা বল এই স্বামীকে ভক্তি কর্‌তে···আমাকে অপমান কর্‌বার জন্যে···যার এই সব কাজ। আমার সমস্ত জীবনে আমি এত বড় আঘাত কখন পাইনি। এতদুর নির্লজ্জ আমার দেবমন্দিরে কুকুরে উচ্ছিষ্ট নিয়ে এল···সেই জায়গায় আমি থাক্‌ব। না, কখন নয়। দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নিয়ে যাও। আর যে এত সইতে··· পারি না···এই তার অসুখ, এরি জন্যে তোমরা আমায় দুষ্‌ছিলে···এরই জন্যে এত করা, এর চেয়ে যে ম'রে যাওয়া ভাল ছিল। ছিঃ ছিঃ! এ মুখ কোথায় লুকোব গো—কোন্‌ অন্ধকারে আমি এ যাতনাকে চেপে রাখ্‌ব। উঃ, কোথায়, কোথায় গেলে এ লজ্জা, এ জ্বালা জুড়োতে পাব।

হায়! আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ কোথায় তুলে রেখেছিল। জন্ম থেকেই কি দুঃখ···এ দুঃখের ওর নেই! মা কেমন, তা ভাল ক'রে জান্‌তে পেলাম না।

বাপ ছিল·· অমন দেবতার মত বাপ, সেও চলে গেল, আপনার যারা সত্যি ছিল, তারা সবাই চলে গেল। সংসারে যার সঙ্গে বিয়ে হ'ল, ভুলই হক আর ঠিকই হক···সে একটা পশু বল্‌লেই হয়। আপনার ব'লে একটু আহা বলে, এমন সুজনও দেখি না···না পিতৃকুল, না মাতৃকুল···না শ্বশুর-কুল···এক শুধু তুমি,···আর একজন না···না···সেও আমায় ফেলে দিয়েছে, সে শুখ্‌নো ফুলে ত পথের ধূলোয় ফেলে দিয়েছে। আমায় নিয়ে যা দিদি, নইলে আমি ম'রে যাব। দিদি, দিদি, এত শীগ্‌গির এত কষ্টে, এত লাঞ্ছনায়, বৃথায় ম'রে যাব, আমায় নিয়ে যা দিদি, নইলে সত্যিই আমি ম'বে যাব। না হ'লে যেখানে দুচোখ যায়, সেইখানে চ'লে যাব। মরার কথা মনে হ'লে কেমন যেন কি ক'রে ওঠে।

কাল রাত্রে তুমি কত তর্ক করলে, আমি বল্লাম, কখন নয়, ও নিশ্চয় কুশী ভুলে আলো জেলে রেখে গেছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি, আমারই খাটের ওপর আমার সেই গুণধর মর্ত্ত্যের দেবতা যাকে তোমরা স্বামী বল তিনি, আর তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাথা থেকে পা অবধি ফুলের সাজে সেজে, দুজনে বুঝ্‌তেই পাচ্ছ কি অবস্থায় রয়েছেন। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, কোণটায় একগাছা ঝাঁটা ছিল, সেই ঝাঁটার বাড়ী মাগীর পিঠে আমি ঘাকতক বসিয়ে দিয়েছি···আশ্চর্য্য, এত বড় বেহায়া মাগী, ঝাঁটা খেয়ে হাস্‌লে···হাস্‌তে হাস্‌তে সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌ল, বল্‌লে 'কি···কি করলে বোন্‌, সতীনের ঝালটা আমার ওপরই ঝাড়্‌লে···আর কার ওপর হ'ল না। আমায় ছুঁলে তুমিই কি বাকী থাক্‌বে।' তোমাদের নগেন বল্লে···'তোমার কি, আমার বাড়ী···আমি যা খুসি করব।' আমি বল্লাম···'তুমি এখুনি আমার সাম্‌নে থেকে দূর হও···এখুনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও'···তখন সেই মাগী তার হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল। যাবার সময় বল্‌লে···'কি করব ভাই···আমাদের এই পেশা···তা তোমার মত যদি সোন্দর হতাম···আরো কত হ'ত।' সেই সময় বড়দি ও বাড়ী থেকে গোলমাল শুনে এসে পড়েছিলেন,—তাঁকে দেখে তাড়াতাড়ি দুজনে পালান···কেবল নীচে বল্‌ছিল "আমাকে অপমান করাবার জন্যে তোমার এই কাজ, যাও, তোমার আর আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে না," তার পর কি বল্‌লে, শুন্‌তে পেলাম না। বড়দি দরোয়ানগুলোকে ভয়ানক বক্‌লে—তারা ত ভয়ে তটস্থ; কেবল বলে 'ক্যা করে রাণীজি—এ বাবু মহারাজ ত রোজই এয়সাই করতা হায় ত হাম্‌ লোককা কোন্‌ কসুর,' তার পর বড়দি আমাকে নিয়ে ও বাড়ীতে চ'লে গেলেন। দিদি! আমি মলুম না কেন, মলুম না কেন, আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হও, আমি তাতে প্রবেশ করি। আর আমার এ পৃথিবীতে থাক্-

বার সাধ যেন মরে গেছে। কি যেন্না, কি লাঞ্ছনা, মা গো!···দিদি! আমায় ব'লে দাও, আমি কি কর্‌ব। আমার ভিতরে যেন আগ্নেয়-গিরির দাহন···বাইরে ধোঁয়ায় মেঘের অন্ধকার, আবার দিনরাত বজ্রপতনের জ্বালা, দেহ পুড়ে যাচ্ছে, মন পুড়ে যাচ্ছে, তবু চেতনা রয়েছে। একি জ্বালা! এক একবার যখন ঘুম আসে, সমস্ত দিনের ভাবনা অশান্তি যেন মিলিয়ে আসে, মনে হয় যেন এ ঘুম আর না ভাঙ্গে··· তা হয় না, রাত্রে তাই স্বপন্ দেখি, চম্‌কে উঠি, কেঁদে ফেলি। হায়, ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই···একি কম দুঃখ! যখন দুঃস্বপ্নের ভোর হয়, সমস্ত শরীর যেন অলস, অবশ হয়ে আসে। এ জীবন্মৃত দেহে আর প্রাণকে বহন কর্‌তে পারি না। রোজই দেখি, সূয্যি ওঠে···ডুবে যায়, সমস্ত আকাশ ঘুরে ওই কোথায় ডুবে যায়, রোজই দেখি সপ্তর্ষি ধ্রুবতারা চারিদিকে ঘুরে···সারাদিনই কাক ডাক্‌ছে, সারা নিশিই পেঁচা ডাক্‌ছে···সেই কোন্ অজ্ঞাত দেশে আপনার ঘরে চলে যায়, আবার আসে, সমস্তই একের পর আর এক আসে আবার চ'লে যায়, আমার কিন্তু কেবলই রাত, চাঁদের আলোয়ও অমানিশার মত আঁধার···এমন ক'রে আর কত দিন জীবন বইব বল। আমায় যেন মাটী পোড়ানর আগুনে ঘিরেছে। দূর থেকে লোকে দেখ্‌তে পায় না—যেখানটায় মাটী পোড়ে, সেখানে এসে দাঁড়ালে তাপে ছাই হয়ে যায়। এ পোড়া মাটীর তপ্ত তাপ আর বুঝি কখন নিভ্‌বে না। হায়! কে সে এ যাতনার সৃষ্টি করেছে—কে সে যে মেয়েদের বুকে এমন ক'রে ভালবাসার আগুন জেলে তাদের জন্মের মত পুড়িয়ে, দিবারাত্রি দাহনে দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। সে কি নির্দ্দয়, কি নিষ্ঠুর! উঃ! যে এত যাতনা সৃষ্টি করেছে—তাকেও আমার মত এমনি যাতনা ভোগ কর্‌তে হবে···হবেই হবে।

সুখোর মা বল্‌ছিল, কমলকে এ জমিদারীর মামলার পর নাকি কে ইট ছুঁড়ে মেরেছিল—হায়! যে ভাল হয়, সকলের ভাল চায়, তারেই বুঝি সব সইতে হয়। শুন্‌লাম, জমিদারী থেকে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে না গেছে—তোমরা বারণ কর্‌লে না কেন—তোমরা তাকে কেন এখন একলা অমন ক'রে বেড়াতে যেতে দিলে, একে তার শরীর খারাপ, তার উপর আবার এই বিষয়ভাগের পর মনের অশান্তি। সে দিন বড়দির কাছে কাঁদ্‌ছিল, খাবার সময়—"শেষটা নগা আমায় পর কর্‌লে—এ আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নি, যে আমি না হ'লে ঘুমতো না, যে আমি না হ'লে যেত না···আমি না হ'লে বেড়াত না···সে কি হয়ে গেল। যাক্, আমাকে পর কর্‌লেও আমি ত পর হই না, কিন্তু ওর কি হোল, আর এর পর কি যে হবে, তা জানি না। যাক্ গে, বৌদি, তুমি কিছু বল না,

এখন ওর মানুষের বুদ্ধি চ'লে গেছে, ওকে কিছু না বলাই ভাল।" কেন তাকে যেতে দিলে, তুমি বারণ করলে না কেন, তুমি বারণ করলে সে যেত না। দিদি! আমাদের দুজনের মত দুঃখী আর নেই, সে আমার চেয়েও বুঝি বা আরও বেশী···আমাদের সব থেকে, আমরা সব থেকেই তফাৎ···সে বড় দুঃখী, কিন্তু সে বড় নিষ্ঠুর! বড় নিদয়···তাকে দেখ্‌তে না পাওয়ায় আমার যা দুঃখ, আমাকে দেখ্‌তে না পাওয়ায় তার আরো হাজার গুণ দুঃখ বুঝি তাকে ভোগ করতে হয়। তবু হিমালয় পর্ব্বতের মত বরফে আচ্ছন্ন হয়ে চিরকাল নীরব হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ দিদি, তোমরা জান তার ঠিকানা, সে কোথায় গেছে? কেন গেল, আমার জন্যে বাড়ী ছেড়েছিল, আমার জন্যে সংসারের সমস্ত সুখভোগের স্পৃহা ত্যাগ করেছিল, আমার জন্যে শেষ দেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে। উঃ, কি নিষ্ঠুর! কি করেই না সে আমার ওপর শোধ নিচ্ছে। কোথায় গেছে জান? জান দিদি! এ সব আমার ওপর নিচ্ছে। না, আর তোমাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করব না, থাক্‌তে পারি নি। যত আমার এই মূর্ত্তিমান্ মর্ত্ত্যদেবতার দিকে তাকাই, ততই আমার কমলকে মনে পড়ে, ততই মনের ভেতর আগেকার সকল কথা জাগে···প্রাণ তারই ছবি দেখ্‌তে, সেই কথা কইতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কমল যখন সেবার ওয়ালটেয়ারে সিংহাচল পাহাড়ে মন্দির দেখ্‌তে উঠেছিল, তোমার মনে পড়ে, তুমি, আমি আর কমল, আর বড়দি সেই একাদশীর উপোস ক'রে সেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; আমি খানিক উঠেই হাঁপিয়ে গেলাম, বসে পড়্‌লাম, তুমি ত তিনবার বসে ঝরণার জল ফল-টল খেলে···আমরা উঠ্‌তে লাগ্‌লাম, খানিক পরে আর পারলাম না, আমাদের অবস্থা দেখে বড়দি হাস্‌তে লাগ্‌ল, কমল কত সঙ্কোচের সঙ্গে 'ত্বাইত' 'ত্বাইত' করতে লাগ্‌ল। আঠারশ সিঁড়ির যখন চারশ বাকী, তখন আর আমার পা চল্‌ল না, যেন হাঁপ ধরে ধরে দম বন্ধ হয়ে গেল, শেষ চোখে কানে কিছু দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পেলাম না। মাথাটা যেন কেমন ক'রে উঠ্‌ল, একেবারে সেই পাথরের সিঁড়িতে পড়ে গেলাম, যখন পড়ে গেলাম, তখন যে কি হ'ল, তা জানি না; তার পর দেখি, পায়ের মোজার কাছটা কেটে গেছে, রক্ত পড়্‌ছে, একটা ন্যাকড়া ভেজা জড়ান···উঠ্‌তে গেলাম, পা মচ্‌কে যেতে লাগ্‌ল, কমল তখন তাড়াতাড়ি বুকে ক'রে তুলে নিলে, আমার লজ্জা করতে লাগ্‌ল, কিন্তু তার একটু লজ্জা হ'ল না, সেই চারশ সিঁড়ি ভেঙে যখন মন্দির-দ্বারে নিয়ে গেল, তোমাদের হাসি ও আমার লজ্জার মাঝখানে তোমরা কমলের মুখ দেখেছিলে। সেই আরক্ত ক্লান্ত শ্রমভারে একটুখানি নত অথচ ভালবাসা ও স্নেহে দীপ্ত মুখখানা ভাল ক'রে দেখেছিলে, দেখ্‌লে আজ এঃ হ'তে দিতে না।

আমার বুকের ভিতর কি রকম করছিল জান, আমি এখন ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারব না, তবু মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত শরীরের রোমাঞ্চের মধ্যে দিয়ে কমলের বুকের ভিতর আমার হৃৎপিণ্ড যেন মিশিয়ে যাচ্ছিল, বুকের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর মিলিয়ে যাওয়ার কি সুখ···আর সেই বুকে থেকে পড়ে যাওয়ার কি দুঃখ। যখন আমরা ফিরে এলাম, তুমি আমায় কত ঠাট্টা কর্‌তে লাগ্‌লে। বড়দি বল্‌লে "এইবার তোর বেশ বর জুটেছে লো···বেশ কাঁদে কাঁদে ক'রে নিয়ে বেড়াবে।" আমি তখন উর্দ্ধমুখে মনে মনে প্রার্থনা কর্‌তাম, হে ঠাকুর, তাই যেন হয়। মন্দিরের সেই সব পাহাড় কেটে অমন চমৎকার খোদিত কাজ, আর সেই সব ফুল লতা পাতা, আস্ত পাহাড় কেটে থামের গায়ে কত বিচিত্র লতাপাতার মিলন··কত জীবজন্তুর মিলন, কত রকমের সেই কারুকার্য্য ও সেই মন্দিরের দেবতা ···এ সব দেখে শুনে ও কমলের মুখে তার ব্যাথা শুনে মনে কি যেন অপূর্ব্ব ভাব আস্‌ছিল, অতীতের সেই গৌরবের যুগের মাঝখানে যেন আমরা চলে গেলাম, মনে হ'ল, এই আমাদের নৃসিংহ দেবতা···আমার যে পুতুল পূজা ভুল শিক্ষা ব'লে বাবার কাছে শিখেছিলুম, সে সব ভুলে গিয়ে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মাথা নুইয়ে এল, মনে হ'ল, যেন আমরা এ যুগেরই নই। জানি না, সে পূজো সেই দেবতাকে কি আমার কমলকে, এখন মনে কমলকেই···দেবতা ত সেখানে উপলক্ষ্য। আমার কমলের কাছে দেবতাও ছোট।

আর একদিন নৌকা ক'রে যখন আমরা তীর হ'তে সমুদ্রের প্রায় এক মাইল দূরে চলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে···সেই আমাদের বোটের উপর দিয়ে গেল, আমি ভয়ে কমলকে আঁকড়ে ধ'রে ফেল্‌লাম, জলটা যখন চ'লে গেল, তোমরা তোমাদের বোট থেকে আমাদের দুর্দ্দশা দেখে খুব হেসে ফেলেছিলে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মাঝিরা কূলের দিকে তখন নৌকা ভিড়াচ্ছিল। দূরে আকাশ ও সমুদ্রের জল দিগন্তের রেখায় রেখায় মিলিয়ে গেছে···সবই আকাশ, সবই জল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অশ্রান্ত শব্দের গর্জ্জনের মাঝে দু একটা সমুদ্র শকুন চীৎকার ক'রে উড়ে যাচ্ছে। দূরে ড্যাঙায় তালগাছের মাথার উপর দিকে একটা শঙ্খচিল ডেকে উড়ে গেল। কতকগুলি জলচর পাখী রোল ক'রে ডেকে উড়ে গেল। পূর্ব্বদিকের অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে আস্‌ছে, সেই অন্ধকারে কে যেন শুকতারার প্রদীপ হাতে আকাশের গায়ে কোথা থেকে উঠে এল, আমি তখন কমলের বুকের মাঝে মাথাটা রেখে সব দেখ্‌ছিলাম, কমল তার চাদর দিয়ে দাঁড়ের ছিটকান উছল জলের কণাগুলো মুছিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছিল। চারিদিকে শুধু ফেনা—দূরে ঈশানের কোণে একটু যেন গাঢ় মেঘের

লেখা ফুটে উঠ্ছে, আমি কমলের মুখের দিকে চেয়েছিলাম—কি সুন্দর মুখ! জগতে এমন সুন্দর আর কিছু আছে কি? জগতে শুধু সেই মুখ আর আমি। তার পর নৌকাখানা জলে ডোবা, কাল পাহাড়ে লাগ্‌বে ব'লে নৌকাখানা যেমন এ ধারে ঘুরে এল—একটা জোর হাওয়ায় চুলগুলো আমার মুখের উপরে উড়ে পড়্‌ল, কমল সেই মুখখানি নত ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার মুখে উড়ে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল; হঠাৎ যেন দূরে পাহাড়ের গায়ে কে যেন বাঁশী বাজালে। সাঁজের তারার আলো আমার চোখে মুখে যেন খেলা করতে লাগ্‌ল—কমল ধীরে ধীরে তার মুখখানি একেবারে আমার মুখের কাছে নিয়ে এল—আমিও জানি না কেন, সমস্ত জগৎ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, সাগর নেই, সাঁঝের আকাশে তারা নেই, আমিও যেন নেই, শুধু সেই মুখখানি, শুধু সাগরের অশ্রান্ত কল্লোল, তার পর আর কিছু নেই, কেউ নেই, কমল নেই, আমি নেই, তার পর দুটি ঠোঁট দুটি ঠোঁটের সঙ্গে মিশে গেল, হঠাৎ আলো হয়ে উঠ্‌ল, কড় কড় শব্দে সমস্ত সাগর তোলপাড় ক'রে ধ্বনিত হয়ে গেল, আমাদের চমক ভেঙে গেল, আর নৌকাখানা জলের ধাক্কায় উল্টে বালির চরের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ল। হোঁচট খেয়ে মুখটা থুব্‌ড়ে দুজনে পড়ে গেলাম, এখন বুঝ্‌ছি আমাদের প্রথম মিলনেই বাজ পড়েছে। হায়! ছেলেবেলার সেই ভীতিহীন প্রাণের মিলনে বুঝি দেবতার অভিশাপ থাকে। দিদি! দিদি! আমার চোখ ফেটে জল আসে, তুমি রাগ ক'র না, কথাগুলা ব'লে মনে যেন একটু পুরাণ স্মৃতির আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বোঝা ও ভার যেন একটু কমে, একটু যেন শান্তি হয়, তাই বলি, না হ'লে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে। সাগরের ওপর অনন্ত তরঙ্গ তুলে অস্থির নৌকাখানা শেষ ড্যাঙায় আছ্‌ড়ে পড়্‌ল···আমাদের দুজনের জীবনটা ঠিক তেমনি নয় কি?

শেষ সে দিন···আমার মৃত্যুদিনের—যাকে তোমরা বিয়ের দিন বল—পরদিন এই বাড়ীতে সকালবেলা যখন আশীর্ব্বাদ করতে এলে, জান কি ক'রে দুফোঁটা আগুনের মত তপ্ত চোখের জল এই হাতের উপর পড়েছিল? যদি জান্‌তে, দেখে যাও···এখন সে দু ফোঁটা চোখের জলের তাপ আগুনের মত এ দেহ বহন করছে। উঃ, এখন তপ্ত! এখন তপ্ত! আগুন! আগুন!

মনের দুঃখে অনেক কথা ব'লে ফেল্লাম। কমলের কথা মনে হ'লে আর আমার মুখ বাধা বন্ধ মানে না। সে ছাড়া আর যে আমার কিছু নেই। এ জগৎ তারই আলো দেখি। তোমার গাড়ী পাঠিয়ো—আমি এখানে থাক্‌লে ম'রে যাব। ইতি

অভাগী—মায়া।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

পাগল

(কথা-চিত্র)

[১]

তার কাজ ছিল শুধু লোকের বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কেউ তাড়িয়ে দিত, কেউ দু-মুঠো খেতে দিত, কেউ নাক সিঁট্‌কাত, কেউ হাস্‌ত, কেউ আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিত। ছেলের দল তাহার গায়ে পথের ধূলো দিত, ঢিল মার্‌ত,—বিজ্ঞেরা বল্‌ত, 'দেখ, দেখ, রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খাচ্ছে,—পাপের প্রাশ্চিত্ত হবে না।'—সে শুন্‌ত আর নিজের মনে খুব হাস্‌ত। পয়সা দিলে ফেলে দিত, নিত না।—শুধু হাহা ক'রে হাস্‌ত।

একদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাইরের ঘরে ব'সে আছি, হাতেও কিছু কাজ নেই। সাম্‌নে খোলা আকাশ, বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর খর রোদের ঝাঁঝ্‌; নানা রঙের ফড়িংগুলো সেই রোদের আলোয় উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে—চড়াই পাখীগুলো কেবল ডাক্‌চে। একটা সূর্য্যমুখী ফুল সূয্যির পানেই মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে।—সময়টা যেন সরে না—নড়্‌তে চায় না। এমন সময় সে এল।

এক রাশ ঝাঁক্‌ড়া চুল, অস্থি-চর্ম্ম-সার, নাকের হাড়খানা উঁচু হয়ে উঠেছে, আর তার দুপাশে দুটো জ্বলন্ত আগুনের মত চোখ। আমি বল্‌লুম—'কি রে পাগ্‌লা!'—

মনে হ'ল, খানিকক্ষণ এইবার বেশ কাট্‌বে। সে বল্‌লে,—'দেখুন, আপনার একটু সময় হবে কি? আমার একটা কথা আছে।' আমার ভারি কৌতূহল হ'ল, কি রকম পাগল এ—এ ত বেশ দিব্যি সহজের মতই কথা কয়! আমি উঠে বস্‌লাম। সে বল্‌লে, 'দেখুন, একটা কথা বল্‌বার জন্যে অনেক দিন থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা কেউ শুন্‌তে চায় না',—কথাগুলো ব'লে সে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

"আচ্ছা আমি শুন্‌ব ; কি কথা, বল্‌ ত শুনি !"

মুখখানায় তার কালী যেন মেড়ে দিয়েছিল ; আমার দিকে তাকালে, তার পরই পাঙাশপানা হয়ে গেল। কি যেন ভয়ানক যাতনায় তার সব্ব শরীর রী-রী ক'রে উঠ্‌ল ; শুখনো হাড় কখানা যেন বেজে উঠ্‌ল।— আর চোখ দুটো ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল। তার পর বল্‌লে—

"সে আজ অনেক কালের কথা। আমি তখন বাগবাজারে থাক্‌তাম। আমাদের অবস্থা খুব ভালই ছিল। কখন খাবার পরবার কথা ভুলেও মনে করিনি। বড় মানুষের ছেলেদের যা হয়, আমারও তাই হ'ল,—লেখা-পড়ার বড় একটা নামই ছিল না,—তার ওপর আবার মৌ-মাছির দল এসে চারিদিকে ঘিরে ফেল্‌লে, চাকের পাশে তাদের ভন-ভনানি, খুব শুন্‌তে পেতাম। দিনগুলো যেন ফুলে-ফুলে উড়ে-বেড়ানর মত বেশ কেটে যেত।—

তার নাম ছিল হীরা। লক্ষহীরা! লক্ষহীরা! সে হীরে তুমি দেখনি, সেই যে—হাহা—হাহা।—আমি রোজই তার কাছে যেতাম। তুমি দেখনি, সব্বাই তাকে দেখেছে, আর তুমি দেখনি, ঠিক যেন গোলাপ-ফুল। সে আমায় বড্ড ভালবাস্‌ত,—হা হা—হা হা!"— পাগল একেবারে অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুল্‌লে, তার পর আবার বল্‌তে লাগ্‌ল।

"রাত্তিরে বাড়ী থাক্‌তুম না। বাড়ীর সবাই বকাবকি আরম্ভ কর্‌লে। মা মাথা খুঁড়্‌লে, বাবা বল্‌লে, অমন ক'রে বেড়ালে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব—টাকা-কড়ি এক পয়সা দেব না। ধার কর্‌তে লাগ্‌লুম। ধার বন্ধ হ'ল। চুরি কর্‌লুম—তার পর—থাক্—হাহা হাহা—সে ত ভালবাস্‌ত।—একদিন সকালে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ঢুক্‌ছি, বাবা বল্‌লে, 'তুমি যদি তাকে না ছাড়, তবে আমার বাড়ী থেকে বেরোও।'— আমার মনে হ'ল, সে ছাড়া আমার আবার আছে কি, তাকেই যদি ছাড়ি, তবে আর ঘর-দোরে আমার কাজ কি ছাই।—হাহা—হা আহা! সে যে আমার সব গো!—বাড়ী ছাড়্‌লাম। তার ওখানে গেলাম।—সে যে আমায় বড্ড ভালবাসে। আমার রকম-সকম দেখে খুব জোরে হীরে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে, 'দেখ, অমুক জায়গায় অমুক এখনি

আস্‌বে, তার লোক এসেছিল—তিনশ টাকা আগাম দিয়ে গেছে, এখন নয়, রাত্তির দুটোর পর আসিস্‌। তোকে দেখ্‌লে সে আবার কি মনে কর্‌বে—তার পর কেন আমার অন্ন মার্‌বি ?' আমি বল্‌লুম, 'হীরে—আমি যে তোকে বড্ড ভালবাসি রে',—সে বল্‌লে,'আঃ, আর কাজ কি—এখুনি এসে পড়্‌বে, মহা বিপদ্‌ হবে, যা না ভাই, এখন—আমি ত তোরই আছি!' এই ব'লে হীরে খুব হাস্‌লে—সে কি হাসি! হাহা হাহা!"

আমি ভাব্‌লাম, এ একেবারে 'বদ্ধ পাগল—না—আবার সে আরম্ভ কর্‌লে—"দেখুন, সেই অবধি পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঠিক করেছি, আর কখন তার কথা ভাব্‌ব না।—কিন্তু"—

এই ব'লে সে চুপ কর্‌লে। সাপ যেমন পাক খেয়ে খেয়ে ফণা তুলে ওঠে, তেম্‌নি ক'রে ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লাম, "কিন্তু কি"—

সে বল্‌লে—"তাকে আজ আবার দেখ্‌লাম।"

"কোথায় ?"

"ঐ যে কালীবাড়ীর মন্দিরের কাছে ভিক্ষে কর্‌ছে—গায়ে সব কি বেরিয়েছে, মাছি ভন্‌ভন্‌ কর্‌তেছে—সেই হীরে গো! সেই হীরে! ওঃ, বুক গেল—জ্বলে গেল—হাহা হাহা!"

একটা বিকট হাসিতে ঘরের দেয়ালগুলো যেন ফেটে দুখানা হয়ে গেল। দরজার পাশে শিউলী গাছে একটা কাক বসেছিল, সেটা কা-কা-কা-কা ক'রে ক'রে উড়ে গেল। গোটাকতক শুখনো শিউলীর পাতা ঝ'রে পড়্‌ল; আমি দেখ্‌লুম, এইটুকু বল্‌তে তার সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

শ্রীনিত্যানন্দ দাশ।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]   [ফাল্গুন, ১৩২৩

উর্ব্বশী-বিদায়

প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম। একদিকে গঙ্গার শাদা জল তোড়ে আসিতেছে, আর একদিকে যমুনার কাল জল বেগে আসিতেছে। যেখানে দুইয়ে মিশিয়াছে, সেখানকার অপূর্ব্ব শোভা কালিদাস একদিন মহাকবির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তুলনার অতীত, কিন্তু সে বর্ণনায় আমাদের আজ কাজ নাই। ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গা পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভরা যমুনাও পাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে এ দুইয়ের মিলন হইয়াছে, সেইখানে একটি সাততলা প্রকাণ্ড শাদা মারবেলের রাজবাড়ী—এমন পালিশ করা যে, দিনরাত যেন চক্-চক্ করিতেছে—ঝক্-ঝক্ করিতেছে। সেই সাততলা বাড়ীটিই আজ আমাদের বর্ণনার বিষয়। আজ আকাশে মেঘ নাই, পূর্ণিমার রাত্রি। চাঁদ পূব্‌দিক্ হইতে উঠিতেছে আর যেন নির্জ্জলা দুধের মত শাদা আলোয় পৃথিবীকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। ভরা গঙ্গার শাদা জলের উপর দুধ্‌ ঢালা—যমুনার কাল জলের উপর দুধ্‌ ঢালা। যমুনার কাল রং ডুবাইয়া দিয়া যেন শাদা রংয়ের ঢেউ উঠিতেছে। মারবেলের বাড়ীর উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—যেন সব বাড়ীটিকে দুধে নাওয়াইয়া রাখিয়াছে। মারবেলের ছায়া গঙ্গার জলে পড়িয়াছে, ছায়া হইলে কি হয়, সেও যেন শাদা হইয়া গিয়াছে। এইরূপে শাদার উপর শাদা, তার উপর শাদা, তার উপর শাদা, এক অপরূপ শাদারংয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আর সকলের উপর একটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ভাব সকলেরই মন হরণ করিতেছে।

আজি সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ীর সকলের মুখেই কিন্তু একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সকলেই চিন্তিত—একটা যেন কি মহাশোকের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সাততলায় ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া আরসীর মত প্রতিফলিত হইতেছে। নক্ষত্রগুলির ছায়ায় ছাদে যেন ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এ ছাদে কিন্তু আজ বীণা বেণু মৃদঙ্গ কিছুই বাজিতেছে না। নাচ বা গানের নামও নাই। আছেন কেবল রাজা পুরূরবা, তাঁহার পাটরাণী ঔশীনরী, অপ্সরা উর্ব্বশী আর তাঁহার বিদূষক। উর্ব্বশীর শাপ ছিল—তিনি মানুষ হইয়া পৃথিবীতে থাকিবেন; কিন্তু ছেলের মুখ দেখিলেই তাঁহাকে আবার স্বর্গে যাইতে হইবে। পুরূরবার প্রেমে কিন্তু উর্ব্বশী এতই মগ্ন যে, ছেলেটি হইবামাত্র তাহার মুখ না দেখিয়াই উর্ব্বশী তাহাকে এক ঋষির আশ্রমে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। ঋষি তাহাকে আপনার ছেলে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাইশ বৎসর প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ সকালে দৈবের বিপাকে তাহাকে রাজারাণীর সম্মুখে আসিতে হইয়াছে। উর্ব্বশী তাহাকে চিনিয়াছেন ও তাহার মুখ দেখিয়াছেন; আর তাঁহার পৃথিবীতে থাকিবার কোন উপায় নাই। তাঁহাকে স্বর্গে যাইতেই হইবে। ঠিক দুই প্রহর রাত্রিতে তাঁহাকে স্বর্গে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই সন্ধ্যা হইতেই রাজবাড়ীর সকলের মুখেই আজ বিষাদের ছায়া। তাই আজ সাততলার ছাদে রাজা, রাণী ও উর্ব্বশীর আগমন। সকলেই অপেক্ষা করিতেছেন—কখন্ দুপুর বাজিবে। চাঁদ ক্রমে উদয়-পাহাড়ের মাথা হইতে অকাশে উঠিতে লাগিলেন। রাজ-পরিবারেরও শোক-সমুদ্র উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা পুরূরবা চাঁদের নাতি। বুধের ছেলে। তাঁহার মায়ের নাম ইলা। সুতরাং মানুষ হইলেও দেব-অংশেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি। সে জ্যোতিতে কখন জোয়ার-ভাটা নাই। তাঁহার এত বয়স হইয়াছে। তিনি এত দেশ জয় করিয়াছেন—একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের সমস্ত ভার তাঁহার মাথার উপর। কতবার তিনি দেবতার হইয়া অসুরদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মুখখানি দেখিলে মনে হয়, তিনি এখন ১৮ ছাড়িয়া ১৯শে পড়েন নাই। তিনি যে দিন কেশী দানবকে নাশ করিয়া সূর্য্যলোক হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন, উর্ব্বশী সেই দিন হইতে দেখিতেছেন—রাজার মুখের, রূপের, শরীরের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি যেন কার্ত্তিকের মত চির-কুমার।

উর্ব্বশী তো স্বর্গের অপ্সরা। অপ্সরাগণের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী—সকলের অগ্রগণ্যা। তিনি শাপে অপ্সরা হইতেই মানুষ হইয়াছেন। তাঁহাকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় নাই। রাজা যখন কেশী দানবের হাত হইতে তাঁহাকে

উদ্ধার করেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিত। মূর্চ্ছিত অবস্থাতেই রাজা তাঁহাকে হেমকূট-শিখরে সখীদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত করেন। তখন তাঁহার দেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। সখীরা অনেক যত্ন,—অনেক সেবা করিলে ক্রমে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি চোখ খুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে আমায় উদ্ধার করিল? সুরপতি ইন্দ্র কি এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন?" সখীরা কহিল, "সুরপতি আপনার উদ্ধার করেন নাই; কিন্তু তাঁহারই একজন প্রিয় সুহৃদ ও চির-সহায় আপনাকে কেশীর হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" দুরাত্মা অসুরের নাম শুনিয়াই উর্ব্বশী আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবার চৈতন্য হইলে তিনি মহারাজ পুরূরবাকে দেখিলেন। দেখিয়াই মজিলেন। তিনি একটু সুস্থ হইলে পুরূরবা যখন নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তিনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি অতি করুণ, যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া করুণরস তাঁহার চক্ষু হইতে প্রবাহিত হইয়া রাজাকে আপ্লুত করিতে লাগিল। সেই অবধি মহারাজের নাম তাঁহার জপমালা হইল; তিনি শয়নে স্বপনে কেবল পুরূরবাকেই দেখিতে লাগিলেন এবং কিরূপে মহারাজের সহিত তাঁহার মিলন হয়, কেবল সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। একদিন ভূর্জ্জপত্রে আপনার মনের ভাব লিখিয়া একজন অপ্সরা সখীর হাতে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে অদৃশ্য হইয়া সখীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। পত্র পড়িয়া রাজার মনের যেরূপ ভাব হইল, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া সশরীরে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন। উভয়ে প্রেমালাপ হইতেছে, এমন সময় চেটী আসিয়া খবর দিল, স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসা অবধি রাজার শরীর খারাপ হইয়াছে শুনিয়া পাটরাণী তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। শুনিয়াই উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়া গেলেন; তাঁহার অপ্সরা সখী আকাশপথে লীন হইয়া গেলেন। রাজা ভূর্জ্জপত্রখানি আর একবার পড়িলেন, নিকটেই বিদূষক ছিল, তাহার হাতে সেইখানি দিয়া বলিলেন, "এখানি যত্ন করিয়া রাখিও; দেখিও রাণী যেন টের না পান। উর্ব্বশীর বিরহে এই পত্রখানি তাঁহার স্মৃতি আমার মনে জাগরূক করিয়া রাখিবে ও আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবে।" বিদূষক কিন্তু আলা লোক। তাহার হাত হইতে সে পত্রখানি যে উড়িয়া গেল, সে তাহা টেরও পাইল না। পত্রখানি পড়্‌বি তো পড়্ উড়িয়া গিয়া রাণীর হাতেই পড়িল। রাণী আসিয়া পত্রখানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং অনেকক্ষণ কোন্দল করিয়া মানভরে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিছুতেই তিনি কর্ণপাত করিলেন না।

ওদিকে উর্ব্বশী স্বর্গে ফিরিয়াই শুনিলেন, ভরতমুনি লক্ষ্মী-স্বয়ংবর নামে একখানি

নাটক লিখিয়াছেন; সেখানি শীঘ্রই ইন্দ্রের সভায় অভিনয় হইবে আর তাঁহাকে লক্ষ্মী সাজিতে হইবে। এখনি রিহার্সাল; রিহার্সালে লক্ষ্মী সাজিয়া উর্ব্বশী যেখানে নারায়ণের নাম করিতে হইবে, সেখানে পুরুরবার নাম করিয়া বসিলেন। ভরতমুনি বড় বদরাগী ও বদমেজাজী। তিনি ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না; একেবারে শাপ দিয়া বসিলেন,—'তুই যখন নারায়ণের নাম করিতে গিয়া মানুষের নাম করিয়াছিস্, তুই যা, মনুষ্যলোকে গিয়া থাক্।' শাপের কথা শুনিয়াই ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যাপারটা—সব তলাইয়া বুঝিলেন, ঋষিকে অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে শাপমোচন করিতে বলিলেন। শেষে স্থির হইল, পুত্র-মুখ-দর্শন হইলেই শাপান্ত হইবে। ইন্দ্র তখন মাতলিকে ডাকিয়া উর্ব্বশীকে সঙ্গে দিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, উর্ব্বশী তোমার প্রতি অনুরক্ত, তুমিও উর্ব্বশীকে বড় ভালবাস। তুমি আমার বন্ধু—উপকারী, তাই উর্ব্বশীকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিই। তুমি ইহাকে কাছে রাখ।

মাতলি চলিয়া গেল। রাজা, উর্ব্বশী ও বিদূষক তিনজনে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে চেটী আসিয়া খবর দিল, রাজার কাছ হইতে গিয়া অবধি রাণী উপবাস করিতেছেন। তাঁহার এক ব্রত আছে, সে ব্রত আজ সাঙ্গ হইবে। কিন্তু রাজার নিকট না আসিলে সে ব্রত আজ উদযাপন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অনুনয়-বিনয় করিয়া একবার দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"তিনি আসুন"। রাণী আসিলেন; সঙ্গে অনেক চেটী অনেক পূজার জিনিষ লইয়া আসিয়াছে। রাণী রাজাকে পূজা করিলেন। ফুল দিলেন, মালা দিলেন, চন্দন দিলেন, ভাল ভাল খাবার জিনিষ দিলেন। বিদূষকের বড় আহ্লাদ। আরতি করিলেন। পূজার অঙ্গ শেষ হইলে গলায় কাপড় দিয়া বলিলেন,—"আজ অবধি আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভাল-বাসিব; সে আমার ভগিনী হইবে। এই আমার ব্রত, এই ব্রতের নাম প্রিয়-প্রসাধন।" রাণী সেই অবধি উর্ব্বশীকে আপনার ভগিনীর মত জ্ঞান করেন, তাই আজ উর্ব্বশীর বিদায়ের দিনে রাজার নিকট উপস্থিত আছেন। তাঁহারও মুখখানি আজ অতিশয় ম্লান—মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

রাজা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"উর্ব্বশি! তবে তুমি আজ সত্য সত্যই যাইবে?"

উর্ব্বশী বলিলেন,—"আমরা দেবরাজের অধীন, আমাদের কোন বিষয়েই স্বাধীনতা নাই। আমার শাপমোচন হইয়াছে, আমাদের এই শেষ দেখা। এই বিদায়ের দিন যাহাতে শীঘ্র না আইসে, তাই মা হইয়াও ছেলেটিকে এত কাল বনবাসে

দিয়াছিলাম; কিন্তু বিধিলিপি তো খণ্ডন হয় না; তাই আজ আমায় তাহার মুখ দেখিতে হইল, আমারও বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বুঝি তো সব; কিন্তু মন যে প্রবোধ মানে না। তুমি তো জান উর্ব্বশি, তুমি কাছে না থাকিলে আমার কিরূপ অবস্থা হয়। জান তো কার্ত্তিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়া তুমি যখন লতা হইয়া গিয়াছিলে, আমার কি হাল হইয়াছিল। তখন যে আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। মেঘ তোমায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ভাবিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। ময়ূরের কাছে তোমার খবর জিজ্ঞাসা করিলে সে যখন কক্ কক্ করিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার সহিত কত ঝগড়া করিয়াছিলাম। আমাব আবার বোধ হয় সেই দশা উপস্থিত হইবে।" এই বলিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাণী ও উর্ব্বশী অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। রাণী ঔশীনরী প্রমাদ গণিলেন। উর্ব্বশী রাজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"মহারাজ, স্থির হউন—আপনার অবস্থা যে বড়ই শোচনীয় হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হইয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। আপনার শৌর্য্য-বীর্য্য, রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের যে পরমগুরু মহর্ষি ভরত, তাঁহারও সাক্ষাতে আত্মসংযম করিতে পারি নাই। এই যে যাইতেছি, আবাব যে কি হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। অমন ভুল আবার হইলে এবাব ঋষি যে কি করিবেন, ভাবিলেও হৃদয় কম্পিত হয়। হয় তো এবার বলিয়া বসিবেন—'তুই যাব জন্য বার বার ভুল করিতেছিস্, অনন্ত কালেও তোর সহিত তাহার দেখা হইবে না।' সে বারের শাপে তো আমাদের ভালই হইয়াছিল, এবার যদি উল্টা শাপ দেন, তাহা হইলে অনন্ত কালের জন্য আমরা চির-দুঃখে ও চির-বিরহে পড়িয়া থাকিব।"

রাজা বলিলেন,—"আর না উর্ব্বশি, ও কথা আর মুখেও আনিও না; শুনিলে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। কিন্তু আমি তোমার সহিত মিলনের আর এক উপায় করিয়াছি। স্বর্গে যাইলে তো তোমায় দেখিতে পাইব। অতএব আমি এখনি মরিয়া তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

উর্ব্বশী।—মহারাজ, অতি বড় শত্রুও যেন অমন কথা মুখে না আনে। কারণ, আত্মহত্যা করিলে স্বর্গে যাইবার কোন উপায় নাই। কারণ, আত্মঘাতী লোকে অসুর-লোকে যায় এবং সেখানে গাঢ় অন্ধ-তমসায় আচ্ছন্ন থাকে। অতএব

ওরূপ কথা যদি আপনি মনেও ভাবিয়া থাকেন—আর ভাবিবেন না। আমার ভগিনী ঔশীনরী আছেন, ইনিই আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। আমি তো জানি, তিনি আপনাকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন। স্ত্রীলোকে সব করিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বামীটিকে পরের হাতে তুলিয়া দিতে কেহই পারে না। দিদি আমার তাহাও আর একজনের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার মন-চোরাকে আর এক জনকে চুরি করিতে দিয়াছেন এবং সেই চোরকে ভগিনী বলিয়া ভালবাসিয়াছেন।

রাজা বলিলেন,—"রাণীর আমার গুণের পার নাই। সে কথা তুমি আমায় বুঝাইবে কি। তাঁহাকে আমি তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী দিন ধরিয়া জানি—তাঁহার গুণে আমি চির-ঋণী; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, আমায় তো আর আমি নাই—আমি আর এক রকম হইয়া গিয়াছি। এখন তোমায় কি করিয়া পাই, তাহারই উপায় বল। আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না!" বলিয়া রাজা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

উর্ব্বশী বলিলেন,—"মহারাজ, আমি তো একান্ত পরাধীন, তথাপি আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিতেছি। আপনি তো অলৌকিক শক্তিশালী; আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ত্রিভুবনে যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যাইতে পারেন। আপনি যখন যেখানে যাইয়া স্বভাবের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন, সেইখানে উর্ব্বশী উর্ব্বশী বলিয়া ডাকিবেন—আমি পরাধীন হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার পাশে গিয়া দাঁড়াইব। দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া দিব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পূর্ণিমার চাঁদ আকাশের ঠিক মাঝ-খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উর্ব্বশীও চকিত হইয়া সেই দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের ভার কমিয়া আসিতে লাগিল। শরীর হইতে দিব্য জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ত, মাংস, হাড়, পাঁজরা সব লোপ হইতে লাগিল; তাঁহার শরীরকান্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। তিনি যে উর্ব্বশী ছিলেন, সেই উর্ব্বশীই রহিলেন; কিন্তু আর সে মাটীর উর্ব্বশী নহে, পৃথিবীর যা কিছু ছিল, পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিব্য-মূর্ত্তিতে আবার অপ্সরা হইয়া আকাশপথে উঠিতে লাগিলেন। রাজা স্তব্ধ, রাণী স্তব্ধ, প্রতিষ্ঠানপুরের সমস্ত লোক স্তব্ধ, যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হইয়া উর্ব্বশীর পার্থিব দেহের এই পরিণাম একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজার দৃষ্টির অতীত হইয়া যান, এমন সময়ে রাজা একবার চন্দ্রালোকময়ী

পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের আবেগে ডাকিয়া উঠিলেন,—"উর্ব্বশি ! উর্ব্বশি !" অমনি উর্ব্বশী আসিয়া আবার তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং দুই জনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চন্দ্রালোকে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ও প্রতিষ্ঠানপুরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইলেন। তখন রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; বুঝিলেন, স্বভাব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে উর্ব্বশীকে ডাকিলেই পাইবেন। সুতরাং পুনর্ব্বার উর্ব্বশী যাইবার জন্য আকাশে উঠিলে তিনি আর তাহাকে ডাকিলেন না। মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করিয়া অতি কষ্টে রাত্রিটি কাটাইয়া দিলেন।

মহারাজা পুরূরবা অনেক দিন গত হইয়াছেন, তাহার পর কত যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখন যে স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া "উর্ব্বশী উর্ব্বশী" বলিয়া ডাকে, সে সত্য সত্যই তাহাকে দেখিতে পায়। উর্ব্বশী কল্পনার প্রধান সঙ্গিনী, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, কবিরা যাহাকে রস বলেন, সেই রসের খর প্রস্রবণ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রতীক্ষায়

আজকে সাঁঝে পরাণ-মাঝে
রচি বাসর-ঘর,
তোমার তরে ব'সে আছি,
ওগো আমার বর!

কবে আমার নামটি ধ'রে
ডাক্‌বে তুমি সোহাগভরে—
রাখ্‌বে হিয়া হিয়া-'পরে,
অধরে অধর।
ওগো আমার বর!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

[৩]

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিল। খাটের উপর বিছনো ফরাসের উপর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলালের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"সেকালের ১নং ওয়ার্ডে রাজেন্দ্রলাল অনেকবার কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটি, য়ুনিভার্সিটি এবং অন্যান্য সভায় শুধু যে তিনি বক্তৃতাই করিতেন, তাহা নয়, কাজও যথেষ্ট করিতেন। আবার অনেক সময় পেন্সিলে লিখিয়া কাগজের টুকরা মেম্বরদিগের নিকট পাঠাইতেন। তাহাতে অনেক ফুক্কুড়ি থাকিত। মেম্বররা যে সব সময় তাহা বুঝিতেন, তাহা নয়; অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন এবং হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। এমন রসিকতা করার অভ্যাস তাঁহার খুব ছিল। বাহির হইতে তাঁহাকে গম্ভীর দেখা যাইত, তাঁহার যে সকল ছবি বাহির হইয়াছে, তাহাতেও এই ভাবটিই ফুটিয়াছে, কিন্তু তিনি যে কিরূপ রসিক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। কমিটিতে হারিলে রাজেন্দ্রলাল রাগ করিতেন না, রাগের কোনও লক্ষণও দেখাইতেন না, বরং অনেক সময় রসিকতা করিয়া দেখাইতেন যে, হারিয়াও তিনি হারেন নাই। একবার ১নং ওয়ার্ডের কমিশনারপদের প্রার্থী হইয়া পশুপতি বসু ও রাজেন্দ্রলাল দাঁড়ান। রাজেন্দ্রলাল যাহাতে না হন, তাহার জন্য বসুজ মহাশয় কোনও যত্নের ক্রটি করেন নাই। অনেক উকিলের চিঠি ঝাড়িয়াছিলেন, ব্যারিষ্টারকেও অনেক পয়সা দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালও ছাড়েন নাই, তবে পশুপতি বাবুর যোগাড়টা ছিল কিছু বেশী, কাজে কাজেই রাজেন্দ্র হারিয়া গেলেন। এ সম্বন্ধে তিনি পরে একদিন বলিয়াছিলেন,—"কমিশনার হওয়ায় আমার কোনও স্বার্থ নাই। আমি শুধু কলিকাতাবাসীর জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহারা যদি আমাকে না চায়, আমি আর দাঁড়াইব না। তাহাদের জন্য আমি যে সময়টা নষ্ট করিতাম, তাহা নানারূপ Good Workএ ব্যয় করিব। আমার সংস্কৃত পুথির 'নোটিশ' প্রস্তুত করায়, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহি লেখায় একটা স্থায়ী ফল থাকিবে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির কাজে কি ফল?"

"য়ুনিভার্সিটিতে Croft সাহেবের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের খুব ঠোকাঠুকি হইত। বিপক্ষদলের ভোট যখন বেশী থাকিত, তিনি অবশ্য হারিয়া যাইতেন। কিন্তু হারিয়াও বেশ শান্ত ও ধীরভাবে চলিয়া আসিতেন। সময় সময় বিরুদ্ধবাদীদের দুই একটা ঠোকা দিতেও ছাড়িতেন না। ডাক্তার হোর্ণলি (A. F R. Hoernle) Cath.-dral Mission কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, এবং নিজেও একজন মিশনারি ছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন, মিশনারিকে গবর্ণমেণ্টে চাকুরী দেওয়া হইল, এই কথা লইয়া রাজেন্দ্রলাল খুব আন্দোলন করেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট জবাব দিয়াছিলেন—His missionary character will remain in abeyance. ইহার উত্তরে রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—How-long? ছাত্রদের পক্ষ লইয়া তিনি অনেক সময় লড়িতেন। Entrance পরীক্ষায় যখন বছর বছর বিস্তর ছেলে ফেল হইতে লাগিল, তখন তিনি Massacre of Innocent বলিয়া তুমুল আন্দোলন করেন।

"১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সর্ব্বপ্রথম একজন বাঙ্গালীকে এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট করা হয়। অর্থাৎ Sir William Jones সোসাইটা পত্তন করিবার পর ঠিক একশ' বছর চলিয়া গেলে একজন দেশীয় লোককে প্রেসিডেণ্ট করা হইল। যে দিনের সভায় তিনি নির্ব্বাচিত হইলেন, সে দিন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখনও মেম্বর হই নাই, সোসাইটীর প্রতাপ ঘোষ আমাকে সভায় টানিয়া লইয়া যান। দেশীয় অনেক মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। কে কে ছিলেন, ঠিক মনে পড়িতেছে না, তবে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন বেশ মনে আছে। আমি সেই প্রথম সোসাইটীর মিটি-এ যাই। সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর রাজেন্দ্রলাল সমবেত সদস্যদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাহার গোড়ার একটা ছত্র এখনও আমার মনে আছে। রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন—Though my abilities may be humble I yield to none in my interest to the Asiatic society. অনেক দিন পর্য্যন্ত সোসাইটীর সভাপতিরা Annual advices দেন নাই, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থাৎ সভাপতি হইবার ঠিক এক বছর পরে রাজেন্দ্রলাল সোসাইটীর বার্ষিক সভায় নূতন ধরণে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি কানে শুনিতে পাইতেন না, সেই জন্য পূরা দুই বৎসর সভাপতিত্ব করিতে পারেন নাই। এক বৎসর পরেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সভাপতির পদ ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু প্রায় সকল অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং বাদ-প্রতিবাদে খুবই যোগ দিতেন। তাঁহার দৃষ্টি চারিদিকে ছিল। অশ্বৈদ্যকসম্বন্ধে

দুইখানি মাত্র বহির কথা লোকে জানিত, একখানি নকুলের আর খানি জয়দত্তের। রাজেন্দ্রলাল বিশেষ জিদ করিয়া সোসাইটী হইতে এই দুইখানি পুস্তক ছাপাইতে বলেন। তিনি খবর দেন যে, অশ্ববৈদ্যকের প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ শালিহোত্রের অশ্বশাস্ত্র আর পাওয়া যায় না; বাগদাদে উহার তর্জ্জমা হইয়াছিল, তাহার পার্শী তর্জ্জমা চলিত আছে। পার্শী হইতে হিন্দীতেও তর্জ্জমা হইয়াছে, কিন্তু মূল পুঁথি এখনও পাওয়া যায় নাই, অথচ অশ্বচিকিৎসককে সমস্ত ভারতময় শালিহোত্র বলে। শালিহোত্রের পুঁথি রাজপুতানায় পাওয়া গিয়াছে শুনিলে আজ তিনি আনন্দে বিহ্বল হইতেন। ইংরাজী কোন্ সাল মনে নাই, এসিয়াটীক সোসাইটীর অনুরোধক্রমে জর্ম্মাণীর উর্টামবার্গের (Wurtemberg) খ্যাতনামা পণ্ডিত জলী (Prof. Jolly) মনুটীকাসংগ্রহ নামে এক পুস্তক ছাপাইতে সুরু করেন। পুস্তকখানি আর কিছু নয়, বাদ-প্রতিবাদ, বিচার-বিতণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া কোন্ টীকাকার মনুর শ্লোকের কি অর্থ করিয়াছেন, তাহাই তিনি উক্ত পুস্তকে সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি চারি পাঁচখানি টীকার অনুযায়ী চারি পাঁচ রকম অন্বয় ও প্রতিবাক্যও দিতেছিলেন। তিনটি অধ্যায় মাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় বোম্বাই সহরের প্রসিদ্ধ উকীল মাণ্ডালিক মহোদয়ের সাত টীকা শুদ্ধ মনু বাহির হইয়া গেল। রাজেন্দ্রলাল অমনি বলিলেন, জলীর মনুটীকাসংগ্রহ আর ছাপা হওয়া উচিত নয়। উনি ত কেবল চুম্বক দিতেছেন, পুরা পুঁথি ছাপা হইয়া গেল, তাঁহার চুম্বকের এখন আর কোনও কদর রহিল না। সুতরাং মনুটীকাসংগ্রহ ছাপা বন্ধ হইয়া গেল। এসিয়াটিক সোসাইটী শাঙ্করভাষ্য ও তাহার টীকা ভামতী ছাপাইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বছর পরে হোর্ণলি সাহেবের কাশীস্থ কোনও বন্ধু ভামতীর টীকা কল্পতরু ও তাহার টীকা পরিমল ছাপাইবার প্রস্তাব করেন। হোর্ণলি সাহেব একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, সোসাইটীতে তুমি এই প্রস্তাবের সপক্ষে নোট্ দাও। আমি তাঁহার কথামত নোট্ দিলাম। কল্পতরু কি, পরিমল কি, বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম, যখন ভামতী ছাপা হইয়াছে, এ দুইখানিও ছাপান উচিত। আমার minute দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। আমিও দৈবক্রমে সেই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি আমায় বলিলেন—'হরপ্রসাদ, তুমি এ কি কাজ করিয়াছ? দেখ, আমার ইচ্ছা—যাহাতে তোমার একটু নামপসার হয়। কিন্তু তুমি এমনই লিখিয়াছ যে, বাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে minute দিতে হইতেছে।'—আমি বলিলাম,—কল্পতরু, পরিমল তো বেশ বই 'আপনি ইহার বিরুদ্ধ হইতেছেন কেন?'—তিনি বলিলেন—'আমরা বুঝি বসিয়া বসিয়া কেবল বেদান্তই ছাপিব?

কেন, আর বুঝি দর্শনশাস্ত্র নেই?'—তিনি আমার বিরুদ্ধে minute দিলেন, তাঁহার কথাই বজায় রহিল।

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার একটা চাকুরীর উপরোধপত্র লইবার জন্য আমি বৈদ্যনাথে রাজেন্দ্রলালের কাছে যাই। সকালে বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইয়া তীর্থের কাজ সারিয়া পাণ্ডার বাটীতে নিদ্রা গেলাম। বিকালে পাণ্ডা কৌশল্যানদীর ওপার হইতে রাজেন্দ্রলালের বাটী দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি কৌশল্যানদী পার হইয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাটীর যে দিকে গিয়া উঠিলাম, বাটীর সদর দরজা ঠিক তাহার বিপরীত। বাটীখানি পঁয়ত্রিশ বিঘা জমীর উপর—একতালা, মাঝে একটা হল, চারিকোণে চারিটা ঘর, অর্থাৎ ঠিক বাংলা প্যাটার্ণের। আমাকে দেখিয়া রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বিস্মিত হইলেন। আমাকে বলিলেন—'তুমি এখানে?...... এখন ত গাড়ীর সময় নয়? তবে কোথা হইতে আসিলে?'—আমি বলিলাম—'সকালে আসিয়া পাণ্ডার বাসায় ছিলাম।'—তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যে কয়টি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া বলিলেন,—'ইনি বোধ হয় আমাদিগের বাটীতে খাইতে চাহেন না, তাই পাণ্ডার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন। কিন্তু আজ যখন আমার বাটী আসিয়াছ, আমি ত তোমাকে ছাড়িব না!'—ইহার উপর আর কথা চলে না, রাজেন্দ্রলালের আতিথ্য লইলাম। যতক্ষণ তাঁহার বাটীতে ছিলাম, তিনি আমাকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আমি আসিয়াছি বলিয়া ভাল ভাল ব্যঞ্জন রাঁধাইলেন। কলিকাতা হইতে ভাঙন মাছ সংগ্রহ করা ছিল, তাহাও ফরমাইসমত রাঁধাইলেন। বৈদ্যনাথের পেঁড়া প্রভৃতিও আনান হইল। রাত্রিতে আহার হইয়া গেলে নিজে দাঁড়াইয়া একটি কোণের ঘরে বিছানা করাইয়া দিলেন, মশারিটি পর্য্যন্ত কিরূপ খাটান হইল, তাহার তদারক করিলেন। আমাকে শুইতে বলিয়া, কিরূপে দরজা বন্ধ করিতে হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। সকালবেলা রাজেন্দ্রলাল উঠিয়া পেণ্টুলন, চাপকান পরিলেন, এবং পকেটে কতকগুলি কি পুরিয়া লইয়া আমাকে বলিলেন—'চল, বেড়াইয়া আসি। তোমার চাকুরীর জন্য পত্র তোমার হাতে দিব না, ডাকে তোমার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিব।'—রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাহার পর বেড়াইতে বাহির হইলাম। তিনি অনেকের বাটীতে গেলেন। বাটীতে ছোট ছেলে দেখিলেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং পকেট হইতে একটা পাখী বা অন্য কোনও খেলানা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। সে খেলানা পাইয়া আহ্লাদে খুব হাসিতে লাগিল, তিনি তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। এইরূপে পাঁচ ছয় বাটীতে

দশবারটি ছেলেকে খেলানা দিতে দিতে তাঁহার পকেট খালি হইয়া গেল। তিনি ছোট ছেলেপিলেকে এত ভালবাসিতেন এবং তাহাদিগকে পাইলে এত খুসী হইতেন, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

"আমি ত সেই দিনই বৈদ্যনাথ হইতে চলিয়া আসিলাম। চলিয়া আসিবার পর, এবং আমার চাকুরীর জন্য রাজেন্দ্রলালের উপরোধপত্র লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার কোনও বিশেষ বন্ধু—শুনিলাম, পশ্চিম হইতে আসিয়া দেওঘরে পৌছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালের নিকট বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, আমি একজন good-for-nothing লোক। তাঁহার আদত মতলব ছিল এই যে, আমি যে কাজের প্রার্থী, সেই কাজের জন্য তাঁহার কোনও আত্মীয়ের হইয়া রাজেন্দ্রলাল উপরোধ করেন। রাজেন্দ্রলাল তাহাতে বলেন—'সে কেমন করিয়া হইবে? আমি যে তাহাকে আশা দিয়াছি, এবং সে আমার অনেক কাজ করিয়া দেয়। আমি তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের জন্য চিঠি কেন দিব?--যে চাকুরীর জন্য তিনি পত্র দেন, সে চাকুরী আমার হয় নাই, তাহার অর্দ্ধেক মাহিনায় আর একটা চাকুরী হইয়াছিল। কিন্তু এখানে খাটুনি ছিল কম, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইত, এবং নানারূপ বহি পড়িবারও সুবিধা হইত। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কি হইল?'—আমি বলিলাম—'সে চাকুরী হয় নাই কিন্তু আপনার পত্র ত অব্যর্থ, আর একটি হইয়াছে, ইহার বেতন তাহার অর্দ্ধেক।'—এই চাকুরীর কি কি সুবিধা, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম, তিনি সব শুনিয়া বলিলেন—'তা' বেশ হইয়াছে। ইংরাজীতে বলে, Half is often greater than the whole. তোমার পক্ষে সে কথাটি খুব খাটিয়া গেল।'

"১৮৮৯ সালে রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—'আমার পীড়ার সময় তুমি আমার এই Noticeএর কাজটা কর'—অর্থাৎ তিনি যে Notice of Sanskrit Manuscript করিতেছিলেন, তাহার ভার আমার উপর দিলেন। আপীস তাঁহার বাটীতেই রহিল। আমি মাঝে মাঝে গিয়া পণ্ডিতমহাশয়দের কাজ তদারক করিয়া আসিতাম এবং প্রুফ্‌ও দেখিতাম। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলালের দেহত্যাগ হইল। সোসাইটীর মেম্বরগণ তাঁহার নোটিশ ছাপাইবার ভার আমাকে দিলেন। একটি খণ্ড শেষ হইয়াছিল, সেটি বাহির হইল, আমার নামেই বাহির হইল। সেই নোটিসের এক খণ্ড কেম্ব্রিজে পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার অফ্রেক্ট (Dr. Aufrecht) নিকট পৌছিলে তিনি আমায় যে পত্র লিখেন, তাহা ত সে দিন তোমাকে দিয়াছি।"

বিকাশ

কাহার বাঁশীর রবে বাহির হইল ফুটি
ভেদিয়া তমস-কারা নিষ্ক্রিয় জগত গুটী!
কেমন সে সুধাস্বর, আঁধারে আপনা-হারা—
নির্গুণে-সগুণ করি বহালে চেতন-ধারা!

পুরুষ কি নারী তেঁহ, কি নামে নামিত সে বা,
হৃদয়-হীনের হৃদে সঞ্চারিছে স্ব-প্রতিভা,
বাজিছে মধুরে বাঁশী আহা কি করুণ স্বনে,
জাগাতে নিদ্রিতে কোন গভীর মরম বনে!

সে স্বর পরশে জাগি ধরিত্রী হৃদয় ভেদি—
উন্নত শিখর-চূড়া, নামিল নির্ঝর নদী,
কুলু-কুলু-কুলু-কুল দুকূল ভাসায়ে ছুটে—
বাঁশরীর রন্ধ্রপথে কি রাগ উথলি উঠে!

পুনঃ কি নবীন সুরে বাঁশরী উঠিছে বাজি,
প্রদীপ্ত জগত দীপ, লয়ে শশী তারা-রাজি,
শোভিল দুকূল শোভি শ্যামল বিটপ-ব্রণ,
গুণবতী বসুমতী লভিল জনন-গুণ!

রূপ রস গন্ধে ভরি ধরণী সাজিল হাসি
আবার করুণ সুরে মরমে পশিল বাঁশী
সুরে উতরিল স্বর, সমুত্থিত প্রতিধ্বনি
তুলিয়া কাকলী রোল জাগিল বিশ্বেতে প্রাণী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভিকুর বিয়ে

(১)

ভিকু বাগ্দীকে অনেকে বিয়ে-পাগ্লা বলিত।

তা ভিকুর বড় একটা দোষ ছিল না। তাহার বয়স চব্বিশ পার হইয়া গিয়াছিল; সমবয়স্কেরা সকলেই বিবাহিত, এবং সন্তানের জনক। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভিকুকে 'আইবুড় ভূত' বলিয়া উপহাসও করিত। সে উপহাস ভিকুর মর্ম্মে বড় জোরেই বিঁধিত। সুতরাং ভিকু আপনার আইবুড় নাম ঘুচাইবার জন্য কোমর বাঁধিল।

বিবাহে অপর কোন বাধা ছিল না, কনেও অনেক ছিল; ছিল না শুধু টাকা। পণের আড়াই গণ্ডা টাকা; আর মল এবং রূপার চুড়ীর দামও সে যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ভিকু দিন-মজুরী করিয়া দিন চালাইত। সম্পত্তির মধ্যে ছিল জমার জমির উপর একখানা ছিটেবেড়ার ঘর, ঘরের সাম্নে একটা তেঁতুল গাছ, আর পিছনে এক ঝাড় বাঁশ। ঘরে বুড়া মা ছিল। ভিকু মজুরী খাটিয়া যাহা পাইত, আনিয়া মায়ের হাতে দিত। মা কোনরূপে সংসার চালাইত।

পাড়াগাঁয়ে মজুরী সব দিন জুটে না। যে দিন না জুটিত, সে দিন ভিকু ঘেরা জাল কাঁধে ফেলিয়া মাছ ধরিতে যাইত। মাছ ধরিয়া আনিয়া মাকে দিত, মা পাড়ায় বেচিয়া চাল কিনিয়া আনিত। যে দিন ঘরে চাল থাকিত, সে দিন মাছ বেচিত না, খাইবার জন্য রাখিয়া দিত। এইরূপে সংসার এক রকমে চলিয়া যাইত, কিন্তু কিছুই সঞ্চয় হইত না।

ভিকু মাঝে মাঝে বলিত, "দেখ্ মা, যা আন্ছি, সব খেয়েই ফেল্ছি। একটা পয়সাও জম্ছে না, কিসে কি হবে বল্ তো?"

বুড়ী বলিত, "আমিও তো দিন-রাত তাই ভাবি বাবা, তোর মাথায় এক গণ্ডূষ জল কি ক'রে দেব? লোকেও বলে, ভিকুর মা, তোর ভিকুর মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিয়ে যদি মর্তে পারিস্, তবু তোর জন্ম সাথক। তা বাবা, কি করি বল্, পোড়া পেটই যে কাল হয়েছে।"

ভিকু বলিত, "তা মা, তুই চেষ্টা বেষ্টা দেখ্, নইলে পাড়ায় তো আর মুখ দেখান যায় না। না হয় ধার-করজ ক'রে কাজ সারা যাক্।"

বুড়ী শিহরিয়া বলিত, "বাপ্‌রে! করজের নামটি করিস্‌ না। দেখ্‌লি না, সিদুর বেটা করজ ক'রে বিয়ে কর্‌লে, শেষে সুদের দায়ে ঘটি-বাটি, কুঁড়েটুকু অবধি বেচে নিলে।"

ভিকু হতাশচিত্তে উত্তর করিত, "তা মা, তুমি যা হয় একটা উপায় কর। যে রকমে হোক, আইবুড়ো নামটা ঘুচিয়ে দাও।"

বুড়ী ছেলেকে আশ্বাস দিয়া বলিত, "দেব বৈ কি বাবা, দেব বৈ কি। আর দিন কতক সবুর কর্‌।"

ভিকুর মা ছেলেকে মিথ্যা আশ্বাস দিত না, ছেলের মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। সে গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে বেচিত; পুকুরের শুষ্‌নী কল্‌মী শাক তুলিয়া হাটে বেচিয়া আসিত। তা ছাড়া বুড়ী দুই তিনটা পাঁটী পুষিয়াছিল। ছাগল পুষিতে খরচ কিছুই ছিল না; অধিকন্তু তাহাদের যে বাচ্চা হইত, তাহা বেচিয়া বেশ দুপয়সা পাওয়া যাইত। এই· রূপে বুড়ী রাই কুড়াইয়া বেল করিতেছিল। কিন্তু সে আপনার সঞ্চয়ের কথা ভিকুকে জানিতে দিত না, নেকড়ায় বাঁধিয়া সেগুলি একটা ভাঙ্গা হাঁড়ীর ভিতর লুকাইয়া রাখিত। এক বেলা উপবাস দিতে, ভিজা কাপড় গায়ে শুকাইতে বা দারুণ শীতের রাত্রে কাঠ-পাতা জ্বালিয়া রাত কাটাইতে হইলেও বুড়ী সে সঞ্চয়ের একটি পয়সাতেও হাত দিত না।

এমনি করিয়া যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা টাকা জমিল, তখন বুড়ী একদিন হাসিতে হাসিতে ছেলের কাছে আপনার সঞ্চয়ের কথা জানাইল। শুনিয়া ভিকু অবাক্‌ হইয়া গেল। বুড়ী তখন ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া, পুঁটুলী খুলিয়া ভিকুকে টাকাগুলা দেখাইল। ভিকু একসঙ্গে পাঁচটা টাকা কখন দেখে নাই, সুতরাং একসঙ্গে এতগুলা চক্‌চকে টাকা দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল এবং মাতার সঞ্চয়-বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিয়া হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "এবার মা, তুই একটা মেয়ের চেষ্টা দেখ্‌, দেখি এবার কোন্‌ সুমুন্দী আমাকে আইবুড়ো ভূত বলে।"

বুড়ী বলিল, "ষাট্‌ ষাট্‌, যারা বলে, তাদের চোদ্দ পুরুষ আইবুড়ো ভূত হয়ে থাক্‌। কিন্তু বাবা, আর দিন কতক সবুর কর্‌, আরও কিছু জমুক।"

ভিকু রাগিয়া বলিল, "আর একদিনও সবুর না, এই যে এত টাকা জমেছে। আবার কি জম্‌বে? বা রে!"

ভিকুর মা মেয়ের চেষ্টা দেখিতে সম্মত হইয়া টাকাগুলো যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল।

অতঃপর ভিকুর মা এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরিয়া মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। আর ভিকু সকলকে আপনার আসন্ন পরিণয়ের কথা জানাইয়া দিয়া ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে উৎফুল্ল-কণ্ঠে গাহিতে থাকিল,—

"ওলো রাজনন্দিনি বিনোদিনী দেখ্‌বি যোদি আয়।
ঐ রথের পাশে নাগর এসে দাঁড়িয়ে আছে তোর আশায়—দেখ্‌বি যোদি আয়।"

(২)

"ভিকু, ভিকু, ও ভিকু!"

"কে গা?"

"আমি সুভা।"

"দি-ঠাকরোণ? বা রে! এমন তিন সাঁজের বেলা কেনে গা?"

ভিকু মাঠ হইতে ফিরিয়া সবে মাত্র তামাক সাজিতে বসিয়াছিল; সে হুঁকা কলিকা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল।

সুভা বলিল, "একবার আমাদের বাড়ী যাবি ভিকু?"

ভিকু বলিল, "যাব না কেনে? বা রে! হয়েছে কি?"

সুভা। বাবার ব্যামো বড্ড বেড়েছে।

ভিকু। এঁ্যা, বেড়েছে? কখন্ বাড়্‌ল? ডাক্তার এয়েছে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সুভা বলিল, "ডাক্তার কে ডাক্‌বে ভাই?"

ভিকু বলিল, "কেনে, বড় কত্তা কোথায়?"

সুভা। জ্যেঠামশায় বাড়ীতেই আছেন। কিন্তু তিনি একবারও উঁকি পাড়েন না।

ভিকু যেন আকাশ হইতে পড়িল; বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বা রে, ছোট ভেয়ের ব্যামো, আর তিনি একবার উঁকি দেন না? বা রে!"

সুভা বলিল, "তাঁর কথা ছেড়ে দে। আমাদের বড্ড ভয় কচ্চে, তুই একবার আয়।"

ভিকু বলিল, "আমি তো যাবই, কিন্তু বড় কত্তা—বা রে!"

সুভাষিণী অগ্রসর হইল। ভিকু বলিল, "তা দি-ঠাকরোণ, আমি সোজা ডাক্তার বাবুর বাড়ী হ'য়ে যাই। না, চল, তোমায় আগে দাঁড়িয়ে আসি।"

সুভাষিণী বলিল, "আমাকে আর দাঁড়াতে হবে না, তুই তবে ডাক্তার ডেকে নিয়েই আয়, আমি একাই যাচ্চি।"

ভিকু ব্যগ্রস্বরে বলিল, "তুমি এই সাঁজের ওক্তে বনবাদাড় ভেঙ্গে একা যাবে? বা রে! মা, মা!"

ভিকুর মা তখন দোকান সারিয়া ফিরিতেছিল। তাহার এক হাতে কেরোসিনের ডিবে, অপর হাতে দড়ি ঝুলান তেলের শিশি। কাঁধের উপর আঁচলের এক খুঁটে আধ পয়সার নুণ বাঁধা, অন্য খুঁটে বাঁধা সিকি পয়সার লঙ্কাহলুদ, আধ সিকির সুপারি, আধ সিকির খয়ের; বগলে সিকি পয়সার পান, সিকি পয়সার দোক্তাপাতা।

দূর হইতে ছেলের ডাক শুনিয়া ভিকুর মা উত্তর দিল, "কেনে রে ভিকে?"

ভিকু বলিল, "ওগুলো ফেলে রেখে তুই দি-ঠাকরোণকে দাঁড়িয়ে আয়। আমি ডাক্তার ডাক্‌তে যাই।"

ভিকুর মা কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার অসুখ?"

ভিকু বলিল, "ছোট কত্তার। কিন্তু বড় কত্তা—বুঝ্‌লি মা, বড় কত্তা একবার উঁকিটিও মারেন না। বা রে!"

গামছাখানা লইবারও অবকাশ না লইয়া ভিকু চলিয়া গেল। ভিকুর মা সওদা-পত্র ঘরে রাখিয়া, ঘরের আগড় বন্ধ করিয়া সুভাষিণীকে দাঁড়াইতে চলিল।

(৩)

শ্রীবাস ঘোষালের দুই ছেলে;—মধুসূদন আর নবীনচন্দ্র। মধু বড়, নবীন ছোট। বড় দেশ-বিখ্যাত পণ্ডিত, পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে মান্যমান, কিন্তু ছোট আকাট মূর্খ, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই অনাদৃত। বাপের জমিজমা যা কিছু ছিল, তাহা তুল্যাংশে ভাগ করিয়া এবং জ্যেষ্ঠত্বের মর্য্যাদাস্বরূপ দেড় বিঘা বেশী জমি ও নূতন ঘরখানা লইয়া আর পৈতৃক বিগ্রহের সেবার ভার ভ্রাতার স্কন্ধে চাপাইয়া মধুসূদন বাচস্পতি মূর্খ কনিষ্ঠের সংস্রব ত্যাগ করিলেন। পৈতৃক শিষ্য কিছু ছিল। তাহারা মূর্খ নবীনকে আমল দিল না, পণ্ডিত মধুসূদনকে সাদরে বরণ করিয়া লইল। সুতরাং নবীনের দিন কষ্টে চলিতে লাগিল, আর মধুসূদন ক্রিয়াকাণ্ডে, অধ্যাপক-বিদায়ে এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদানে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া, রায় বাবুদের বৈঠক-খানায় বুক ফুলাইয়া বসিয়া নস্য টিপিতে টিপিতে লোক সকলকে শাস্ত্রের সুমহৎ উপদেশ দান করিতে লাগিলেন। ঘৃত-দুগ্ধাদির প্রাবল্যে মধুসূদনের উদরের আয়তন যতই বাড়িতে লাগিল, অর্দ্ধাশনের প্রাবল্যে নবীনের উদরের আয়তন ততই কমিতে থাকিল।

একটি মেয়ে আর দুইটি ছোট ছোট ছেলে লইয়া নবীন ঘোষাল কষ্টেস্ষ্টে দিন চালাইতেছিল, কিন্তু মেয়েটি ক্রমে এত বড় হইয়া উঠিল যে, তাহার বিবাহ না দিলে আর চলে না। মধুসূদন ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকে পতনাশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিলেন। অগত্যা নবীনকে জমিজায়গা বন্ধক দিয়া মেয়ের বিবাহ

দিতে হইল। মধুসূদন পূর্ব্বপুরুষগণের নরকগমনাশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু নবীনের জমিজমা আর উদ্ধার পাইল না। তিন বৎসর পরে মহাজন তাহার সাত বিঘা জমির মধ্যে সাড়ে চারিবিঘা জমি নীলামে বেচিয়া সুদ আসল আদায় করিল। পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় দেখিয়া মধুসূদন তাহা কিনিয়া লইলেন। বেনামীতে যে টাকা ধার দিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ জমি কেনা হইল।

আড়াই বিঘা জমির আয়ে অর্দ্ধাশনে অনশনে নবীনের দিন চলিতে লাগিল। ইহার উপর চৌদ্দবছরের মেয়ে সুভাষিণী যে দিন শাঁখা লোহা ঘুচাইয়া ব্রহ্মচারিণী-বেশে আসিয়া বাপের পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল, সে দিন নবীন ম্যালেরিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহদেবতা রঘুনাথের দ্বারে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল; ভগ্ন দীর্ণ বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া শোকরুদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে শুধু ডাকিল, "বাবা রঘুনাথ!"

অদূরে রৌদ্রে কম্বল পাতিয়া মধুসূদন তখন জনৈক ছাত্রকে পাঠ দিতেছিলেন,—

"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

সুভা আসিয়া বাপকে টানিয়া আনিয়া ঘরে শোয়াইল।

তার পরও দিন চলিতে লাগিল, কিন্তু নবীনের দিন ক্রমেই অচল হইয়া পড়িতে লাগিল। নবীন স্থির করিল, "জ্বরটা একটু সারিলেই কলিকাতায় গিয়া অন্ততঃ পাচক-বৃত্তি দ্বারাও সংসারের এই দারিদ্র্য-কষ্ট দূর করিব।"

জ্বর কিন্তু সারিল না। দুরন্ত ম্যালেরিয়া তাহার দুর্ব্বল দেহকে দিন দিন আরও সবলে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। গ্রামের ডাক্তার অক্ষয় বাবু দিনকয়েক ঔষধ দিলেন, তার পর বিরক্ত হইয়া ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। নবীনও বিরক্ত হইয়া ঔষধ ত্যাগ করিল; কখন বা জ্বর ছাড়িলে দোকান হইতে দুই চারি পয়সার কুইনাইন কিনিয়া খাইত। কিন্তু কুইনাইনের পয়সাও সব সময় জুটিত না। দুধের পয়সা ত নয়-ই।

এই সময় গ্রামে একটা দলাদলি বাধিল। দলাদলিতে একটা তুচ্ছ অপবাদে দীনু হাজরাকে একঘ'রে করিবার চেষ্টা হইল। এই দীনু হাজরার নিকট নবীনের বাপ শ্রীবাস ঘোষাল অনেক সময় অনেক উপকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মধুসূদন ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা করিতে পারিলেন না, তিনি পাপী দীনু হাজরাকে ত্যাগ করিলেন। মূর্খ নবীন কিন্তু ত্যাগ করিতে পারিল না, সে দীনুর খুড়ীর শ্রাদ্ধে ফলার মারিয়া আসিল। ইহার ফলে নবীন ও তাহারই মত আর দুই চারি জন সমাজচ্যুত হইল। মধুসূদন পাপসংস্রবজনিত পাতকী কনিষ্ঠের মুখ দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। নবীনের কষ্টের উপর কষ্ট বাড়িল।

তার পর জ্বর ও কফ উভয়ের সম্মিলনে নবীনের অবস্থা একদিন এমন হইয়া উঠিল যে, সুভার মা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, ছেলে দুইটি কাঁদিতে লাগিল। সুভা ছুটিয়া জ্যেঠা মহাশয়কে ডাকিতে গেল, কিন্তু মধুসূদন মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিলেন না।

যত সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রোগীর অবস্থাও তত মন্দ হইতে লাগিল। বাড়ীখানার উপর একটা আশু অমঙ্গলের বিকট ছায়া যেন নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্য উপায় না দেখিয়া অন্ততঃ কাল-রাত্রিকালে একটা লোককে বাড়ীতে রাখিবার জন্য সুভা ভিকু বাগদীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে ছুটিল। হাড়ী, বাগদী ছাড়া কোনও ভদ্র-লোক আসিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে না, রঘুনাথ তখন এই ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

(৪)

রাত্রি তখন অনেক। ভিকুর মা ভাত চাপাইয়া উনুনের কাছে বসিয়া ভিকুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে এবং মাঘমাসের বিশ তারিখ আসিতে আর কয়দিন আছে, তাহাই হিসাব করিয়া দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে ঝিমাইতেছে। এমন সময় ভিকু আসিয়া ডাকিল, "মা!"

ভিকুর মা মুখ বাড়াইয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিল, "কে রে, ভিকু এলি?"

ভিকু দাবার উপর উঠিয়া বলিল, "হাঁ, এলুম, দশটা টাকা দেও দেখি।"

ভিকুর মা ছেলের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বলিল, "টাকা কি রে?"

ভিকু বলিল, "হাঁ টাকা, দশটা টাকা। তুই একবারে অবাক্ হ'য়ে গেলি যে। বা রে!"

ভিকুর মা বলিল, "অতগুলো টাকা কি হবে?"

রাগতভাবে ভিকু বলিল, "এই তোর ছরাদ হবে। ডাক্তারকে দিতে হবে, আবার কি হবে। ডাক্তার বেটা কি কঞ্জুষ, বলে, আগে টাকা দাও, তবে যাব। শীগ্‌গীর দে, শীগ্‌গীর!"

উনুনের ভিতর দুইখানা ঘুঁটে ফেলিয়া দিয়া ভিকুর মা বলিল, "তা টাকা কোথায়?"

"ঐ যে হাঁড়ীর ভেতর নেকড়ায় বাঁধা।"

"তাই বুঝি ভেবেছিস্, ঐ থেকে দিবি বুঝি?"

"তা নয় তো কি ডালিমতলায় আমার বাবার টাকা পোঁতা আছে? বা রে!"

ভিকুর মা। ওরে বাপ রে, ওর একটি পয়সা আমার গায়ের রক্ত। ও যে তোর বিয়ের জন্যে আছে রে।

ব্যগ্রতার সহিত ভিকু বলিল, "আছে তো আছে, এখন দে।"

"তার পর বিয়ের কি হবে? বিশে যে তোর বিয়ে।"

"চুলোয় যাক্ বিয়ে। বামুন মরে, বলে তোর বিয়ে। বা-রে! শীগ্‌গীর দে, শীগ্‌গীর।"

ভিকুর মা রাগিয়া বলিল, "বিয়ে চুলোয় যাবে, আর এমনি আইবুড় থুব্‌ড়ো হ'য়ে থাক্‌বি?"

ভিকুও রাগিয়া বলিল, "হাঁ থাক্‌ব, তোর বাবার কি? বিয়ে আমি ত কর্‌ব, আমি বল্‌চি, তুই টাকা দে।"

বুড়ী বলিল, "আমি দেব না।"

মাটীতে পা ঠুকিয়া ভিকু চীৎকার করিয়া বলিল, "তোর বাবা দেবে। ভালয় ভালয় না দিস্, হাঁড়ি-কুড়ী ভেঙ্গে বের ক'রে নেব।"

বুড়ী তখন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কেরোসিনের ডিবাটা তুলিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল এবং টাকার পুঁটুলীটা আনিয়া ভিকুর সম্মুখে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে তোর টাকা, নিয়ে যা খুসী কর্, আমার ত বোয়েই গেল। আমি গেলে মুখে জল দেবে কে?"

ভিকু বাক্যব্যয় না করিয়া পুঁটুলীটা তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বুড়ী ডাকিল, "সব নিয়ে যাস্ যে রে? ওরে ভিকে, ও হতভাগা, ওরে অ-অপ্পেয়ে!"

হতভাগা ভিকু তখন নৈশ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বুড়ী মাথায় হাত দিয়া দরজার উপর বসিয়া পড়িল। নির্ব্বাপিত চুল্লীর উপর ভাতের হাঁড়ি নিঃশব্দে বসিয়া ধোঁয়া হজম করিতে লাগিল।

(৫)

ভিকু দুই দিন ঘরে আসিল না, বুড়ীও রাগে ছেলের খোঁজখবর লইল না। কিন্তু তৃতীয় দিনের প্রভাতে আর থাকিতে পারিল না; ছেলের খোঁজ লইবার জন্য নবীন ঘোষালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বুড়ী ডাকিল, "ভিকু!"

ভিকু বড় ঘরের দাবার একপাশে একখানা চট মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল; পাশে নবীন ঘোষালের ছেলে দুইটি কাচা গলায় গায়ে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়াইয়া বসিয়াছিল। মায়ের সাড়া পাইয়া ভিকু উঠিয়া বসিল; বলিল, "মা এসেছিস্?"

বুড়ী বলিল, "আস্‌ব না তো কোন্ চুলোয় যাব বল্। পোড়া ভগবান্ যে আমাকে মা ক'রে দিয়েছে রে নচ্ছার।"

ঈষৎ হাসিয়া ভিকু বলিল, "রাগ করেছিস্ মা? তা রাগ হ'তেই পারে, তোর কত কষ্টের টাকা! টাকাগুলা নেহাৎ বরবাদে গেল মা, ডাক্তার বেটা গালে চড় মেরে নিলে। বামুনও বাঁচ্‌ল না, আমার বিয়েটাও হ'লো না।"

ভিকুর মা মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে। এখন ঘরে চল্।"

ভিকু দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, "হাঁ, এবার যাব বৈ কি। উঃ, গা-গতর যেন ভেঙ্গে পড়্‌ছে। তুই কিছু ভাবিস্ না মা, আর গোটা দুই ধাড়ী এনে দেব, তা হ'লে এক বছরেই আবার বিয়ের টাকা জমে যাবে। এবার আর বামুন মর্‌বে না। এখন এই ছেলে দুটোর কি হবে, তাই ভাব্‌চি। আর ভাব্‌চি, কি চামার ঐ বড় কর্ত্তা?"

ভিকুর মা বলিল, "কেনে?"

"কেনে? এমন ব্যামো, একবার উঁকি দিলে না। তার পর লোকটা ম'রে প'ড়ে, বাড়ী শুদ্দু হাউ-চাউ, দরজাটি পর্য্যন্ত খুল্‌লে না। আমি গিয়ে কত ডাকা-ডাকি কাঁদাকাটা কল্লুম, তা আমাকে শ্যাল-কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তেড়ে দিলে। বামুন অত শাস্তর আওড়ায়, কত ঠাকুর-দেবতার কথা বলে, আমি জান্‌তাম, বামুন খুব ধম্মিষ্টি। ধ্যেৎ তোর শাস্তরের কাঁথায় আগুন। এখন ছেলে দু'টোর কি হয় বল্।"

বুড়ী বলিল, "হবে আর কি? ওরা বামুনের ছেলে, ওদের ঠাকুর-দেবতা আছে, ঘরে ঠাকুর বাঁধা, ওদের ভাবনা কি?"

ভিকু বসিয়াছিল, লাফাইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "ঠিক বলেছিস্ মা, বড্ড কথা মনে ক'রে দিয়েছিস্, পায়ের ধুলো দে।"

হাত বাড়াইয়া মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া ভিকু মাথায় দিল। মা হাসিয়া বলিল, "এই দেখ, পাগল আর কি?"

ভিকু বলিল, "বা রে, আমি পাগল? তুই মা, তার ওপর এত বড় একটা কথা মনে করিয়ে দিলি, তোর পায়ের ধুলো নেব না? বা রে!"

তার পর ছেলে দুটোর হাত ধরিয়া ভিকু বলিল, "আয় রে ভাই, তোদের ঠাকুরের কাছে আয়।"

ছেলেদের হাত ধরিয়া ভিকু দ্রুতপদে ঠাকুরঘরের দরজায় উপস্থিত হইল এবং দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "ঠাকুর, এই দু'টি বামুনের ছেলে, এদের কেউ নাই, তুমিই এদের বিহিত ক'রো।"

তার পর ছেলেদের দিকে চাহিয়া বলিল, "গড় কর্।"

ছেলেরা ঠাকুরকে প্রণাম করিল। ভিকুও মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতে

যাইতেছিল, সহসা বাহিরে খড়মের খটাখট্ শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল, উগ্রমূর্ত্তি বড় কর্ত্তা ও তাঁহার পিছনে দীনু হাজরা।

চৌকাঠের ওপারে থাকিয়াই মধুসূদন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেরো বেটা বেরো, বেটা বাগ্দীর আস্পর্দ্ধা দেখ, ঠাকুরঘরে ঢুকেছে! সর্ব্বনাশ করলে!"

সহসা যেন ভিকুর চমক হইল; সে শিহরিত-দেহে শুষ্কমুখে পশ্চাৎপদ হইয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অপরাধীর ন্যায় ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "অপরাধ হ'য়েছে বাবাঠাকুর, আমার মনে ছিল না।"

মুখভঙ্গী করিয়া মধুসূদন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মনে ছিল না! বেটা সব নষ্ট ক'রে দিলি? এর ওপর আবার পঞ্চগব্য ক'রে ঠাকুরকে নাওয়াতে ওদের খরচ হবে।"

"হয় হবে। ঠাকুর তো তোমার নয় মশায়, যাদের ঠাকুর, তারা বুঝ্বে।"

বিস্মিত মধুসূদন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, বক্তা দীনু হাজরা। বিকৃত-মুখে উচ্চকণ্ঠে মধুসূদন বলিলেন, "আমার ভাইপোদের ঠাকুর আমার নয়, বটে! তুমি কে হে? এখানে কি মনে ক'রে?"

দীনু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "এমন কিছু মনে ক'রে নয় বাবাঠাকুর, এই রঘুনাথ-জীর নামে এই কিছু—এই হাজার দশ টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি ক'রে দিয়েছি,সেবায়েত নবীন খুড়ো পুরুষানুক্রমে তার ভোগদখল কর্বে, তাই বল্তে এসেছি। মনে করে-ছিলাম, রেজেষ্টরী ক'রে তবে খুড়ো ঠাকুরকে বল্ব। তা তার আগেই তিনি মারা গেলেন, তাঁকে আর শোনাতে পার্লাম না। কপাল আমার!"

দীনু কপালে হাত চাপড়াইল। মধুসূদন হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে ডাবা হুঁকাটা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। হুঁকাটা সামলাইয়া লইয়া, দীনুর উপর একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভিকু এতক্ষণ চুপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল; সে তাড়াতাড়ি উঠানের ধূলিরাশির উপর লুটাইয়া পড়িয়া, হর্ষোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর, তুমিই সত্যি!"

তখন মধুসূদনের আটচালায় বসিয়া জনৈক ছাত্র উচ্চৈঃস্বরে কণ্ঠস্থ করিতেছিল,—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

এবং নবীনের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া এক বাবাজী মান্দরার তালে তালে গ হিতেছিল,—

"ভক্তিতে আমি চণ্ডালেরি হই,
অভক্তিতে আমি ব্রাহ্মণেরো নই,
ভক্তের তরে বলির দ্বারে বাঁধা রই,
ভক্তিতে যে ডাকে আমি শুধু তারি।"

আর?—আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নবীনের বাড়ীর ভিতরে দাওয়ায় কম্পিতকলেবরা ভিকুর মার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুভা বলিতেছিল, "মা, আজ হ'তে আমি তোরও বৌ!"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পূজার বিঘ্ন

ধুম লেগেছে পূজাবাড়ীর বাজ্‌ছে ঘন ঢক্কারোল,
কত লোকের আনাগোনা হচ্ছে সদা হট্টগোল;
খাচ্ছেন সব ব্রাহ্মণেরা চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়,
গৃহিণীর বা মন যোগাতে বেঁধে লয়ে যাচ্ছে কেহ।
ভূরিদানে প্রাচুর্য্যেতে পাতের কাছে স্তূপাকার,
দিচ্ছে তবু ঢাল্‌ছে তবু ভক্ষ্য ভোজ্য বারংবার।

মহামায়ার মহাপূজার সমাগত সন্ধিক্ষণ,
নৈবেদ্য ভোগের রাশি হচ্ছে কত আয়োজন;
দাঁড়িয়ে আছেন গৃহস্বামী গললগ্নীকৃতবাসে,
পুত্র কন্যা পাত্র মিত্র দাঁড়িয়ে আছে আসে পাশে;
"শূদ্রদের সব তাড়িয়ে দাও পূজার লগ্ন উপস্থিত,
"গঙ্গাজল ছড়িয়ে দাও" বল্লেন ডেকে পুরোহিত।

শীর্ণ শরীর ভিক্ষু বালক অন্ধের এক হস্ত ধ'রে,
"ভিক্ষা পাই মা, পাইনি খেতে" বল্লে কাতর করুণ স্বরে;

"পূজার সময় শূদ্র এলো কে আছিস্ রে তাড়িয়ে দে,
আবার পুনঃ ভাল ক'রে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে।"
চাকরেরা ছুটে এসে তাড়িয়ে দিল গলা ধ'রে,
পূজার বাদ্যি উঠ্‌ল নূতন ক'রে আড়ম্বরে!

মহাষ্টমীর গভীর রাত্রি পূজার কাণ্ড গেছে থেমে,
নিদ্রাসুখে মগ্ন সবাই সারা দিনের পরিশ্রমে;
স্বপ্ন দেখেন গৃহস্বামী বলেন যেন মহামায়া,
"সারা দিনটা উপবাসী কিছুই আমার হয়নি খাওয়া।"
"কি অপরাধ কিবা ক্রটী পূজার কি মা ব্যাঘাত হ'ল'
পূজার সময় ভিক্ষু ব্যাটা ভোগ কি তোমার দেখ্‌তে পেল।"

"জানিস্ না ওরে মূঢ় কি বলিয়ে মন্ত্র পড়িস্?
যা দেবী সর্ব্বভূতে তাহার কিছু মর্ম্ম বুঝিস্?
সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আমি সবার ক্ষুধাই আমার ক্ষুধা,
বিশ্ব ছেড়ে আমায় শুধু মূর্ত্তিমাঝে পাবি কোথা?
যা দেবী সর্ব্বভূতে দয়ারূপে সংস্থিতা,
শুধুই কি সে বৃথা মাত্র অর্থবিহীন বাক্য কিবা?

আমার ক্ষুধা সর্ব্বভূতের আমার পূজা সর্ব্বলোকের।
আমার তৃপ্তি তুষ্টি করা সেবা করা সর্ব্বদেহের;
ক্ষুধায় যদি পায় না খেতে একটি কোন বিশ্ববাসী,
আমার ক্ষুধাও মেটে না রে আমিও থাকি উপবাসী;
বিশ্ব প্রাণের একটি প্রাণ কেউ রে যদি ক্ষুধায় জ্বলে,
পূজা আমার হয় না ওরে বিল্ব-জবা-গঙ্গা-জলে।"

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

কমলের দুঃখ

(কমল—অমর)　　　　　　　　বিলাসপুর।

সোদরপ্রতিমেষু

আজ কয়দিন হ'ল এখানে এসেছি, এসে তোমায় কোন চিঠি দিতে পারি নি। কারণ, মন ও শরীর দুই-ই ভাল ছিল না। জমিদারীর সে মামলার কথা শুনেছ ত' —সেই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আর এই অযথা মনের উপর কতকগুলো দৌরাত্ম্য করে—মনটা যেন খাঁচা ছেড়ে পাখীর মত উধাও হয়ে উড়ে এল। এ নির্জ্জনে এসে যেন একটু আরামে আছি। সংসারের এই সব কোলাহল, থেকে এখানে যেন একটু ফাঁকায় খোলা হাওয়ায় প্রাণটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। তবু কেমন পাজী মন, সে কেবল সেই বাড়ীর কথা, এর কথা, তার কথা, এর কি হবে তার কি হবে —নিজের ত কথাই নেই—এই নিয়ে দিনরাত যেই ফাঁক পেয়েছে, অমনি এসে লড়াই বাধিয়েছে—ভাবি যত এ সব ভাব্‌ব না, তবু মনের ফাঁকি, ভাবনা ফুরোয় না···

দেখ অমর! তোমার কাছে সকল কথা বল্‌তে পারি, তোমার কাছে মনটাকে তার নানা ছাঁদ থেকে যেমন সোজা ক'রে বল্‌তে পারি, এমন আর কার কাছেই পারি না—সে দিন, যে দিন আমি এখানে আসি, কি জানি কি মনে হ'ল,—ইচ্ছা হ'ল, ছুটে গিয়ে মায়াকে দেখে আসি, কেন, তা জানি না, প্রাণের ভেতর এমন কর্‌তে লাগ্‌ল, সে আমি ভাষায় বর্ণনা কর্‌তে পারি নে—তার পর মন কত ক'রে তবে ফেরে—কি দুর্ব্বলতা! যা সত্য নয়—যা ভুল, তার জন্য মানুষ কি রকম ছোটে। হায়, মানুষের ব্যাকুল বাসনা, প্রতিপদে গণ্ডি দিয়ে নিজেকে নিজের কামনার ফাঁদে ফেলে! সবই আমার ছিল, সবই আমার আছে, কিন্তু মায়ার কি হ'ল। এখন মনে হয়, কোন অশুভক্ষণে আমি জন্মালাম যে, সবাই আমার জন্যে কষ্ট পেলে, আমার প্রতি পদে মনে হচ্ছে—নগেন—নাই হোক মার পেটের ভাই, কিন্তু উভয়ে ত কখন তফাৎ ভাবিনি। তার এ দুর্দ্দশার কারণ কি আমি নই? আমিই বুঝি তার পতনের কারণ—আজ আমার ভুলেই তার এ অধঃপতন নয় কি? তার পর মায়া—তার কথা ত ছেড়েই দাও, সারা জগৎ উল্টে গেলেও আর তার বদল হবে কি? কেন এ হল আমি কি করব। কি জানি মনে হয় আমি যদি তাদের মিলনের মাঝে ধূমকেতুর মত আগের পুচ্ছ নিয়ে না আস্‌তাম, আজ হয় ত সংসারে এমন হ'ত না—আজ হয় ত মায়া তার নারী-জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি কর্‌তে পারত।

যেখানে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সংসার হেসে ঢল ঢল করৃত, সেখানে আজ মেঘে মেঘে আঁধার—ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর তীব্র কশাঘাত, আর বজ্রপতন। অথবা অদৃষ্ট আমাদের মাঝে এই ধূমকেতুকে পাঠিয়ে সব জ্বালিয়ে দিলে।

আমি আজ দেখ্‌ছি, যে সব জিনিষেরই একটা সময় আছে, মানুষ ঠিক সময়েই জন্মায়, ঠিক সময়েই মরে। ফুলের ফোট্‌বার সময় ফুল ফোটে, ঝরবার সময় ঝ'রে যায়—একটা সময় আসে গড়্‌বার, একটা সময় আসে ভাঙ্‌বার। যাকে ভাঙ্‌তে হবে, আমি তাকে গড়্‌তে গিয়েছিলাম, এই বিষম ভুলে আজ সব নষ্ট হ'ল। কি করৃব। আমার যাতনার চেয়ে মায়ার যাতনা আরো সহস্র গুণ বেশী, কিন্তু কি করৃব। আমিই কি সহ্য করিনি—আমি কি কিছুই এ যাতনার অংশ পাইনি। যখন বুঝ্‌লাম যে, আমা হ'তে মায়ার সকল বিষয়েই ক্ষতি হচ্ছে, আমার বুক ফেটে গেছে, প্রাণ পুড়ে গেছে, তবু হেসে হেসে সে সব সহ্য করিনি কি? রাত্রে যখন নিশুতি হয়েছে, সেই বাগানের পাথরের পর পড়ে মুখ রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে কেঁদেছি, কত ডেকেছি তাঁকে—বলেছি মৃত্যু দাও, নয় এ বন্ধন হ'তে মুক্তি দাও—কই, সে ত শোনেনি—কেউ শোনে না; কেই বা আছে, তা হ'লে, থাকলে আমাদের এ যাতনার কথা ভুলিয়ে দিত,—আ মর! আমিও অনেক সয়েছি—অনেক—অনেক। যে দিন প্রথম শুন্‌লাম যে, নগেনের সঙ্গে মায়ার বিয়ে—আর নগেনের তায় খুব মত—সেই দিন হতেই নিজেকে বাঁধ দিতে শিখেছি—দিনে দিনে অনেক শিখেছি—ভাই অমর! মাতৃহীন, শৈশবে মাতৃহীন আমরা দুজনেই—আমি চিরদিনই তার আনন্দ, তার সুখের জন্য—তার মঙ্গলের জন্য ক'রে এসেছি—কিন্তু যে দিন বিদ্রোহ প্রকৃতি নিজের স্বার্থের সাধনে জেগে উঠেছিল—সে স্বার্থকে নষ্ট করতে কি আমায় একটুও সইতে হয়নি—যে দিন সকালে আশীর্ব্বাদ করতে যাই—দেখি নগেন হাস্‌ছে আর একজন কাঁদ্‌ছে—চোখ দিয়ে দুফোঁটা আগুনের মত জল তার হাতের উপর পড়্‌ল—সে কান্না রোধ করৃতে কি আমার একটুও সইতে হয়নি—সয়েছি—অমর! অনেক সয়েছি! এ আমার রূপের মোহ নয়, এ আমার কামনার ফাঁদ নয়, দিন দিন পল পল ধ'রে শিরায় শিরায় হৃদয়ের নিভৃত হৃদয়ে অনুভব কর্‌তাম, তার আরতি, তার পুজো, তার ভক্তি—মর্ম্মে মর্ম্মে দেহের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, কামনার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করেছি, ভাই রে! আমার এ ভালবাসা আকাঙ্ক্ষার, বাসনার তৃষা নয়, আমার ভালবাসায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আমি আছি তা আমার মনে থাকে না, যে দিকে চাই, দেখি মায়া! নদীজলে কলতান উঠে, আমি শুনি—ভাবি মায়ার অস্ফুট গীতাভাষ, ঐ বনান্তের দূর মর্ম্মরধ্বনি বাতাসে ভেসে আসে, আমি ভাবি, মায়ার নিশ্বাস, ঐ পাহাড়ীয়ারা পাগলের মত উন্মাদ সুরে দূরে বাঁশরী বাজায়, আমি ভাবি,

মায়ার অন্তরের করুণ সুর, ওই পাপিয়া সুরের পর সুর দিয়ে ডেকে ডেকে সমস্ত বন কাঁপিয়ে ওঠে, আমি ভাবি মায়া আমায় কেঁদে ডাকছে,—অমর! এ আমার ভাবের নেশা নয়, সত্যি বলছি, আমি এ উপভোগ করেছি; চাঁদ উঠেছে, সারা রাতই জ্যোৎস্নায় বসে তারি কথা ভেবেছি, ভাবে বিভোর হয়ে গেছি, কোথা দিয়ে সে রাত কেটে গেছে, তা ঠিক করতে পারিনি, যখন ভোরের হাওয়ায় গাছ দুলে উঠে, পাতায় পাতায় শিশির পড়ার শব্দের সঙ্গে লক্ষ পাখীর কলরব জেগে ওঠে, তখন চোখের পাতা ভিজে আসে, চমক ভেঙে যায়। ভাবতে নেই, তবু ভাবি। মন বুঝে কই! প্রেম বিচার ক'রে আসে না—সে যখন আসে, তখন একা আসে না, সমস্ত বিশ্বের প্রাণের নিশ্বাস নিয়ে নিজেকে মৃণালের মধ্য দিয়ে পদ্মের সহস্রদলবিকাশের মত আলোকে, জ্যোতিকে আরতি করতে করতে আসে। তখন তার দেশ কাল কিছুরই জ্ঞান থাকে না, আমি তা অনুভব করেছি। যখন প্রেম দেখা দেয়, তখন সে সবাইকে ভালবাসে—কাউকেও ঘৃণা করতে পারে না—যা দেখে, সবই তার পূর্ণ—সবই প্রতি নিমেষে নূতন অথচ সবই প্রাণের সৌন্দর্য্যভরা। প্রেম না ভাবলেও আসে।

দিন গেছে, একদিন মায়ার চিঠি পেয়েছি,—মনে হয়েছে, চারিদিকেই আগুন, আগুনের মাঝে একগাছা পাকান দড়ি যেমন পাক খেতে খেতে ছটফট করতে করতে পোড়ে, আমার ঠিক সেই রকম হ'ত। যদি কখন চোখোচখি হয়েছে—শরীরে যেন বিদ্যুতের জ্বালা ঢেলে দিয়েছে—সে দিন গেছে, এখন আর তা মনে হয় না—তবে মানুষ দুর্ব্বল—তাই কামনা জাগে, যুদ্ধে আহ্বান করে—বন্ধু—এ ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের কথা আর কত বলব বল। চারুবর্ণের একটা প্রজাপতি আলো দেখে উড়ছিল, যেখানে লাল, যেখানে হলদে, যেখানে রঙ, সেইখানেই উড়ে যাচ্ছিল, আমি বালকের মত তাকে ধরবার জন্যে ছুটেছিলাম, পায় পায় কাঁটা গাছে রক্ত ঝরল, তায় দিক্‌পাত নেই, শুধু ছুটেই চলেছি,—বিরাম নেই, তার পর দেখলাম, প্রজাপতি উড়েই যায় —বাধা দেওয়াই ভুল—কেমন উড়ছে দেখাই ঠিক। কেমন সব সেজে আছে সুন্দর—সুন্দর জগতে আমার সুন্দরও তার মাঝে কেমন আনন্দে হাসছে—রূপে রূপে ভ'রে রয়েছে আমি অনুভব করছি—আমি প্রকাশ করতে ঠিক পারছি না।

দাওয়ানজীর চিঠিতে শুনলাম, মায়া আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছে, আর নগেনের সে দিনকার ব্যবহার ও সমস্ত ঘটনাই আমায় জানিয়েছে, যাকে ভালবাসা যায়, সে দূরে থাকুক বা কাছে থাকুক, প্রাণে প্রাণে তন্ত্রীর মত আঘাত করে— তাই সে দিন তাকে দেখবার জন্যে অমন মনের ব্যাকুলতা এসেছিল—হায়! অমর,

এ দুঃখ সৃষ্টি কর্‌লে কে? কেন তার উপর এ যাতনার অভিশাপ। তোমার দিদিকে বল, তিনি যেন মায়াকে কিছু দিনের জন্য তাঁর কাছে নিয়ে যান—যদি এ অবস্থায় একটু মনের শান্তি হয়। অহর্নিশিই জ্বলে পুড়ে আছে, তার উপর এ কোন্ মেয়েতে সইতে পারে? দেখ ভাই! মনে কর না যে, আমি তাকে স্নেহ করি ব'লে তোমার কাছে তার জন্য বল্‌ছি, দারুণ, নিদারুণ মনের যাতনা সে ভোগ কর্‌ছে, ইন্দুদিদির পুণ্যময় সংসারে এসে, মিহিরের হাসি ও ইন্দুদিদির যত্নে যদি একটু ভোলে, একটু যদি এই উদ্‌ভ্রান্ত যাতনা ভুলে থাক্‌তে পারে, তাই বল্‌ছি। কিন্তু অমর! প্রেম বড় আশ্চর্য্য জিনিষ, আমার ভালবাসা যেমন আমায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তেমনি সেও ভালবাস্‌তে শিখেছে—যে ভালবাসে, তার কাছে কি সয়তানের জোর টেঁকে—সেখানে পাপ টেঁকে না—যে প্রাণ ভ'রে প্রাণ দিয়ে যে প্রেম কিনেছে—সে জগৎ কিনেছে জেন! ইন্দুদিদিকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁর কি মত। সংসারের কথা সে আমার চেয়েও ঢের বেশী বোঝে। যা ভাল হয় কর।

এখানে আমি যে বাঙলায় আছি, সেটা যদিও সহরের মধ্যে, তবু বড় নির্জ্জন, প্রকাণ্ড বাগান—প্রায় একশ বিঘের উপর—পিছনে নদী—নদী পেরুলেই পাহাড় আর জঙলা ঘাস, বনফুলের গাছ। বাঙলাখানা নদীর দিকেই—যার বাড়ী, সেও এই-খানে থাকে; তবে সে ওই বাগানের এক টেরে—একটা খড়ের ঘর। তার বয়েস হয়েছে—একটি মেয়ে আছে পাগ্‌লীর মত, প্রায় চোদ্দ পনের বছর বয়স—বেশ গান গায়; এই দেশে থেকে তুলসী দাসের রামায়ণ গান শিখেছে, এমন মিষ্টি গায়, আমাদের বাঙলা দেশে ছেলে-মেয়েরা অমন রামায়ণ গান গায় না। মেয়েটার নামটা বেশ—জবা, দেখ্‌তে বেশ সোন্দর। গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে পাতা ছিঁড়ে মাথাময় প'রে ব'সে থাকে। সারাদিনই পাগ্‌লীর মত বেড়ায়। হাসে—নাচে—গায়।

দাওয়ানজী লিখেছে, বৌদি বড় কান্না-কাটি করেন—একলা বাড়ীতে। মন আর এখন ফির্‌তে চায় না, বেশ আছি—দেখি। তুমি আমার স্নেহ নিয়ো—ইন্দুদিদি সুধীর, মিহির সকলকেই:আমার স্নেহ দিয়ো। ইতি

তোমার স্নেহের কমল।

(শৈল-কমল)

চিরঞ্জীবেষু—

আমাকে না ব'লে কেন চলে গেলি ভাই! আমি কি তোর পর, আমি কি তোর ভাল না দেখে জগতে কার ভাল দেখ্‌বার পথ পাই। তবে আমায় কাঁদিয়ে :কেন: গেলি ভাই! খুব সহজেই তোরা পর কর্‌তে পারিস্—কর্।

আমি বুঝ্‌তে এখন পারছি যে, কি থেকে কি দাঁড়াল—কিন্তু তোরও কি বুকের বল নেই, তুই সব ফেলে কেন এমন ক'রে চলে গেলি? তুই এখানে না থাকায় যাকে নিয়ে এমন কাণ্ড, তার কি দুর্দ্দশা হয়েছে, তা যদি দেখ্‌তিস্—তা কেউ সহ্য করতে পারে না। আমিই বা কেমন ক'রে এ সব সামলাব বল্। নগেন যা ক'রে বেড়াচ্ছে, তা আর আমি কি লিখ্‌ব—দাওয়ানজী তোকে সব জানিয়েছেন। আমিও আর পারিনি। সে রাত্রে ছুঁড়ী মরতে যায়। এমনি ক'রে সকল দিকেই কি মানুষের আগুন জ্বাল্‌তে হয়—আমি আর কি করব বল্, এত ক'রে যে মানুষ করলাম, তার শেষ বেশ তোরা দেখালি, এত দিন মানুষ নিয়ে প্রাণের হাসি দিয়ে কত ক'রে সংসার সাজায়ে বসে ছিলাম, তোরা প্রাণের সে হাসিটুকু মুছে দিয়ে, চোখের জলও শুখিয়ে দিয়ে একেবারে পাথর ক'রে রেখে গেলি—যা তোদের মনে আছে, যা তোদের প্রাণ চায়—তাই কর্—আমায় পাথর করেছিস্, আমি এবার থেকে পাথর নিয়েই রইলুম। তাকে বলেছি, আর আমার কাউকে চাই নি, যার যা ইচ্ছে, সে তাই নিয়ে থাকুক। আমি আমার পাথর নিয়ে রইলুম।

তবু একবার বল্‌ছি, বাড়ী আয়, এসে সব দিক্ তাকিয়ে কাজ কর্—আমি তোদের কোন কথাতেই আর থাকব না। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হস্—যশস্বী হস্। প্রাণের টান, মায়ার টান কি ছিঁড়ে ফেলা সোজা কথা রে। তায় মেয়ে মানুষ। ইতি

তোর স্নেহের
বৌদি।

(ইন্দু—কমল)

তোমার বুদ্ধি দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। তোমাদের যে কোন্ বিধেতায় গড়েছিল, তা আমি ঠাওর করতে পারি নি– দেখ্‌তে পেলে তার নাক কেটে ঝামা ঘসে হাত দুখানা সঙ্গে সঙ্গে নুলো ক'রে দিতাম। জিজ্ঞেস করতাম, কোন্ মাটীতে তোমাদের গড়েছে, বাঙলার ত' নয়। এমনত দেখিনি বাপু, যত খেয়াল কি তোমাদের মাথায়ই গাঁজিয়ে ওঠে। এ কি অনাছিষ্টি কাণ্ড—মা মা! আমি বাপু আর পারি নি। ভালবাসা ভালবাসা ক'রে যে সব মরে, যাকে যে ভালবাসে, তার জন্যে না তার আপনার জন্যে? তুমিত' প্রেমের দায়ে বিবাগী, ইনি প্রেমের দায়ে নিথাগী, বলেন, আমি মরে যাব—ভ্যালা যা হোক সব প্রেম করতে শিখেছিলে। তিনি ব'লে পাঠালেন—দিদি আমায় নিয়ে যা, আমায় বাঁচা—তুমি সেখান থেকে লিখ্‌লে—তাকে নিয়ে এসো। ইন্দুদিদি কি করবে বল। কত দিক্ সে সামলাবে। তোমার ঘটে

কি একটু বুদ্ধি নেই? সে না হয় মেয়ে মানুষ, প্রাণের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে এমন আস্‌তে চেয়েছে, তুমি পুরুষ মানুষ—তুমি কি ব'লে এ সব কথার মধ্যে এস। বল্‌বে টানে। অধিকার। তোমাদের আর কি বল্‌বে—

"এক ভস্ম আর ছার—
দোষ গুণ কব কার"

দুই সমান—দুই পাঁশ। ছিঃ! লোকের সংসারে কত ঘটে, তাই নিয়ে কি অত টলাটলি গলাগলি ভাল? স্বামীর ধমকে মেয়ের একেবারে অভিমান উথ্‌লে উঠ্‌ল—আর তোমার অমনি কবির কাব্য আরম্ভ হ'ল। কি বল্‌ব—যদি আজ আমার সাম্‌নে থাক্‌তে। মায়া, আমার বোন্‌—আমি তার আপনার দরদী—বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, এ কোন মেয়েই সইতে পারে না—কথাও খুব খারাপ, তা হলে কি হবে—সইতেই হবে। নইলে নগেন যে আরও খারাপ হবে। খারাপ হবার বাকী কিছুই সে রাখেনি—তবু যেটুকু উপায় থাক্‌ত, তাও ঘুচে গেল। আমার বোন্‌ আমি ফেল্‌তে পার্‌ব না। কি কর্‌ব, অত কান্নাকাটীতে আমি বাধ্য হ'য়ে নিয়ে এসেছি।

অমর তোমার চিঠির কথামত আমায় সব বলেছে, আর আমিও তোমার চিঠি পড়েছি। ভাই কমল! কি কর্‌ব ভাই বল, জানি—বুঝি, তবে একটা কথা আমার বল্‌বার আছে। স্বামী স্ত্রীলোকের ইষ্ট, তা থেকে মন নিলে সে মন কি আর জগতে স্থান পায়। এ সে আপনি চেনে—ইষ্ট থেকে যদি নিয়ে যাও, তবে কি হবে বুঝ্‌তে পার কি? তার পর তোমার কথা—তুমি ত এত বোঝ, কিন্তু কোন্‌ অধিকারে তুমি পরস্ত্রীকে ভালবাসি ব'লে লোকের কাছে বল্‌তে চাও—তুমি পুরুষ মানুষ, যে পুরুষ হয়, সে কি পরস্ত্রীর প্রেমের কথা পাড়ায় পাড়ায় কয়ে বেড়ায়, আর কি বল্‌ব বল—এইতে যা বোঝ্‌বার, তা বুঝ। যে বিয়ে না ক'রে রমণীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে, সে উন্মত্ত পশু আর যে বিবাহিতা পরস্ত্রীর প্রেম চায়, সে উন্মাদ পিশাচ। আমি আশা করি নি—যাকে আমি ভাই ব'লে আপনার করি, সে এমন পিশাচ হবে। ধিক্‌! যার ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার নেই, সে কি মানুষ?

যে ভুল একবার করে, সে দশবারও কর্‌তে পারে, যে দুর্ব্বল, তার ত পদে পদেই পা পিছলায়—তুমি আমার ভাইয়ের মত, তুমি ত দুর্ব্বল নও, তুমি কেন বার বার ভুল কর্‌বে—আমার কথা শোন—বাড়ী ফিরে এস, বিয়ে কর, যে শান্তি যে সুখ চাও, তার তখন কোন অভাব হবে না। আর মায়াও তা হ'লে ভুল্‌তে শিখ্‌বে, পার্‌বে, ছাড়্‌তে মন হবে। যদি—আরো এক কথা—যদি সত্যিই তুমি মায়াকে ভালবেসে থাক, যদি তার মঙ্গলই তোমার মনুষ্যত্ব বলে মনে হয়, তবে

নিজের দুঃখ অশান্তি ভোগ করেও বিয়ে কর; কেন না, তুমি বিয়ে কর্‌লেই মায়ার মতি ফির্‌বে—সেই তার মঙ্গল। এ ত্যাগ যদি না কর্‌তে পার, তুমি তা হ'লে কখন ভালবাস নি!!! আমরা পুরুষের মনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা গতি বুঝ্‌তে পারি, তোমাদের এ উদ্দাম পাহাড়ভাঙা তৃষা ঝরণার জলেই মিটে, সাগর অবধি ধেয়ে যেতে হয় না। লক্ষ্মী ভাই আমার, জগতে যদি তোমার কোন বড় কাজ কর্‌বার সাধ থাকে, তবে আগে নিজের ঘরের ছোট কাজ এক এক ক'রে শেষ কর, সংসার পাত—পাতা সংসার দিনে দিনে সারা জগতে ব্যাপ্ত হয়ে যাবে, তুমি সামান্য মায়ার মায়া ভুল্‌তে পার্‌ছ না, তোমার দ্বারা কি হবে! আমরা যখন স্বামীকে দেখি, জগতের কথা মনে থাকে না—তা ব'লে কি আমরা জগতে নেই—তোমরাও তেমনি সব ভুলে সংসার দেখ—দেখ সব জীবন সার্থক হয়ে এসেচে।

দেখ, মেয়েমানুষ জাতটা ইস্পাতের মত—খুব ধার দেওয়া চলে, একটু বেকিয়েছ, অমনি দাঁত পড়ে গেছে। আমাদের মনটা আমরা যত বুঝি, তোমরা ঠিক কি তা বোঝ! তা হ'লে অমন পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে বনে মন খুঁজে বেড়াতে যেতে না। স্বামীকে নারী পূজো করে, সে পূজোর মানে কি জান, আমাদের সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ এক হয়ে সব ওই এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। সীতা যখন রামচন্দ্রের কথা ভাব্‌তেন, তখন তাঁর অশোকবন, চেড়ীর প্রহার, রাবণের উন্মত্ত লাঞ্ছনার কথা, নিজের হাত পা চোখ কান এর কিছুরই জ্ঞান থাকৃত না; আমরাও সেই সীতার অংশ, আমরাও আমাদের রামচন্দ্রকে সেইরূপেই দেখি, স্বামীই আমাদের সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আছে, এমন একটু জায়গা নেই, যেখান থেকে দুটো ফুল কুড়িয়ে তার পায়ে দেব। আমরা নিজেরাই ফুল হয়ে তার পায়ে পড়ে আছি। আমাদের প্রণাম পর্য্যন্ত কর্‌বার অধিকার চলে গেছে। ওই পূজোর ফুল হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। সূর্য্যমুখী ফুলকে যদি সূর্য্যের কাছ থেকে তফাতে রাখ, সে কি এ লহমাও বাঁচবে—কথন নয়। স্বামী যেমনই হক, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব; তাকে সেখান হতে যে তফাৎ করে, সে মহা পণ্ডিতই বটে। স্বামীর আদর যে পায় না, তার মত দুর্ভাগিনী আর কে? আমরা ত আমাদের জীবন সার্থক বলেই মনে করি, তবে আমার স্বামীর মত স্বামী কার হয় না। সকলের অদৃষ্ট সমান নয়, সকলেই কি সমান সুখ ভোগ করে? নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভাল। তা নয়, তাকে খুঁচিয়ে ইচ্ছা ক'রে যত জ্বালা নেবার কি দরকার?

আমি মেয়েমানুষ, সকল কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারি নি। তোমাদের অন্যায় দেখি—রাগ হয়, দুঃখ দেখি—যাতনা পাই, তাই বলি। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তোমার কাঁচা বয়স, এখন থেকে যদি সংসারের আঘাতগুলো বুক পেতে না সইবে—তবে কি হবে? এ সংসারে কত কি সইতে হয়।

নগেনের অবস্থা যা শুনি, সে আর লোকের কাছে বল্‌বার নয়; কি কর্‌ব, তুমিও ত বিষয়ভাগে মত দিয়ে আরো বাড়িয়ে দিলে। বিষয়ভাগ না হলেও দেনা কর্‌ত—যে মজ্‌বে, তাকে কে ধ'রে রাখ্‌বে? ঠাকুরঝি সে দিন কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। মনে ত তাঁর এ সব লাগ্‌ছে। অর্থ, শরীর, মান-সম্ভ্রম সবই নষ্ট কর্‌ছে।

আমরা সকলে ভাল আছি। মিহির রোজই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে—আমার আপেল এনে দিলে না।

ভাই, আমার ওপর রাগ কর না—বোন্‌ ব'লে স্নেহ কর, তাই এত জোর করি। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও। ইতি—

তোমার স্নেহের ইন্দুদিদি।

(নগেন—মায়া)

প্রিয়তমে !

আমার ওপর রাগ কর না—তুমি সে দিন যদি সোনার কৌটোটা নিয়ে অমন না কর্‌তে, আমিও থিয়েটারের রাত্রিতে তোমার সঙ্গে অমন কর্‌তাম না, আমি তখন বুঝ্‌তে পারিনি,—নেশার ঝোঁকে হারুমাষ্টারের কথায় ওরকম একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি—আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার স্বামী হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি যদি ভুল করি, তুমি তা শুধ্‌রে নাও না কেন? আমি তার পরদিন যখন ঘরে এলাম, ঘরটা যেন খাঁ খাঁ কর্‌ছে, মনে হ'ল, দেওয়ালগুলো পর্য্যন্ত আমার অন্যায়ের জন্য তিরস্কার কর্‌ছে, তুমি গৃহলক্ষ্মী। আমার এ ঘর আঁধার ক'রে রেখ না। আমার দোষ আছে জানি, আমি তাকে ছাড়্‌তে চাই—পারি না, কি এক মাদকতার মোহে আমায় যেন জড়িয়ে ধরে, আমি দিক্‌হারা হয়ে অন্ধের মত সেই সুখের মত্ত-তায় ডুবে যাই। তুমি কেন জোর ক'রে আমায় বাঁধন দাও না। তুমি কি আমার—লোকের স্ত্রী যেমন ব্যভার করে, বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত কখন একদিনের তরে সে ব্যভার করেছ? ফুলশয্যার রাতে আমি উন্মাদের মত তোমার পানে চেয়েছিলাম, তুমি একটা কথাও কওনি। তার পর থেকে যখনই দেখা হয়েছে, ঝগড়া ও খিটুখিটু ছাড়া আর স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্কই নেই। সে কি আমার দোষ। তুমি ভেবে দেখ, তুমিই আমাকে আমার এই সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে এসেছ। থাক্‌, সে আমি মাথায় পেতে নিলাম—আমায় ক্ষমা কর, ঘরে এস। সত্যি, আমার মনে বড় অশান্তি, এস এস, তোমার পায়ে ধরি এস, আর আমাকে উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল সুখের পথে চল্‌তে দিয়ো না—এই আমার মিনতি। উন্মত্ততা যখন এসেছে, তখন ফির্‌তে পারব কি না তাই সন্দেহ হয় ত পরে উন্মাদ হব।

বউদি কাল আমায় ডেকে অনেক বোঝালে, আমি তার পর থেকে বেশ ভাল আছি। তুমি এস—যদি অমন ক'রে রাগ ক'রে থাক, তবে আমি কি কর্‌ব, তা জানি না। এক একবার মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কাল ছায়া পড়ে, আমার পাপ মন, মনে হয়, তাই বুঝি আমার স্ত্রী পরের মত—কিন্তু সে ভুল আমার পাপ মন, কত কি মনে করি। সে যে অভাবনীয়। তবু কে জানে কেন থেকে থেকে কি সব জেগে ওঠে। থাক, সে কথা মনে কর্‌তেও নেই।

তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার সংসার, তুমি যদি ফেলে দাও, তবে কোথায় দাঁড়াই। বউদি বল্‌ছিল, তোমায় নিয়ে বেড়াতে যেতে, চল আমরা বেড়াতে যাই। চল, ওয়ালটিয়ার ত তোমার এত ভাল লাগে, চল সেখানেই যাই। আমি সব ঠিক করেছি। আজই এস। তোমার দিদিরা সকলে আশা করি ভাল আছেন। লক্ষ্মী, রাগ কর না, আজই এ'স। ইতি—

'ন'

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

মন্ত্রপূতা

এ কি প্রেম-মন্ত্রে দেব দিলে মোরে পূত করি,
গুপ্ত জ্ঞান অহমিকা ধূলি সম পড়ে ঝরি—
সে ঐ লুটায় এবে বিশ্বের চরণতলে
অবিরত আঁখিধারে সিক্ত ক'রে ভূমণ্ডলে।
নবীন জীবন এ কি নবভাবে ওত-প্রোতঃ
কুলু কুলু বহে চলে প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোত।
প্রচণ্ড বৈশাখ যথা স্বীয় তেজে ঝলসিত
আপন উত্তাপে ক'রে হৃদি সব বিশোষিত।
সেথা নব কাদম্বিনী আনমিত জলভারে
(যেন) বর্ষণ-উন্মুখ করি আছে প্রশমিত ক'রে।
যে তন্ত্রী বিকল ছিল হৃদয়-বীণার মাঝে
স্পর্শিলে কেমনে তারে সে যে নব সুরে বাজে,
আকুল ক্রন্দন উঠে দুবাহু প্রসারি ধায়,
জানি না কাহারে পেতে তৃষিত নয়নে চায়।
করুণ নয়ন দুটি বরষে করুণা-ধারা
সহাস প্রশান্ত মূর্ত্তি আধি-ব্যাধি-তাপ-হরা।
বিলম্বিত জটাজাল চরণে পড়িছে লুটে,
প্রসন্ন আনন হ'তে পূত স্তোত্র-ধ্বনি উঠে,
(পুনঃ) লুপ্ত তপোবন-স্মৃতি উদিত ভারত-মাঝে
কে তুমি হে প্রেমময়! উদিত উদাসী সাজে,
যে শির হ'তো না নত কোন মানবের পায়,
লুন্ঠিলে তাহারে ধরা কোন্ মন্ত্র-মহিমায়?

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*

এক শ্রেণীর মনুষ্য আছেন—যাঁহারা জাতির সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া, আসন্ন-সঙ্কট হইতে বিপন্ন জাতিকে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া চলিয়া যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের প্রথম সংঘাতে আহত ও ক্ষুব্ধ আমরা যে দিন সহসা অন্ধকারে চক্ষু মেলিয়া প্রমাদ গণিয়াছিলাম, সে দিন দেখিয়াছিলাম রাজা রামমোহন রায়!

রামমোহন হইতেই ঝড় উঠিয়াছিল। সেই ঝড় অল্লাধিক প্রায় শতাব্দীকাল বাঙ্গালী সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সংস্কারের ঘূর্ণাবর্ত্তে এক শতাব্দীকাল বাঙ্গালী সমাজ তাড়িত, চালিত, আহত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ফলে তাহার কত অঙ্গ বিকল, কত গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া আজিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

এই কালের মধ্যে ডিরোজিওর ছাত্রেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জাতির আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে একটি সমাজ বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। তাহা যদিচ অল্পকালস্থায়ী, তথাপি সংস্কারের যূপকাষ্ঠে, যাহা কিছু হিন্দু বা হিন্দুর, তাহাই বলিদানের যোগ্য বলিয়া তাঁহারা খাঁড়া উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ইহার পরে রাজা রামমোহনের ব্রহ্মসভা আর স্যার রাধাকান্তের ধর্ম্মসভার দলাদলি সহরে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কম আলোড়িত করে নাই।

শ্রীরামপুরের পাদরীদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ, তদ্বিরুদ্ধে রামমোহন প্রভৃতির আত্মরক্ষা আমাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মে ও সমাজে সহজে মুছিয়া ফেলিবার নয়।

রাজা রামমোহনের বিলাতগমন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান, দেবেন্দ্রনাথের সহিত রাজনারায়ণ ও অক্ষয়কুমারের সম্মিলন,—ইহা সমস্তই বাঙ্গালী জাতির স্মরণীয় ঘটনা।

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, সহর ও পল্লীর বাঙ্গালী সমাজে আর এক নূতন ঝড়।

মাইকেল ও বঙ্কিম বাঙ্গালীর সাহিত্যে আর এক নূতন প্রস্থান।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণের সম্মিলন, সংস্কারের ইতিহাসে ইহার ছাপও খুব গভীর।

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীতে পঠিত।

আবার দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রথম কেশব ও বিজয়কৃষ্ণের বিচ্ছেদ; এবং পরে কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির বিচ্ছেদ—ইহাও ভুলিবার কথা নয়।

কিন্তু এই সমস্ত আবর্ত্তনের মধ্যে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ এই দুই ব্রাহ্ম সাধক যে দিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সে দিন দেখিলেন—ইতিহাসের এক অধ্যায় শেষ হইয়া গেল!

এই অধ্যায়ে লেখা থাকিবে যে, রামমোহন মূর্ত্তি-পূজাকে অস্বীকার করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়তায় সন্দেহ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ, আর কেশবচন্দ্র অসবর্ণ-বিবাহ রাজদ্বারে বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন। ইহা বস্তুতই এক প্রকাণ্ড অধ্যায়,—কেহ অস্বীকার করিবে না।

ইহার পরের অধ্যায়েই—গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীবনে এক দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ, আর তাঁর এক শূদ্র শিষ্য। ইহারা চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত নয়—তথাপি ইহারাও এক নূতন সাম্রাজ্য গড়িবার জন্য, গ্রীসের মানসবংশধর পাশ্চাত্ত্যের আক্রমণ হইতে হিন্দুস্থানকে রক্ষা করিবার এক অতি সুমহান্ প্রয়াসে জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন আমরা সংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কোন্ পথে যাইব বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, পাশ্চাত্ত্যের প্রখর বিদ্যুতের আলোকে যখন আমাদের চক্ষু প্রতিহত হইতেছিল, সমগ্র জাতির যখন প্রায় দিগ্‌ভ্রম হইবার উপক্রম, জাতির সম্মুখে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন, সন্দেহের পরে সন্দেহ যখন ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, বিজাতীয় পথে স্বজাতির সংস্কার-রথ যখন আর চলিতে না পারিয়া প্রায় থামিয়া যাইতেছিল, দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কারফল চিন্তা করিয়া যখন আমরা একরূপ হতাশভাবে বসিয়া পড়িতেছিলাম, কি করিব ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই;—তখন সেই সংস্কারের ঝড়ে আলোড়িত ও মথিত বাঙ্গালী সমাজের জঠর হইতে আবির্ভূত হইলেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন,—তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে স্বামী বিবেকানন্দ। সঙ্কটের দিনে ইঁহারা আসিয়া দেখা দেন, ইতিহাসে আমরা তাহার প্রমাণ পাই।

তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতা

এই সঙ্কটের দিন শুধু আমাদের দেশে নয়, পাশ্চাত্য দেশেও আসিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফরাসী জাতি সমগ্র প্রতীচ্য ভূখণ্ডে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত কিরণ দিয়াছে। সেই প্রচণ্ড হোমানলশিখার মধ্য হইতে যে সমস্ত দিক্‌পাল আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর রক্তাক্ত পতাকায় দেহ আবৃত

করিয়া কবরের অন্ধকারে প্রায় শতাব্দী কাল মহানিদ্রায় শায়িত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী জাতির গৌরব-রবি অস্ত গিয়াছে। সমগ্র ইউরোপে এক মহা-সন্ধ্যা—ক্রমে রাত্রি—গভীর রাত্রি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই ইউরোপের জ্ঞানীরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। বিচার, বিশ্লেষণ ও বিদ্রোহ যাহা করিবার, তাহা করিয়াছে। সমস্তই ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া ফেলিয়াছে। মানুষে মানুষে যে বন্ধন, জাতিতে জাতিতে যে বন্ধন, ইহকাল পরকালে যে বন্ধন,—যাহার সূত্র গ্রীস ও রোমের কাছ হইতে ইউরোপ পাইয়াছিল, খৃষ্ট যাহা দিয়াছিলেন, সমস্ত মধ্যযুগ ভরিয়া যাহা অবিচ্ছিন্ন ও সঞ্চিত ছিল, তাহা সমস্তই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার নামে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার, জাতীয়তার নামে পরস্বলোলুপতা, ধর্ম্মের নামে পরধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য মহাদেশ সত্যই এক নূতন আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল,—যে আদর্শে তাহারা 'সূত্রে মণি-গণা ইব' আবার গ্রথিত ও মিলিত হইয়া, বিশ্বমানবের বিজয়-মুকুটে শোভা পাইতে পারে।

চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভা।

এই ব্যাকুলতা তাঁহাদের সাহিত্যে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, অর্থ-নৈতিক সমস্যায় নানা আকারে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একটা ভবিষ্যৎ সমন্বয়ের আদর্শের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াই ১৮৯৩ খৃঃ তাঁহারা চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভার অনুষ্ঠান করেন।

আর এই ধর্ম্ম-মহাসভাতেই স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর জাতি-সমূহের নিকট দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হন। এই ধর্ম্মমহাসভাতেই পৃথিবীর জাতি-সমূহ তাঁহার প্রথম পরিচয় লাভ করে। এই ধর্ম্মমহাসভাতেই পৃথিবীর জাতি-সমূহের নিকট তিনি বিংশ শতাব্দীর সমন্বয়ের বার্ত্তা তারস্বরে ঘোষণা করেন।

সে সমন্বয়ের বার্ত্তা এই যে—

(ক) কোন এক জাতি বা কোন এক ধর্ম্ম, অন্য এক জাতি বা অন্য এক ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিয়া, বিনাশ করিয়া সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে না।

(খ) প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক ধর্ম্ম অন্যজাতি বা অন্য ধর্ম্মের সহিত পরস্পর ভাব-বিনিময় করিবে, অথচ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবে। আর প্রত্যেকেই যার যার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুপাতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা, তারিখ ১৮৯৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর। ঠিক

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পরে, রাজার মৃত্যু-দিনে,—রাজার আদর্শের প্রতিধ্বনিস্বরূপ,—পাশ্চাত্য জগতের কেন্দ্রভূমি হইতে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। অশোকের যুগে ইহা প্রস্তর-স্তম্ভে ও গিরিগাত্রে খোদিত করিবার ঘোষণা। এ যুগে ইহা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির, জাতীয় পতাকায় উড্ডীন হইবার ঘোষণা। আর ইহাই অধুনাতন সমাজ ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের, অন্ততঃ আজ পর্য্যন্তও শেষ কথা॥

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্ম ও সমাজ-বিজ্ঞান আলোড়ন করিয়াছিলেন যথেষ্ট। কিন্তু তিনি এই সমন্বয়বাণীর প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরু পরমহংস শ্রীরাম-কৃষ্ণ দেবের জীবন হইতে, আর পাইয়াছিলেন *যে সভ্যতার কোলে তাঁহার জন্ম*, পৃথিবীর সেই এক অতি প্রাচীন সভ্যতার প্রাচীনতম মন্ত্র হইতে, যাহা বলে, ‘একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি,—পণ্ডিতেরা সেই এককেই বহু বলিতেছেন!

হিদেন্ (?) হিন্দুর এই অদ্বৈতবাদের পতাকার নিয়ে, খৃষ্টান আমেরিকার বক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি যে একদিন মিলনপ্রয়াসী পৃথিবীর জাতি-সমূহকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করিয়া আমরা বাঙ্গালী আজ কি গৌরব অনুভব করিব না?

ইউরোপে বিংশ শতাব্দীর নবযুগ (রেনেসেন্স)।

প্রাচীন যুগে আমাদের সভ্যতার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার যখনি সংঘর্ষ হইয়াছে, তখনি মানবের ইতিহাসে এক প্রবল তুফান উঠিয়াছে। এ কথা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার ফলস্বরূপ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন।

এ যুগেও ইংরেজ-রাজত্বকালে, আমাদের সভ্যতার উপর, পাশ্চাত্য সভ্যতার এক প্রবল সংঘাত উপলব্ধি করা গিয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতে এবারেও অন্যান্য বারের মতই এক প্রবল তুফান উঠিবে।

এই দুই সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে—সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশে এক নূতন নবযুগ আসিবে বা আসিয়াছে।

মধ্যযুগের পর ল্যাটিন ও গ্রীকের আবিষ্কার পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে যে নবযুগ আনিয়াছিল, সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারও তদ্রূপ বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এক নূতন নবযুগ আনিবে।

সোপেনহয়ার, মোক্ষমূলার, ডয়সেন প্রভৃতি পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাঁদের দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্র ও দর্শনাদি যেরূপ ভাবে পাশ্চাত্য দেশে আলোচিত হইতেছে,—তাহাতে ইহাঁরাই ইউরোপের এই নবযুগের অগ্রদূত।

হিন্দু ও গ্রীক।

দ্বিতীয় ফল—হিন্দু ও গ্রীকের,—আর্য্য জাতির এই দুই শাখার পুনরায় ভাব-বিনিময়, পুনরায় মিলন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে আর্য্য জাতির এই দুই শাখায় যখনি মিলন ঘটিয়াছে, তখনি ইতিহাসে এক নূতন যুগ আসিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, বর্ত্তমান-ইউরোপ সর্ব্ববিষয়েই প্রাচীন গ্রীসের ছাত্র, প্রাচীন গ্রীসের মুখোজ্জ্বলকারী মানসবংশধর। আমরা কিন্তু প্রাচীন হিন্দু জাতির মাত্র কঙ্কাল ও কলঙ্কস্বরূপ। তথাপি বর্ত্তমান ইউরোপের যে অভাব, যে অন্তর্দাহ, তাহা দূর করিবার জন্য আর গ্রীসের দিকে তাকাইলে চলিবে না। গ্রীসের যাহা দিবার ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়াছে। শুধু তাই যে ইউরোপের বর্ত্তমান অন্তর্দাহ-নিবারণের ঔষধ গ্রীক সভ্যতার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীক ও হিন্দু প্রতিভার বিশেষত্ব ও পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে—তাহা কেবল আছে এক হিন্দু সভ্যতায়, হিন্দুর অদ্বৈত অনুভূতির মহাসমন্বয়ে। তাই তিনি বলিয়াছেন—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

ইউরোপের ভবিষ্যৎ আদর্শে—অদ্বৈতবাদ।

তৃতীয় ফল ইউরোপের ভবিষ্যৎ আদর্শে—অদ্বৈতবাদের উপযোগিতা। ইউরোপ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় অতিষ্ঠ হইয়া, এক নূতন সমন্বয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কেবলি তাহার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আর ব্যবস্থার নিত্য নূতন ভাঙা-গড়া করিতেছে। আর ভাবিতেছে যে, শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্ত্তন দ্বারাই এই বর্ত্তমান অন্তর্দাহ ও অসন্তোষ দূরীভূত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ইউরোপের এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং এরূপ চেষ্টা শুধু ব্যর্থতাই আনয়ন করিবে। কেন না, ইউরোপের মনুষ্যেরা, আত্মাকে হারাইয়া স্বর্গরাজ্যলাভের জন্য হাত বাড়াইতেছে,—তাহা অসম্ভব। কলকব্জা, ষ্টিম ইলেক্ট্রি-সিটি ইহা দ্বারা মানুষের আত্মার বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। সামাজিক ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করে না।

মানবের ইতিহাসে কোন নবযুগের আরম্ভ হয় একটা কোন মহান্ আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ আরাধনায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সুপ্ত আত্মায় সেই আদর্শের প্রভাব অনুভব করিয়া, আত্মাকে জাগ্রত করিবার আন্তরিক চেষ্টায়।

ইউরোপের জাতিসমূহের সম্মুখে যদি কোন সমন্বয়মূলক নূতন আদর্শ প্রকট না হয় তবে আর ৫০বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের ধ্বংস অনিবার্য্য।

ইহা তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীব্যাপী এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ২০ বৎসর পূর্ব্বে। আর ইউরোপের সম্মুখে তখন তিনি আদর্শ ধরিয়াছিলেন—হিন্দুর অদ্বৈতবাদ।

প্রত্যেক জাতি তাহার জাতিগত অহমিকতা ও বিদ্বেষ ভুলিবে, যদি বুঝিতে পারে যে, তাহারা শুধু এক বিরাটের অনেক অংশমাত্র নয়, পরন্তু মূলতঃ তাহারা সকলেই এক। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার প্রশমিত হইবে যদি সে বুঝিতে পারে, যে সে পৃথক্ নয়, মূলতঃ সে সকলের সহিত এক। সে আর সে অভিন্ন।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট তিনি ভারতের ঋষিসংঘের এই শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, অদ্বৈত-বাদের এই মহাসমন্বয়তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের একটা সংবিৎ ছিল, ইহার ভবিষ্যৎ সমন্বয়ে তিনি বিশেষ আনন্দিত ছিলেন।

ইউরোপের নব্য সাহিত্য ও দর্শন

পাশ্চাত্যদেশে তাঁহার অদ্বৈত আদর্শ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ও পরে এই ২৫বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সাহিত্য ও দর্শনে যে আলোড়ন ও আবর্ত্তন চলিয়াছে, তাহাতে ইউ-রোপের পূর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জিত এক নূতন সমন্বয়ের আদর্শকে নানাদিক্ হইতে প্রকট করিবার চেষ্টার স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

(ক) সেখানকার সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের অন্তঃস্থলে ডুবিয়া, জীবনের যত জটিল রহস্য, শতাব্দীর সঞ্চিত সমাজের তলায় যত ক্লেদ পঙ্ক সমস্তই তুলিয়া ফেলিবার এক অমানুষিক চেষ্টায় ব্যাপৃত। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে একটা বিদ্রোহের সুর, একটা দুর্ভেদ্যরহস্যের ব্যঞ্জনা, স্বতঃই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

(খ) সেখানকার নব্যদার্শনিকেরা, খৃষ্টের চিরপূজ্য নীতি ও ধর্ম্ম, ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণা, স্বর্গনরকের আশা ও ভয়, পাপপুণ্যের পাশাপাশি দ্বন্দ্ব—এ সমস্তকেই ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করিয়া, এক নূতন তত্ত্বের সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল।

কেহ বলিতেছেন, একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে, কেহ বলিতেছেন, প্রবৃত্তির রাজ্য হইতে একটা চিরস্থির আত্মার রাজ্যে গিয়া জন্মিতে হইবে। কেহ বলিতেছেন, শুধু বুঝি নয়, বোধির শরণাপন্ন হইতে হইবে, কোন পণ্ডিত বলিতেছেন, একের ধারণাই ভুল, এই দৃশ্যমান বহুকেই বিশ্বাস করিতে হইবে।

আর তাঁহাদের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—বহু নয়, বহু ভুল, সত্য এক। বহু তোমাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এক অখণ্ড পূর্ণ অদ্বৈতের মধ্যে তোমাদের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইবে, সমস্ত অন্তর্দাহ জুড়াইয়া যাইবে। আর

এই পরিপূর্ণ অদ্বৈতের ধ্যান ও ধারণা:আমি হিন্দু সভ্যতার খনি হইতে খুঁড়িয়া তোমাদের জন্য লইয়া আসিয়াছি।

ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের প্রতিবাদ

অন্যদিকে আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্য ও প্রভাবের প্রথম ফল— বাঙ্গালীর ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের প্রতিবাদ।

রাজা রামমোহন হইতেই এই সংস্কার-যুগের আরম্ভ। কিন্তু পরবর্ত্তীয়েরা এই সংস্কার-কার্য্যকে যে ভাবে পরিচালিত করিয়াছেন, তজ্জন্য রামমোহনকে দায়ী করিলে তাঁহার চিরপূজ্য মহিমাকে অপমান করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাহা করেন নাই। তিনি রামমোহন সম্বন্ধে যেখানে যতটুকুই বলিয়াছেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের জীবনে রামমোহনের প্রভাব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা কেবলই ধ্বংসনীতির অনুসরণ করেন, রামমোহনকে তিনি সে শ্রেণীর সংস্কারকের মধ্যে ধরেন নাই। পরন্তু এ যুগে একমাত্র রামমোহনকেই তিনি গড়িয়া তুলিবার বা উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন সংস্কারক বলিয়া সম্মান করিয়াছেন।

তথাপি এই সংস্কার-যুগের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন নাই। কেন না, এই সংস্কার-যুগের বহু ভ্রম তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই সংস্কার-যুগের—

(১) একটা ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। কত বড় প্রাচীন সভ্যতার বংশধর এই জাতি, কত বড় সংস্কারের মধ্য দিয়া, যুগে যুগে কত কত মহাপুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যে ইহার অতীত ইতিহাসদ্বারা প্রভূতরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে, এ কথা সংস্কারযুগ আদৌ বুঝিতে পারে নাই।

(২) জাতীয় বিশেষত্ব-বোধের অভাব। সংস্কার-যুগ এ কথাও চিন্তা করে নাই যে, প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। যাহার জন্য সে বাঁচিয়া থাকিবার দাবী করিতে পারে, যাহার অভাবে তাহার বিলোপ বা মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দুর জাতীয় বিশেষত্ব কি, তাহাও তাহারা বুঝে নাই, বা তদ্বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করে নাই। নিজের দেশ বা নিজের জাতি বলিয়া একটা সার্থক অভিমানও সংস্কার-যুগের ছিল না বলিয়াই—

(৩) দাস-সুলভ পরানুকরণের মোহে এই যুগ ভরপুর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের জাতি যে পরানুকরণ করিবে, এই চিন্তামাত্রও তাঁহার পক্ষে কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশদায়ক ছিল।

(৪) যাহাকে সংস্কার করিতে হইবে, তাহার অজস্র নিন্দা কখনই সংস্কারের পদ্ধতি

হইতে পারে না। অথচ এই নিন্দাবাদ আর গালাগালিই সংস্কারকেরা তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন।

(৫) ফলে গত একশত বৎসরের সংস্কার কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিয়াছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

প্রতিক্রিয়া-মূলক এক সমন্বয়-যুগের সূচনা

কাজেই তিনি প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়-যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

এইখানেই তাঁহার প্রভাব আমরা জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই এবং খুব বেশী পরিমাণে অনুভব করি।

তিনি তাঁহার জাতিকে প্রথমতঃ সুস্থ ও সবল হইতে বলিয়াছেন। পরে তাহার বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে, অন্যান্য জাতির সহিত ভাববিনিময়ে পরিপুষ্ট হইয়া, অথবা নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন।

জাতি যদি সুস্থ ও সবল হইতে পারে, যদি তাহার আত্মসম্বন্ধে একটা সংবিৎ ফিরিয়া আইসে, তবে যে সংস্কার যেথানে আবশ্যক, তাহা আপনিই সংসাধিত হইবে।

এই প্রতিক্রিয়া মূলক সমন্বয়ের যুগে—

(১) তিনি হিন্দুর প্রতিমাপূজাকে খৃষ্টান পাদরী বা উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকদের মত হুবহু ধিক্কৃত করেন নাই। ধর্ম্মসাধনায় পরিপূর্ণ অদ্বৈতের অনুভূতিতে পৌছিবার পথে, নিম্ন অধিকারীর পক্ষে ইহা একটি সোপান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজাকে যখন শ্রীরামপুরের পাদরীরা অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন রাজা রামমোহন গ্রীক ও রোমানদের নিকৃষ্টতর মূর্ত্তি-পূজার সহিত হিন্দু মূর্ত্তি-পূজার পার্থক্য ও বিশেষত্ব প্রমাণ করিয়া অধিকারিভেদে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেব পরমহংসের ধর্ম্মজীবনে পূর্ণ অদ্বৈত অনুভূতির সহিত প্রতিমাপূজার আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিয়াই মূর্ত্তি-পূজাকে সরাসরি দূর করিয়া দিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই।

(২) তিনি বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়াছেন, এই ভাবে যে বেদ ধর্ম্মানুভূতির কতকগুলি চিরন্তন সত্যকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঋষিরা এই সমস্ত সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বেদের দোহাই অপেক্ষা ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অনুভূতির উপরেই তিনি অধিকতর আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) তিনি জাতিভেদের ভালমন্দ দুই দিকের উপরেই অপক্ষপাত দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গূঢ় অভিপ্রায় প্রত্যেক মানুষকেই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলা। কেন না, ব্রাহ্মণত্বেই—হিন্দু তাহার মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখিয়াছিল। সুতরাং এ যুগে সকলকেই এই ব্রাহ্মণ হইবার, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।

তাহা না করিয়া শুধু জাতিভেদকে অযথা গালাগালি দেওয়া বা না বুঝিয়া ভাঙ্গিতে যাওয়া মূর্খতার পরিচয় মাত্র।

(৪) তিনি প্রথমতঃ এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। গোড়াতেই জাতিগত বৈষম্য গায়ের জোরে অস্বীকার করিয়া সকল জাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করেন নাই।

(৫) তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার ও গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। বিজাতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষা তিনি ভয়াবহ মনে করিতেন। জাতীয় আদর্শের স্বাতন্ত্র্যবোধই এ বিষয়ে তাঁহাকে চালিত করিয়াছে।

(৬) তিনি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন নাই বটে;—কিন্তু বিধবাগণ শিক্ষা ও সুযোগ পাইয়া নিজেরাই নিজেদের অবস্থানুযায়ী পথ আবিষ্কার করিয়া যাইবেন,—ইহাই তিনি অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন।

(৭) তিনি যে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া হিন্দুর সমাজব্যবস্থায় স্থান দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। নতুবা হিন্দু জাতির দিন দিন বলক্ষয় হইবার আশঙ্কা আছে।

(৮) তিনি জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন এবং নিম্ন-শ্রেণীর উন্নয়নকল্পে তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র ছিলেন।

এই রকম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংস্কারের বহু আভাস তাঁহার মধ্যে আমরা পাই,—কিন্তু তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত সমন্বয় যুগের সংস্কারের আদর্শ ও স্বজাতির পার্থক্যই আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

তিনি বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা সংস্কারের বিধিনির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তির প্রভাবে তাহা জনসমাজে প্রচারিত করিতেন। এখন এই উভয় শক্তিই লুপ্তপ্রায়। সুতরাং এখন কোন স্থায়ী সংস্কার জন-সমাজে প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে এমন একটি শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে, যাহা সেই সংস্কারকে ধারণ করিতে পারে এবং চালনা করিতে পারে। সংস্কার-যুগের অন্তে বিবেকানন্দ-যুগের ইহাই নূতন আদর্শ, নূতন যুগধর্ম্ম।

তিনি বলিয়াছেন, সে শক্তির জন্য এখন আমাদিগকে কেবল ভারতের এই বিশাল জনসংঘের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই জনসংঘকে খাদ্য দিয়া, জ্ঞান দিয়া ইহাদের আত্মাকে, মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। কেন না, ইহার সফলতার উপরেই অন্যান্য যাবতীয় সংস্কার নির্ভর করিতেছে।

"দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা।"

দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা,—তাই স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি গৌরবময় কীর্ত্তি।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের এই বিশাল জনসংঘ কেবলই পদ-দলিত ও নিষ্পেষিত হইয়া আসিয়াছে। ফলে প্রায় ছয় কোটি মনুষ্যত্ব আজ স্পন্দনহীন, সুপ্ত। তাহাদের নিশ্বাস অপবিত্র, তাহাদের ছায়া অস্পৃশ্য অথচ একমাত্র ইহাদের লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধারের উপরেই নির্ভর করিতেছে—ভবিষ্যৎ ভারতের যত আশা।

কাজেই তিনি এই সমস্ত অস্পৃশ্য দরিদ্রদের প্রতি, জাতির জরাগ্রস্ত অভ্যস্ত চিন্তাকে অতি নির্ম্মমভাবে আঘাত করিলেন। যত্র জীব তত্র শিব। তিনি তাঁহার অদ্বৈত অনুভূতির অভ্রভেদী শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন—'কি অস্পৃশ্য! ইহারা নারায়ণ!" হউক না 'দরিদ্র,' কি আসে যায়?' ইহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যকে আখ্যা দিলেন,—"সেবা।"

কি মহান্ সে হৃদয়, কি বিরাট্ সে অনুকম্পা, কি গভীর সে অনুভূতি, যাহা ভেদ অভেদের সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, এক অখণ্ডসত্তার অতলে ডুবিয়া, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, প্যারিয়া ভারতবাসীকে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে নারায়ণজ্ঞানে সেবার আদেশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারত যদি এই আদেশের মর্ম্ম না বুঝে, তবে ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস অন্ধকার। আর এ কথাও সত্য যে, ভগবান্ বুদ্ধদেবের পর ভারতের বিরাট্ জনসংঘকে আর কেহই এমন ভাবে অন্বেষণ করেন নাই, আহ্বান করেন নাই, সম্মান করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করও নহেন।

ভারতে অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রচার।

ভারতে অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রচার শঙ্করাচার্য্যের পরে—ইহাও বড় কম সিংহবিক্রমের পরিচায়ক নহে।

এই অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রচার—

(১) 'মায়ার' ব্যাখ্যায়—তাঁহার মৌলিকত্ব আমরা দেখিতে পাই।

(২) অদ্বৈতবাদের মধ্যে যাঁহারা সমাজধর্ম্মের কোন উন্নত নীতির স্থান খুঁজিয়া পান না বলেন, তাঁহাদের উপর তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কেবল অদ্বৈত অনুভূতির মধ্যেই নীতির একটা সুস্পষ্ট হেতু বিদ্যমান দেখা যায়।

ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য এই উভয় মহাদেশেই অদ্বৈতবাদের এই নীতির বিষয় তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন।

(৩) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এই উভয়কে যাঁহারা একদেশদর্শী মনে করিয়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সমন্বয় খুঁজেন, তিনি তাঁহাদের মতকে নিরসন করিয়া, প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে নহে—পরন্তু দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইহা সমস্তই এক পূর্ণ অখণ্ড অদ্বৈত অনুভূতির ক্রমশঃ সোপান মাত্র। সমন্বয় বা শেষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে নহে—অদ্বৈতবাদে।

ইহা স্বামী বিবেকানন্দের শাস্ত্রমীমাংসার এক মৌলিক গবেষণা।

(৪) তিনি অদ্বৈতকে একটা মতবাদ মাত্র বলিয়া ধরেন নাই। ইহাকে তিনি ধর্ম্মসাধনায় একটা অনুভূতির ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন এবং ইহাই ধর্ম্ম-সাধনার শেষ অনুভূতি বলিয়া পৃথিবীর জাতি-সমূহের নিকট এ যুগে প্রচার করিয়াছেন।

ভারতের বিশাল জনসংঘের উদ্বোধনের জন্য তিনি এই অদ্বৈতবাদ-প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের অসংখ্য নিষ্পেষিত মনুষ্যত্ব আত্মায় ব্রহ্ম আছেন, এই উপলব্ধিতে শতাব্দীর শত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে। সে দিন সত্যই জগতে এক নূতন প্রভাত আসিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি সেই প্রভাত পর্য্যন্ত আমরা বহন করিয়া লইয়া চলিব। নতুবা অকৃতজ্ঞতার মহাপাপে জাতির ললাটদেশ এমন ঘন তমসায় আবৃত হইবে যে, তাহা আরও কত শতাব্দীর কর্ম্মভোগে শেষ হইবে, কে বলিতে পারে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা

আমি যেমন প্রতি বৎসর আসি, তেমনই আবার আসিয়াছি; চির-শস্য-শ্যামলা, নদীমেখলা, সোনার বাঙ্গালার সারা অঙ্গে আমার গোপন ভৃঙ্গারের রূপালি কিরণধারা আবার ঢালিয়া দিয়াছি; আমার আগমনে ঐ যে পত্রান্তরাল হইতে কোকিল-কোকিলা কুহুরবে দশ দিক্‌ মাতাইয়া তুলিতেছে, নব কিসলয়-আভরণ অঙ্গে পরিয়া ঐ যে শীতশীর্ণ তরুলতা আবার সজীব—প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; সুযোগ বুঝিয়া দখিনা বাতাসও মৃদু-মন্দ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; জল-স্থল, আকাশ-বাতাস —সকল ব্যাপিয়া আনন্দের কি যেন কি একটা অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস ছুটিয়া চলিয়াছে, কেন, তাহা জান কি? এই জড়-জগতের প্রাণ আমার আগমনে কেন এত আনন্দ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি? সে আজ ৪৩১ বৎসরের কথা। সেই চৌদ্দ শত সাত শকের ১৭ই ফাল্গুন—যে দিন আমি ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া সীমাহীন নীলাকাশের নীলপটে আসীন হইয়াছিলাম, সেই দিনে চিন্ময় জগতের একটি অপূর্ব্ব বস্তু আপনা আপনি তোমাদের ঘরে আসিয়াছিল। প্রেমিকা-শিরোমণি রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকার ভাবে ভোর হইয়া সেই গোপীজন-বল্লভ শ্যামসুন্দর নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সকলঙ্ক আমি সে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয়ে অন্তর্হিত হইতে চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, সে অখিল-ভুবন-উজোরকারী কুন্দ-কনক-কাঁতিয়ার কাছে আমার থাকা নিরর্থক, তাই সুযোগ বুঝিয়া শুভক্ষণে আমি রাহুর অন্তরালে লুক্কায়িত হই।

সে দিন শ্রীমাধবের দোললীলার আনন্দে বাঙ্গালীর ঘর-বাহির, পথ-ঘাট-মাঠ উদ্বেলিত, আবীর-রাগ-রঞ্জিত, 'লালে লাল'—বঙ্গবালক-বালিকার হাস্য-কলরবে বঙ্গ-গৃহ মুখরিত, আর আমার আবির্ভাবে সমগ্র প্রকৃতি হাস্য-প্রফুল্লা। পতিতপাবনী, কলুষ-হারিণী জাহ্নবী আমার কিরণ অঙ্গে মাখিয়া কল কল তানে শ্রীনবদ্বীপ নগরীর পাদ ধৌত

করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। দেবী বীণাপাণির সাধক সন্তানের পীঠস্থান নবদ্বীপের ঘরে ঘরে তখন দেব-আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছে; ঠিক সেই সময়ে—

"জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥"

ব্রজজনজীবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সেই অনর্পিত অপ্রাকৃত ত্রিলোকদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব প্রেমরত্নের মহাজনস্বরূপা শ্রীরাধার কাছে 'বরণকান্তি' ভিক্ষা লইয়া এই লগ্নে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সে এক মধুর কথা। সেই মধুকথা আজ কবির ভাষায় একটু শুনাইব কি? সে দিন—

"নিধুবনে দুহুঁ জনে চৌদিকে সখীগণে
শুতিয়াছে রসের আলসে।"

হঠাৎ শ্রীমতী রাধা নিশিশেষে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তারপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার প্রাণকান্তকে বলিলেন,—

"উঠ উঠ প্রাণনাথ কি দেখিলাম অকস্মাৎ
এক যুবা গৌর-বরণ।
কিবা তার রূপঠাম জিনি কত কোটি কাম
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি ভাব ভূষা নিরবধি
নাচে গায় মহামত্ত হৈঞা।
অনুপম রূপ দেখি জুড়াইল মোর আঁখি
মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া॥
নব জলধর-রূপ রসময় রস-কূপ
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত হেন ভেল আচম্বিত
কহ নাথ ইহার কারণে॥"

ঠাকুর, হইল কি? আমি ত' তোমা ভিন্ন আর কিছুই দেখি না! দেখিলেও তাহা যে কখন আমার মন হরণ করিতে পারে না; কিন্তু এই—

"গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে।"

সেই তমালে শ্যাম-ভ্রমোল্লাসিনী রাধিকার এই চিত্তচাঞ্চল্যের—এই কৃষ্ণ-বিরহ-আশঙ্কার আর্ত্তি দেখিয়া, রাধিকা-রঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—সুন্দরি! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য। যে গৌর স্বরূপের কথা তুমি বলিতেছ, তাহা ত কেউ জানে না, তোমার প্রেমে আমিই এই রূপ ধারণ করিব। আমি এত দিন ব্রজধামে কাল কাটাইলাম, এত দিন তোমার সঙ্গে কতই না বিলাস করিলাম, কিন্তু,—

'কৈছন তুয়া প্রেমা কৈছন মধুরিমা
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নাহি সম্প্রণ
কি কহব না পাইয়া ওর॥'

আমি রাধাকান্ত হইয়া, হে রাধে, তোমার প্রেম যে বুঝিলাম না, তাই—

"ভাবিয়া দেখিনু মনে তোহারি স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥"

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাব আর একটি কামনা—

"সাধব মনের সাধা ঘুচাব মনের বাধা
জগতে বিলাব প্রেমধন॥"

তোমার এই অপূর্ব্ব—অমূল্য—এই সুর-নর-বাঞ্ছিত রাধাপ্রেম লোকের ঘরে ঘরে বিলাইব। তারপর সেই কাল ঠাকুর তাঁহার চূড়া-বাঁশী লুকাইয়া, পীত-ধড়া ছাড়িয়া, শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিতে নিজের দেহ আবৃত করিয়া গৌররূপ ধারণ করিলেন। শচীমায়ের ঘর যে দিন বৃন্দাবন-আলো করা কাল ছেলের ধার-করা গৌররূপে আলো হইয়া উঠিল, যে দিন নিজে নামী হইয়া কলির

পতিত-দুর্গত জীবের দ্বারে দ্বারে অনর্পিত নাম বিলাইবার জন্য ঠাকুর করুণা করিয়া নিজে আসিলেন, সে দিন নবদ্বীপের গৃহ, পথ, ঘাট হরিনামে মুখরিত হইয়া উঠিল।

অনাচারে তোমাদের দেশ ভরিয়া গিয়াছিল, ন্যায়ের জটিল তর্কে তোমরা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিলে। তাই যখন—

"কলিঘোর-তিমিরে গরাসিল জগজন
ধরম করম গেল দূর।"

তখন—

"অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়াব ঠাকুর॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হইলে সকলঙ্ক চাঁদের আর শোভা থাকে না। তাই গৌরচন্দ্রের মুখ দেখিয়া রাহু-কবলিত হইয়া আমি আমার বদন ঢাকিলাম। চন্দ্র-গ্রহণ দেখিয়া নদীয়াবাসীরা হরিনাম করিতে করিতে সুরধুনীতীরে সমবেত হইলেন। সে কি উল্লাস—কি আনন্দ! সাধনা না করিয়া সাধনেব ধনকে ঘরে পাইলে সে আনন্দের আর কি ওর থাকে? সেই আনন্দের ইতিহাস আমার বক্ষে লেখা রহিয়াছে। আমার আগমনে স্থাবর-জঙ্গম তাহাই পাঠ কবিয়া এত অধীর হয়। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিলে, ফাল্গুনীর এই চাঞ্চল্য শুধু প্রাণের চাঞ্চল্য নহে—ইহার মধ্যে নিখিল প্রেমময়ের লীলা-চাঞ্চল্য রহিয়াছে, তাই ইহা এত আনন্দময়—এত মধুময়!

তোমাদের কি মনে নাই, বহুপূর্ব্বে দ্বাপরে আমিই গোবিন্দবক্ষোবিলাসিনী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইয়াছিলাম। শ্রীবৃন্দাবনের সেই দোললীলার ছবিখানি তোমরা একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে
ব্রজবনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে,

কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে,
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে।
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া,
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া,
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে,
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল চরণে
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়,
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়,
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি,
গগন ভুবন দিক্ বিদিক্ নাহি জানি।

সেই রাস ও দোললীলার অনুষ্ঠান আজিও সমভাবে, কেবল তোমাদের বাঙ্গালা দেশে নয়—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে চলিতেছে। আর চৌদ্দ শত সাত শকের সতেরই ফাল্গুন তোমাদের সহিত আর এক প্রেমময় দয়াল ঠাকুরের মিলন ঘটাইয়া দিলাম।

সে মিলনের ফলে, তোমাদের বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা জুড়িয়া প্রেমের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। আর সে বন্যার খরস্রোতে পড়িয়া—

"চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"

তোমরা চাও নাই, কিন্তু তিনি নিজে আসিয়া অযাচিতভাবে তোমাদের ঘরে ঘরে গোলোকের ধন বিলাইয়া গেলেন।

"অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পঁহু
যাচি দেয়ল হরিনাম।"

কত পতিত-কাঙ্গাল, কত পাপী-তাপী, কত চণ্ডাল-যবন তাঁহার প্রেমময় কোল পাইয়া তরিয়া গেল। তাঁহার সেই পাষণ্ড-দলান, 'পাণ্ডিত্য-ভুলান,' ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া নয়নের মোহ-বসন অপসারিত হইল। শ্রীভগবানের মধুরাতিমধুর, মঙ্গলাতিমঙ্গল নামে বাঙ্গালার ঘর-বাহির ভরিয়া উঠিল।

সেই অগাধ অপরিমেয়—

"—গৌর-গুণের নাহি সীমা।
দীন-হীন পাঞা, বিলায় যাচিঞা
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত প্রেমা ॥
জাতি না বিচারে আচণ্ডালে তারে
করুণাসাগর গোরা।
ভাবভরে সদা অঙ্গ টলমল
গমনে ভুবন ভোরা ॥"

কেবল কি তাই? পশু-পক্ষী স্থাবর-জঙ্গমের অবস্থাটা একবার চাহিয়া দেখ দেখি—

"আমার গৌরাঙ্গের গুণে
দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগপাখী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে
নাহি কাঁদে হেন নাহি পরাণী ॥"

ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা ঢালিয়া তিনি তোমাদের শুষ্কাতিশুষ্ক হৃদয় প্রেম-কোমল করিয়া দিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে তোমাদের দেশ, তোমাদের ভাষা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও ধন্য হইলে।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমি তোমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছি—আজ তোমাদের এক পরম শুভদিন—আজ তোমাদের বৃন্দাবন-চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা, আর পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসব। এই দুই শুভযোগ বক্ষে ধারণ করিয়া পুলকে আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আর আমার ন্যায় পুষ্পগন্ধবাহী মলয়-সমীরণও অধীর হইয়া ওই যে চারিদিকে আনন্দধারা ছড়াইতেছে। কুঙ্কুম-রাগ-রঞ্জিত বালক-বালিকার আনন্দ-কলরব আমাদের আনন্দকে আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

শ্রীপ্রিয়াজীকে বামে লইয়া 'লালে লাল' কানাইয়া লাল ঐ যে দোলমঞ্চে উঠিয়াছেন—আর ঐ শুন গো ঐ শুন, আমার রজতকিরণোদ্ভাসিত বঙ্গভূমির চারিদিক্ হইতে খোল-করতাল-ধ্বনির সহিত কি অপূর্ব্ব-মধুর প্রাণমাতান' সুর উঠিয়াছে ;—

"যাদের 'হরি' বল্‌তে নয়ন ঝুরে
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।
যারা মা যশোদার নয়ন-তারা
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।
যারা ব্রজে ছিল কানাই বলাই
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।
যারা অযাচকে নাম দেয়
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে কোলে করে
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।
যারা পতিত দেখে প্রেম দেয়
নদীয়ায় তারাই দু'ভাই এসেছে রে।"

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

সাহিত্যে অনধিকারী

মাঘের 'ভারতী', পৌষের 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা'-শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীর এই সমালোচনার নীচে কোন বিশেষ লেখকের নাম নাই। সুতরাং ইহা সম্পাদকীয় মন্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে আমরা বাধ্য হইতেছি। আর 'নারায়ণে' প্রকাশিত সমালোচ্য প্রবন্ধটি কবি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের লিখিত, এবং গত বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিরূপে কবি কর্ত্তৃক উহা পঠিত।

'ভারতী' ও 'নারায়ণ';—দুইখানিই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা। বাঙ্গলাদেশে এই দুইখানি পত্রিকার লেখক ও পাঠকশ্রেণী, সংখ্যায় ও সাহিত্য অনুশীলনে উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা'ও বাঙ্গালার সাহিত্যে তাচ্ছিল্যের জিনিষ নহে। আর 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা' সম্বন্ধে বাঙ্গালীর সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের আলোচনা ও মত বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর প্রণিধানযোগ্য, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। অথচ সাহিত্যের আসরে এবংবিধ একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনায় আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, 'ভারতী' ও 'নারায়ণ' একমত হইতে পারেন নাই। পৌষের 'নারায়ণে' 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা'-শীর্ষক প্রবন্ধ, আর মাঘের 'ভারতী'তে তাহার সমালোচনা,—ইহার প্রমাণ।

আমরা ঐ প্রবন্ধ এবং তাহার সমালোচনা এই দুই-ই পাঠ করিয়াছি এবং যাঁহারা ভারতীর সমালোচনার জবাবস্বরূপ আমাদের এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে তৎপূর্ব্বে 'নারায়ণের' উক্ত প্রবন্ধ আর 'ভারতী'র তদ্বিষয়ে সমালোচনা, সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি। তাহার কারণ,—

প্রথমতঃ,—আমাদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান সাহিত্য-ব্যবসায়ী নবীন সমালোচকগণ, সাধারণতঃ তাঁহাদের সমালোচ্য বিষয়টি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ,—সমালোচনার রাজ্যে তাঁহারা অধিকারিভেদ স্বীকার করেন না।

তৃতীয়তঃ,—সমালোচনা ব্যাপারে অজ্ঞতার সহিত দাম্ভিকতাকে মিশ্রিত করিয়া তাঁহারা সাহিত্যে এক অতি ভীষণ অরাজকতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ,—'ভারতী'র বক্ষ্যমাণ সম্পাদকীয় সমালোচনা পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার দোষেই দুষ্ট।

আমাদের বক্তব্য এই যে, (১) ভারতীর এই সমালোচনা,—সমালোচ্য প্রবন্ধটি পাঠ না করিয়া লিখিত হইয়াছে।

(২) ভারতী এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে অযোগ্য, কেন না—অনধিকারী।

(৩) ভারতীর এই সমালোচনা অজ্ঞতাপ্রসূত দাম্ভিকতায় পূর্ণ।

সাহিত্যে আমরা, না পড়িয়া সমালোচনা, অনধিকারচর্চ্চা ও অজ্ঞতাপ্রসূত দাম্ভিকতার প্রশ্রয় অতি অকল্যাণকর মনে করি বলিয়াই ইহার প্রতি সাহিত্যসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এই জবাব বা প্রতিবাদ-প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভারতীর এই সমালোচনা যে সমালোচ্য প্রবন্ধ না পড়িয়া লিখিত, তাহার প্রমাণ আমরা দিতেছি। ভারতী সমালোচনায় বলিতেছেন—"লেখক বাঙ্গলা গীতিকবিতার একটা ধারাবাহিক আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের অনেক দিক্‌পাল তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছেন। * * * তিনি বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা করেছেন, অথচ অমর বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের নাম একবার ভ্রমেও মুখাগ্রে আনেন নি। যাঁর রচিত—'তাতলসৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে' প্রভৃতি অপূর্ব্ব গীতি আজও বাঙ্গলার ঘরে বাইরে গীত হচ্ছে, যাঁর কাব্যে ভাব ও ভাষার সুন্দর মিলনসাধন হয়েছে, সেই গোবিন্দদাসকে বাদ দিয়ে কি বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনা চল্‌তে পারে ?" ঠিক কথা।

এদিকে সমালোচ্য প্রবন্ধে মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বেকার গীতি-কবিতার আলোচনা শেষ করিয়া যখন প্রবন্ধকার মহাপ্রভুর জন্মের পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্য আলোচন করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন—"কিন্তু তাঁহার (মহাপ্রভুর) জন্মের পর আমরা সে সমস্ত পদাবলী সাহিত্যের গান পাই, তাহাতে সেই পূর্ব্বকার (চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির) যুগল সম্বন্ধের কথার ভিতর দিয়াই সকলে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রূপান্তরই তাঁদের আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু মহাপ্রভু যে পাপীর উদ্ধারের নূতন কথাটি আনিলেন, কাব্যে তাহার চরম পরিণতি ও রূপান্তর হয় নাই। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা সেই চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতিকেই অনুসরণ করিয়া সেই পথের পথিক হইয়াই চলিয়াছেন, চণ্ডিদাস হইতে কেহই অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এমন কি, সে আদর্শেও পৌছিতে পারেন নাই। তবে এইটুকু বেশ বুঝা যায় যে, সকলেই সেই আদর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই পদাবলীর ভিতরে সেই একই সুর, একই ছন্দ, একই তাল।"

ইহার পরেও সমালোচ্য প্রবন্ধে আরও একস্থানে গোবিন্দদাসের নামের

উল্লেখ ও তাঁহার পদাবলী সাহিত্যের অবতারণা করা হইয়াছে। গোবিন্দদাসের শুধু পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ নয়, তাঁহার পদাবলীর বিশ্লেষণ-মূলক এক অতি বিস্তৃত সমালোচনা আমরা এই প্রবন্ধে দেখিতে পাই। বাহুল্যভয়ে তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। এক্ষণে ভারতীর সমালোচনা যাহা বলেন, সে প্রবন্ধকার "অমর বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের নাম একবার ভ্রমেও মুখাগ্রে আনেন নি," তাহার জবাবে আমরাই বা কি বলিব, এবং সাহিত্যসেবিগণই বা কি বলিবেন?

সমালোচনা সাহিত্যের একটি প্রধান অংশ। আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগে এই যে সমালোচ্য প্রবন্ধ না পড়িয়া, সমালোচনা করিবার নূতন পদ্ধতি, সাহিত্যসেবিগণ ইহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন, বিনীতভাবে তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। সাহিত্যের রাজ্যে সকলেই সমালোচনা করিবার শক্তি লইয়া জন্মে না। তথাপি ইহা লজ্জার বিষয় নহে। সমালোচনা করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হওয়া অশোভনীয় হইলেও অমার্জ্জনীয় নহে। কেন না, নিষ্ফল সমালোচনা নিষ্ফল কাব্যসৃষ্টির মতই সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা অংশ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু সমালোচ্য প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া তদ্বিষয়ে সমালোচনা, বিশেষতঃ বিরুদ্ধ সমালোচনাএবং সম্পাদকীয় সিংহাসন হইতে—ইহা যে কি পদার্থ, সাহিত্যে যে ইহার স্থান কোথায়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সম্ভবতঃ ইহা অযোগ্যের অক্ষমতা-প্রসূত ঈর্ষা। কিন্তু সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে, ইহা আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে ক্রমবর্দ্ধমান চপলতা-প্রসূত বঙ্গের নব্য সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যুবকগণের দায়িত্ববোধহীন, কর্ত্তব্যবোধবিবর্জ্জিত একটা খেয়াল, যাহা সাহিত্যে একটা মহা দুর্নীতি ও কলঙ্ক এবং যাহা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া নিতান্তই অমার্জ্জনীয়।

ভারতী গোবিন্দদাসের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে—"যাঁর রচিত 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' ইত্যাদি, অপূর্ব্ব গীতি বাঙ্গলার ঘরে বাইরে গীত হচ্চে, আর যার কাব্য ভাব ও ভাষার সুন্দর মিলনসাধন হয়েছে"; বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ভারতী গোবিন্দ দাসের কাব্য পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন, বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ হইতে এত দিনেও আমরা তাহার কোন প্রতিবাদ শুনি নাই, কিন্তু শুনিবার আশা করিয়াছিলাম। কেন না, উদ্ধৃত উক্ত 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' পদটি গোবিন্দদাসের নহে, উহা বিদ্যাপতির। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! বাঙ্গলার সেকালের গীতিকবিতা সম্বন্ধে ঈদৃশ জ্ঞান সত্ত্বেও ইহারাই আবার একালের

গীতিকবিতার একমাত্র ভাষ্যকার। এ বিষয়ে ইহাঁদের নিজেদের এইরূপ বিশ্বাস যাহা অপরকেও করিতে বলেন।

আমরা অতিকষ্টে এই হাস্য সংবরণ করিয়াছি, কেন না, ইহা ত হাস্য-পরিহাস করিবার বিষয় নয়, কাযেই ইহাকে উপেক্ষা করিতেও আর সাহস হয় না। কেন না, আমাদের সাহিত্যে এই ব্যাধি ক্রমশঃ সংক্রামক হইতে চলিয়াছে। দিবা দ্বিপ্রহরে বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সম্পাদকায় মন্তব্য বৈষ্ণব গীতিকবিতার আলোচনায় বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদাবলীকে গোবিন্দদাসের বলিয়া—তাহাও আবার আর একজন সাহিত্যিকের অভিভাষণের প্রতিবাদস্বরূপ দাম্ভিকতার সহিত প্রচার করিতে কোন দ্বিধা—কোন সঙ্কোচ বোধ করিলেন না, এবং কেন? কিসের প্রশ্রয়ে সাহিত্যের তপোবনে আজ এই চপলতা, এই উচ্ছৃঙ্খলতা, এই দায়িত্ববোধহীনতা আসিয়া প্রেতের মত নৃত্য করিতে সাহসী হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের হিতকল্পে তাহার আশু প্রতীকার বিধানের জন্য আমরা প্রত্যেক সহৃদয় সাহিত্য-সেবীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বিগত ১৩১৮ সনের ১৯এ ফাল্গুন সাহিত্য-সম্মিলনের বাৎসরিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বঙ্কিম ও দীনবন্ধু যুগের প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালা ভাষার উপর, বাঙ্গালায় অত্যাচার আজ দশ পনের বৎসর কিছু বেশী :বেশী হইয়াছে।" তিনি বলিয়াছেন যে, 'আমি বলিতে বাধা বোধ করিতেছি না যে, আমরা ক্রমেই অধিকতর ভণ্ড হইতেছি, ধর্ম্মে ও সমাজে বহুদিন ভণ্ডামি প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এখন আমরা ...... সাহিত্যে ভণ্ড, লেখায় ভণ্ড—ভাষায় ভণ্ড।" কিন্তু বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আমরা জীবনেও ভণ্ড হইয়াছি, জীবনে ভণ্ড না হইলে সাহিত্যে ভণ্ডামি সম্ভব হয় না। আমাদের বিশ্বাস যে, বঙ্গ-সাহিত্যে অনধিকারীর অবাধ প্রবেশ আর অজস্র প্রশ্রয়ই সাহিত্যের এই দুর্গতির কারণ। বলা বাহুল্য যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে যেরূপ প্রবেশ ও গবেষণা থাকিলে কোন সমালোচকের উক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে, সাহিত্যের আসরে, একটা মত ব্যক্ত করিবার বা সমালোচনা করিবার অধিকার থাকিতে পারে, 'ভারতী'র সম্পাদকের বা দ্বয়ের তাহা নাই। 'ভারতী' বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে অনধিকারী।

যাহা হউক, আমরা ভারতীর সমালোচনার জবাবে প্রমাণ করিতেছি যে, (১) 'ভারতী' 'বাঙ্গালার গীতিকবিতা' প্রবন্ধ পড়েন নাই। অন্ততঃ উক্ত প্রবন্ধে একাধিকবার গোবিন্দদাসের নামোল্লেখ ও তদীয় কাব্যের বিশদ আলোচনা বাদ দিয়া পড়িয়া-

ছেন। ইহা না পড়িয়া, না বুঝিয়া, বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন একটা খেয়ালী উক্তি। ইহা সত্যের অপলাপ, ইহা সাহিত্যের কলঙ্ক; সমালোচনা নহে।

(২) আর ভারতী বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে কোন মত ব্যক্ত করিতে অনধিকারী। যেহেতু বিদ্যাপতির এক অতি প্রসিদ্ধ পদাবলীকে গোবিন্দদাস-রচিত বলিয়া বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিবার, শুধু অজ্ঞতা নহে, আস্পর্দ্ধা তাহাতে বিদ্যমান। অনধিকারীর পক্ষে অজ্ঞ হওয়া স্বাভাবিক। কেন না, অজ্ঞ বলিয়াই সে অনধিকারী। কিন্তু অজ্ঞ অনধিকারীর পক্ষে দুর্বিনীত হওয়া অমার্জ্জনীয়।

আমরা সাহিত্যের তপোবনের একপার্শ্বে অতি সসঙ্কোচে পড়িয়া আছি। আর বিষণ্ণমনে আশঙ্কা করিতেছি যে, এই সব অজ্ঞ, দাম্ভিক অনধিকারীর প্রবেশে তপোবনের তপস্যার কোন বিঘ্ন হইবে কি না? যদি সত্যই সাহিত্যের তপোবনে এই শ্রেণীর অনধিকারীর প্রবেশ ও প্রশ্রয়ে সাহিত্যের তপস্যার বিঘ্ন হয়, তবে এই বিঘ্ন-দূরীকরণার্থে, আবশ্যক হইলে কিছু কালের জন্য আমরা তপোবনের শান্তিকে ভগ্ন করিতে বাধ্য হইব। অর্থাৎ সাহিত্যে অনধিকারীর প্রশ্রয় আমরা আর এ যুগে নীরবে সহ্য করিব না। সাহিত্য তপোবন, প্রেতের নৃত্যভূমি নহে।

'ভারতী' আলোচ্য প্রবন্ধের সমালোচনায় বাঙ্গলায় গীতিকবিতার প্রাণ, প্রাণবিয়োগ, বাঙ্গলার সেকালের ও একালের গীতি-কবিতা ও তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভেদ, সেকালের গীতি-কবিতার বৈচিত্র্যহীনতা আর একালের গীতি-কবিতার বৈচিত্র্য, সেকালের গীতি-কবিতার ভাব ও ভাষায় অজস্র ও অবধি পুনরুক্তি আর একালের গীতি-কবিতায় না কি তাহার অভাব, বৈষ্ণব কবিতায় সুফী প্রভাব, একালের গীতি-কবিতায় রূপান্তর প্রভৃতি অনেক প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতী এই সমালোচনা-প্রসঙ্গে যত কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার সব কথাই যে দায়িত্বহীন খেয়াল আর অনধিকারচর্চ্চা, তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিব,—ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এবং আমাদের এ সাহস দুঃসাহস নয়। ভারতীর অজ্ঞতাপ্রসূত দাম্ভিকতার বিরুদ্ধে, আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্থনের জন্য, অতি বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে ইহাই আমাদের উত্তর। যাহা মাত্র দায়িত্বহীন খেয়াল, যাহা অনধিকারচর্চ্চা, যাহা একসঙ্গে অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতা, সাহিত্যে তাহার অজস্র প্রশ্রয় ও অবাধ গতিকে রোধ করিবার শক্তি বাঙ্গলা সাহিত্যের নাই, এমন বিশ্বাস যদি ভারতীর জন্মিয়া থাকে,—তবে তাহা ভুল, এবং তাহা যে ভুল,—এই ঔদ্ধত্য ও অনধিকারচর্চ্চা যদি নিজের ত্রুটি বুঝিয়া সংযত না হয়,—তবে সেই ভুল—আমরা সাধ্যমত ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিব।

আশা করা যায়,—হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের সহায় হইবেন।

আমাদের এই জবাব লেখা হইবার পর দেখিলাম যে, ফাল্গুনের ভারতী তাঁহার মাঘের সমালোচনায় ভুল স্বীকার করিয়াছেন। ‘তাতল সৈকতে’ গানটি গোবিন্দদাসের বলা হয়েছে, এটি তাঁহাদের “ভুল”। “শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁর অভিভাষণে গোবিন্দদাসের নাম একবারও মুখে আনেন নি বলাতেও তাদের “আর একটু ত্রুটি হয়ে গেছে!” ভারতীর উদ্দেশ্য ছিল বলা যে, গোবিন্দদাসের কাব্য নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। কিন্তু ঠিক সে কথা বলা হয় নি বলে’ ভারতী দুঃখিত।”

অভিভাষণে গোবিন্দদাসের কাব্য আলোচনা করা হইয়াছে কি না, ভারতী তাহা বুঝিবেন কি করিয়া? ভারতীর মতে ‘তাতল সৈকতে’ পদটিই ত গোবিন্দদাসের, এবং ঐ পদটির বিশদ আলোচনা অভিভাষণে দৃষ্ট হয়। ভারতীও মাত্র সেদিন শুনিয়াছেন (কি প্রকারে তাহাও বিশেষরূপে জানি) যে, ঐ পদটি গোবিন্দদাসের নয়।

গোবিন্দদাসের পদাবলী যে পড়িয়াছে এবং যে উক্ত পদাবলীগুলিকে অন্যান্য কবির পদাবলীর মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে সমর্থ, কেবল তিনিই বলিতে পারেন যে, অভিভাষণে গোবিন্দদাসের কাব্য আলোচনা করা হইয়াছে কি না। ভারতী যদি তাহা না পারেন, তবে সে দোষ কি অভিভাষণের?

বলা বাহুল্য যে, মহাপ্রভুর জন্মের পরবর্ত্তীর পদাবলী সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের কাব্যের যথেষ্ট সমালোচনা অভিভাষণে দৃষ্ট হয়। অন্ধের দৃষ্টিহীনতা আমরা কি করিয়া দূর করিব?

দায়ে পড়িলে মানুষ ভুল ত্রুটি স্বীকার করে না, এমন নহে। কিন্তু ভারতীর এই ত্রুটিস্বীকারের মধ্যে প্রচ্ছন্নে আত্মদোষ গোপন ও আংশিকভাবে সমর্থনের এমন একটা প্রয়াস দেখিতে পাই, যাহা হইতে বুঝি যে, ইহা শুধু বুদ্ধির অভাব নহে, চরিত্রের অভাব,—এই ছল ও দাম্ভিকতা—ইহাই নব্য সাহিত্যিকদের স্বভাব, যাহা আধুনিক সাহিত্যকে কলুষিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং যাহা সাধ্যমত রোধ করিবার জন্য সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা আহ্বান করিতেছি,—এবং আমরাও তাহা রোধ করিব।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

মহাজন-পদের ঈশ্বর-তত্ত্ব

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা ভক্তিপথে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই ভক্তির সাধ্য শ্রীভগবান্। এই ভগবৎ-তত্ত্ব নিরাকার নহে, চিদাকার।

যাঁহার মধ্যে সকল-ঐশ্বর্য্য, সকল-বীর্য্য, সকল-শ্রী প্রভৃতি "ভগ" পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, তাঁহাকেই ভগবান্ বলে। ঐশ্বর্য্য বলিতে এই জগতের রূপ-রসাদিযুক্ত যাবতীয় ভোগ্য বস্তু বুঝায়। বীর্য্য বলিতে যাহার দ্বারা এই রূপ-রসাদির ভোগ হয়, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র ও শক্তি বুঝায়। আর যে অধিষ্ঠানেতে বা দেহেতে এ সকল ইন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠিত, সেই দেহের সৌন্দর্য্যকেই আমরা শ্রী বলি।

এ জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু সকল পরিণামধর্ম্মী। এ সকল উৎপন্ন হয়, স্থিতি করে, অন্তে আবার নষ্ট বা অদৃশ্য হইয়া যায়। এমন একদিন ছিল, যখন এই প্রত্যক্ষ জগতের চন্দ্র-সূর্য্যাদি আজ যে-ভাবে দেখিতেছি, সে-ভাবে ছিল না। এই পৃথিবীর এ আকার ছিল না। এই ধরণীর বুকে এ সকল বন-উপবনাদি ছিল না। এ সকল বনস্থলীতে কোনও জীবজন্তু বিচরণ করিত না। ক্রমে ক্রমে এই জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। তিলে তিলে এই সৃষ্টি ফুটিয়াছে। এখনও এ বিকাশ শেষ হয় নাই। তিলে তিলে এই সকল ইন্দ্রিয় ফুটিয়াছে। এখনই যে এদের ফোটা নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাই বা কে বলিবে? অণু অণু করিয়া এই দেহ গড়িয়াছে, এই যে অমন সুন্দর নরতনু, তার সকল রূপের যে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই বা বলিব কেমনে?

আর এই যে বিশ্ব বিকশিত বা ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে, ইহার ভিতরে ও অন্তরালে যদি একটা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত আদর্শ কি ছাঁচ না থাকে, তবে এই ক্রমবিকাশের মধ্যে কোনও বিধি-বন্ধনের প্রতিষ্ঠা ত সম্ভব হয় না। কার্য্য-কারণাদি কোনও প্রকারের সম্বন্ধের,—বীজ হইতে বৃক্ষের, কোষাণু হইতে জীব-দেহের, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের প্রকাশের যে যে ক্রম আছে, তাহার কোনও প্রকারের অপরিহার্য্য পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যে-সকল কল্পনার উপরে আমরা সকল প্রকারের জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানাদির প্রতিষ্ঠা করি, সে-সকল বৈজ্ঞানিক কল্পনার অবসর মাত্র থাকে না।

অতএব এই জগতের প্রত্যক্ষ পরিণাম বা অভিব্যক্তি দেখিয়াই, সমষ্টিভাবে এই বিশ্বের, এবং ব্যষ্টিভাবে এই বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুর, একটা নিত্য-সিদ্ধ

বা অনাদি-সিদ্ধ বা eternally realised স্বরূপ আছে, সেই স্বরূপের আদর্শে বা নমুনাতেই এই বিশ্বের ক্রমবিকাশ হইতেছে; এ-সকল কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হই। বিশ্বের এই অনাদি-সিদ্ধ স্বরূপই ভগবানের ঐশ্বর্য্য। এ-সকল চন্দ্র-সূর্য্যাদি, এ-সকল বন-উপবন, এ-সকল ঋতু-সংবৎসরাদি, ধরণীর এ-সকল রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের পসরা, এখানে যাহা ক্রমে-ক্রমে প্রকট হয়, তৎসমুদায় নিত্য-সিদ্ধ বা অনাদি-সিদ্ধ স্বরূপেতে ভগবানের নিত্যধামেতে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে।

এই রূপরসাদিপূর্ণ জগৎকে আমরা জড় বলিয়া থাকি। যাহা নড়ে-চড়ে না, আপনা হইতে যাহা চলিতে পারে না, তাহাকেই আমরা জড় বলি। কিন্তু এই জগতের প্রত্যেক বস্তু যখন ক্রমে ক্রমে আপনাপন শক্তিতে, নিজেদের ভিতরের প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হইতেছে, তখন এ-সকলকে প্রকৃত-পক্ষে জড় বলিতে পারি কি? জড়ের শেষ তত্ত্ব (atom) পরমাণু। কিন্তু পরমাণুসকল স্থির পদার্থ নহে, পরমাণুর ভিতর হইতেই একটা শক্তি তাহাকে নিয়ত বিবর্ত্তিত ও বিঘূর্ণিত করিতেছে। সেই শক্তিই পরমাণুর শেষ-কথা। নিয়ত-চঞ্চল শক্তি-কণ ভিন্ন পরমাণু বলিয়া ত আমরা আর কিছু খুঁজিয়া পাই না। জড়জগতের মূলে ও আদিতে এই নিয়ত-চঞ্চল শক্তিকণসকলই রহিয়াছে। তাহা হইলে, এই জগৎকে যে আমরা জড় বলি, এই জড়ের অর্থ শক্তির অবস্থাবিশেষ হইয়া যায়। আর শক্তি-বস্তু নিজ-স্বরূপে চেতন-বস্তু। চৈতন্য ব্যতীত শক্তির জ্ঞান আমাদের নাই। অচেতন শক্তি বলিয়া কোনও কিছু আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আবার চৈতন্য বলিতেই জ্ঞানবস্তু বুঝি। যে-বস্তু নিজে নিজেকে জানে; নিজে নিজের ইচ্ছামত চলে; নিজে আপনার শক্তিতে আপনার উদ্দেশ্যসাধন করে; আর এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যাহা অনুকূল, তাহা আপনি গ্রহণ করে, যাহা প্রতিকূল, তাহা আপনা হইতেই বর্জ্জন করে, কিংবা বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে; তাহাকেই ত সচেতন বলি। এই ত চৈতন্যের লক্ষণ।

যে অভিব্যক্তিবাদ বা law of evolutionকে সকল বিজ্ঞান আজিকালি অবনত-মস্তকে সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছে, সেই অভিব্যক্তিবাদ বিশ্বের সর্ব্বত্র এই সচেতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই cosmic evolution'এ বা বিশ্বের এই ক্রমাভি-ব্যক্তিতে সর্ব্বত্র উপায়-উদ্দেশ্যের যোগাযোগ, সর্ব্বত্র এই অনুকূল বস্তু গ্রহণ ও প্রতিকূল বস্তু বর্জ্জন, সর্ব্বত্র এই স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচন,—চৈতন্যের এই সকল মৌলিক লক্ষণের প্রতিষ্ঠা করিতেছে। অতএব এই বিশ্ব ও বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু যে আপনাপন নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ স্বরূপেতে জড়বস্তু নহে, কিন্তু চিদ্‌বস্তু, এ কথা অস্বীকার করিব কেমনে?

তার পর, জগৎ বলিতে যাহা রূপ-রসাদির দ্বারা আমাদের জ্ঞানেতে প্রকাশিত হয়, আমরা ত তাহাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু রূপ-বস্তু যে চক্ষুর আশ্রিত। শব্দ শ্রুতির আশ্রিত। রস রসনার; গন্ধ নাসিকার; স্পর্শ ত্বকের আশ্রিত। চক্ষু যার নাই, তার নিকটে রূপ বলিয়া কোনও কিছু নাই। কর্ণ যার নাই, শব্দ তার নিকটে নাই। রূপরসাদিময় এই বিশ্বের যদি অনাদি-সিদ্ধ বা নিত্য-সিদ্ধ কোনও স্বরূপ থাকে, তাহা হইলে এ-সকলের আশ্রয়ীভূত নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ বা eternally realised ইন্দ্রিয়ও থাকা চাই। আর বিশ্ব যেমন আপনার নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ স্বরূপে জড়বস্তু নহে, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তু; সেইরূপ যে-সকল নিত্য-সিদ্ধ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে এ-সকল নিত্যসিদ্ধ রূপরসাদি নিত্যপ্রতিষ্ঠিত আছে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রামও জড়বস্তু হইতেই পারে না, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তু হইবেই হইবে।

আবার ইন্দ্রিয়সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে না, কোনও দেহেতে বা অধিষ্ঠানেতে ইন্দ্রিয়গণ একে অন্যের সঙ্গে, একই অঙ্গীর অঙ্গরূপেই, প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপরসাদি যেখানে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে, সেখানে ইন্দ্রিয়-সকলও যেমন নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেতে থাকে, সেইরূপ এই নিত্যসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রামের আধারস্বরূপ যে দেহ, তাহাও আপনার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেতেই বিদ্যমান থাকে। সে-দেহ কদাপি জড়-বস্তু হইতেই পারে না, তাহার চিদত্ব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য।

আমরা সাধন-বলে সমাধিলাভে শ্রীভগবানের স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব লাভ না করিয়াও, বিশুদ্ধ যুক্তিবলেই এই চিৎ-স্বরূপ ভগবৎ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করি। মনস্তত্ত্বের সূত্র ধরিয়াই, আপনাপন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়েই, sciectific induction বা বৈজ্ঞানিক অনুমানবলে, অন্তরে এই ভগবৎ-তত্ত্বের স্বল্পবিস্তর অনুভব লাভ করিতে পারি। এই পথে, আমাদের জ্ঞানেতে বা অনুভবে যে পরমতত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হই, তাহা নিরাকার নহে, কিন্তু চিদাকার; এই ভগবান্ নিরিন্দ্রিয় নহেন, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়সম্পন্ন; এই ভগবান্ বিদেহী নহেন, কিন্তু চিদ্দেহধারী।

এই চিদ্দেহ বস্তুটি যে কি, তাহা কেহ ভাষায় বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। যাঁহারা সাধনবলে এই পরমবস্তুর অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কখনও পারেন নাই, কেবল ঠারে-ঠোরে তার ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছেন। তখন অপরে তার বর্ণনা করিবে কেমন করিয়া? আমরা অভাব-পক্ষেই ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। অর্থাৎ এরূপ ভগবদ্দেহ স্বীকার করিয়া লইতে কোনও প্রকারের যুক্তিতর্কে বাধে না; এরূপ চিদ্দেহ ভগবানের আছে, এটি মানিলে আমাদের কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার অপরিহার্য্য বিরোধ হয় না; এই চিদ্দেহ স্বীকার করাতে জ্ঞানের মৌলিক লক্ষণের কিংবা মনস্তত্ত্বের

কোনও সত্যের ব্যাঘাত ঘটে না ; এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনও প্রকারের স্ববিরোধিতা দোষ নাই ;—এই পর্য্যন্ত অবিসংবাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। জড় ও চেতনের যে প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, তাহারই দ্বারা, প্রযুক্ত, আমরা জগতের পরমতত্বের বা Ultimate Reality'র এই চিদৈশ্বর্য্য-পরিবৃত, চিদিন্দ্রিয়সম্পন্ন, চিদ্দেহের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই। না করিলে, এই প্রত্যক্ষ অনুভবের বা অভিজ্ঞতার কোনও সত্য ও সঙ্গত অর্থ করিতে পারি না।

ফলতঃ ভক্তিতত্ব যেখানেই, যেরূপ ভাব, যতটুকু পরিমাণে ফুটিয়া উঠুক না কেন, সেইখানেই কোনও না কোনও আকারে এই ভগবৎ-তত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। খৃষ্টীয়ান্ বা মোহম্মদীয়ান ভক্তিবাদিগণ আমাদের দেশের এই ভগবৎ-তত্বের কথা জানেন না। ভগবান্ শব্দের কোনও প্রতিশব্দ জগতের অন্য কোনও ধর্ম্মের ইতিহাসে ও সাহিত্যে নাই। সাহিত্যে যার নাম নাই, সমাজের অনুভবেও সে বস্তু প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু প্রস্ফুট আকারে না হইলেও, অস্ফুট ভাবে খৃষ্টীয়ান্ ও মোহম্মদীয়ান্ ভক্তিতত্বেও এই ভগবৎ-তত্বের স্বল্পাধিক স্ফুরণ হইয়াছে। কারণ, খৃষ্টীয়ান্ ও মোহম্মদীয়ান্ সাধকেরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-তত্বে বিশ্বাস করেন। এই স্বতন্ত্র ঈশ্বর-তত্বকেই ইংরাজিতে Personal God বলে।

ঈশ্বর-তত্বকে যখনই Personal বলি, তখনই তাঁহার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা করি। আমরা প্রত্যেকে এক এক জন Person। বাঙ্গালা ভাষায় আজি-কালি আমরা এই ইংরাজি Personকে ব্যক্তি বলিয়া থাকি। আমরা এক এক জন ব্যক্তি। ইহার অর্থ এই যে, আমাদের প্রত্যেকের একটা স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে, আমাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা আমরা অপর ব্যক্তিসকল হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট বা বিশেষিত হইয়া আছি। যাহার দ্বারা রাম রাম, কিন্তু শ্যাম নহে, এটি বুঝি, তাহাই ত রামের personality বা ব্যক্তিত্ব। যাহাতে শ্যামকে কিছুতেই রাম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না, তাহাই শ্যামের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব। অতএব ঈশ্বর-তত্বকে যখনই Personal বলি, তখনই তাঁহার মধ্যে এমন কিছু লক্ষণের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই, যাহার দ্বারা ঈশ্বর যে ঈশ্বর, কিন্তু জগৎ বা জীব নহেন, ইহা বাছিয়া ও বুঝিয়া লইতে পারি।

আর যে-লক্ষণের দ্বারা আমরা এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখি ও জানি, তাহাকেই সাধারণতঃ সে-বস্তুর আকার বলিয়া থাকি। আকার মুখ্য অর্থে চক্ষুগ্রাহ্য বটে ; কিন্তু দর্শন শব্দের মুখ্য অর্থে চক্ষু দিয়া দেখা বুঝাইলেও, গৌণ অর্থে সকল জ্ঞানক্রিয়াকেও বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য গৌণ অর্থে যে কোনও লক্ষণের দ্বারা এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়,

তাহাকেই তার আকার বলা যাইতে পারে। এই অর্থেই আমাদের শাস্ত্র-সাহিত্যে একমাত্র নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকেই নিরাকার কহে, ভগবৎ-তত্ত্বকে নিরাকার বলে না। আর এই অর্থে ইংরাজিতে যাহাকে Personal God বলে, তাহাকেও কিছুতেই নিরাকার বলা যাইতে পারে না। Personal God অর্থই তিনি জগতের স্রষ্টা হইয়াও জগৎ হইতে পৃথক্। জীবের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা ও পরিত্রাতা হইয়াও জীব হইতে স্বতন্ত্র। আর তিনি যে জগৎ হইতে পৃথক্ এবং জীব হইতেও স্বতন্ত্র, যাহার দ্বারা এটি বুঝিতে ও জানিতে পারা যায়, তাহাকেই এই গৌণ অর্থে তাঁহার আকার বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর আছেন, সকল সেশ্বর-সিদ্ধান্তই ইহা বলেন। যাহা জানি বা যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই কেবল আছে বা থাকিতে পারে। এই জানা বা জ্ঞান ভিন্ন থাকার বা অস্তিত্বের আর অন্য কোনও প্রমাণ নাই, প্রমাণ থাকিতে পারে না। যাহা জানি না, তাহা যে আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। যাহা জানা যায় না, তাহা যে থাকিতে পারে, এমন কথাও বলা যায় না। ঈশ্বর আছেন, যখন এ কথা বল, তখনই এই ঈশ্বর জ্ঞানগম্য, এই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষলাভ হয়, ইহা স্বীকার কর। প্রশ্ন এই—এই প্রত্যক্ষ কিরূপ?

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কহেন, এ প্রত্যক্ষ জগতের কোনও প্রত্যক্ষের অনুরূপ নহে। জাগতিক প্রত্যক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান থাকে। কিন্তু অদ্বৈতব্রহ্মসাক্ষাৎকারে বা ব্রহ্মসিদ্ধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়; তখন এক অখণ্ড, অভেদাত্মক, অনন্ত জ্ঞানমাত্র প্রকাশিত হয়। তখন উপাসক থাকে না, উপাস্য থাকে না, উপাসনা থাকে না, থাকে কেবল চৈতন্য আর আনন্দ। এ প্রত্যক্ষ যে কি, আমি জানি না, বুঝি না। ইহার কথা কিছু বলিতে পারি না।

তবে জ্ঞানের আত্মপ্রকাশে এক স্থানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যাইয়া একে অন্যের সঙ্গে মিলিয়া যায়, ইহা বুঝি। এই মিলন ব্যতীত জ্ঞান পূর্ণ হয় না, হইতেই পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ইহাও ত প্রত্যক্ষ করি যে, যেখানেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একেবারে মিলিয়া গেল, সেখানেই জ্ঞান পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু আবার এই পরিণতিপ্রাপ্তিতেই জ্ঞান লোপও পাইল। সে-অবস্থাকে অতি-জ্ঞানের অবস্থা, super-consciousness বলিতে হয়, বল। যে জ্ঞানের ও জ্ঞানক্রিয়ার আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতা হয়, তাহার অভিধানে এ অবস্থা প্রলয়ের অবস্থা। এ অবস্থা সৃষ্টির অনাদি আদির অব্যক্ত অবস্থা।

এখানে যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে যখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধই থাকে না, তখন উপাসনায়ই বা অবসর থাকে কৈ? এই জন্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিম্ন ও অক্ষম অধিকারীর জন্য উপাসনাদি বিহিত হইলেও এ সকল ফলতঃ "অবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণি"

অবিদ্যার বা অজ্ঞানের আশ্রয়েই উপাসনাদির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব, জ্ঞানের অবস্থায়, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-উপলব্ধি হইলে, অদ্বৈতব্রহ্মসংসিদ্ধিলাভে, উপাসনাদির প্রয়োজনও থাকে না, অবসরও হয় না। এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-তত্ত্ব বা Personality of God প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। তাহা হইলে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞান, মায়াধীন জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র জগতের অনুভবের মতন স্বাভাবিক হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। চরমে, সত্যজ্ঞানলাভে এই মায়োপহিত ঈশ্বরজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু ভক্তিপন্থী ত এটি স্বীকার করেন না। খৃষ্টীয়ান্ বা মোহম্মদীয়ান্ ভক্তি-পন্থীরা কখনই এ কথা মানেন না ও বলেন না যে, সাধনের চরম-অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের উপাসক উপাস্য, সেবক-সেব্য, দাস-প্রভু, এ সকল সম্বন্ধ থাকিবে না। বরঞ্চ নিত্যকাল তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরের ভজনা, ঈশ্বরের সেবা করিবেন, ইহাই ত তাঁহাদের সকল সাধনার লক্ষ্য।

দাসের স্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্থাৎ দাস যে আপনার প্রভু হইতে পৃথক্, সে যে প্রভু নহে, এই জ্ঞান লোপ পাইলে, তার দাস্য নষ্ট হয়। আমি দাস, ঈশ্বর আমার প্রভু, এই জ্ঞান স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার জন্যই ভক্তিপথে যাবতীয় সাধন-ভজনের প্রয়োজন। এই জ্ঞান লোপ পাইলে ভক্ত নিজেকে ঘোরতর অপরাধী বলিয়া মনে করেন।

অবাধ ইন্দ্রিয়-সেবায়, যথেচ্ছ বিষয়ভোগে, এই জ্ঞান বাধা পায়। জীব নিজেকেই ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করে। এই জন্য ভক্ত বৈরাগ্য-সাধন করেন। আপনার জীবনের কোনও বিভাগের উপরে তাঁর নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, এটি বুঝিবার জন্য, ভক্ত কর্ম্মযোগাশ্রয় করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মসাধন করেন। আপনার প্রভুকে নিজের দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ভক্ত চক্ষুরাদিতে আত্মভাব বা স্বামিভাব পরিহার করিয়া, হৃষীকেশরূপে আপনার ইষ্টদেবতার ধ্যান করেন। আপনার ইচ্ছা যতক্ষণ না প্রভুর ইচ্ছার একান্ত অনুগামিনী হইয়াছে, ততক্ষণ জীবনে প্রভুর অখণ্ড প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া, তিনি সকল ব্যাপারে আত্মসুখেচ্ছা বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া, প্রভুর ইচ্ছার ও আদেশের অপেক্ষা করিয়া, দিবানিশি প্রভুর হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে চাহেন। তাঁর স্বতন্ত্র শক্তির অভিমান থাকে না, স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না, স্বতন্ত্র ভাব ও ভাবনা থাকে না; এ সকল বিষয়ে ভক্তের সকল স্বাতন্ত্র্য-বোধ আমূল নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তিনি দাস আর ঈশ্বর তাঁর প্রভু; তিনি সেবক, ঈশ্বর তাঁর সেব্য,—এ ভেদবোধ নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, সাধন যত পরিপক্ক হয়, তত এই জ্ঞান আরও পাকিয়া উঠে। সিদ্ধিলাভে প্রভুর পীঠপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁর নিত্যসেবার অধিকার পাইয়া

এই জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ ও অচ্যুত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। আমার সকলই প্রভুর, অথচ তিনি প্রভু, আমি দাস, এই জ্ঞান, এই বোধ, এই উপলব্ধি—ইহাই ভক্তির প্রাণ। সকল ভক্তিসিদ্ধান্তে এই দাস-প্রভু-তত্ত্ব নিত্য।

খ্রীষ্টীয়ান্ প্রশ্নোত্তরমালায় বা catechismএ বলে—To know God, to love God, to serve God—অর্থাৎ ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং ঈশ্বরের সেবা করা, ইহাই জীবের চরম সাধ্য বলিয়াছে। কিন্তু জানিতে গেলেই ত এমন কিছু লক্ষণের দ্বারা জানিতে হয়, যাহাতে এই ঈশ্বরকে জগতের অপর সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিব। এই "এমন কিছু" লক্ষণ কি? এই লক্ষণকেই আমাদের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীভগবানের চিদ্দেহ বলিয়াছেন।

তার পর ঈশ্বরকে ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু ভালবাসা বস্তু ত জোর করিয়া জন্মান যায় না। ভালবাসার যোগ্য যাহা, মানুষ কেবল তাহাকেই ভালবাসিতে পারে। আর এই যোগ্যতা যে কি, তাহা অপরে বলিয়া 'দিতে পারে না। এ যোগ্যতার নির্দ্দেশ কোনও কেতাবে মিলে না। যে আমার ভালবাসাকে জাগায়, সে'ই কেবল আমার ভালবাসার যোগ্যপাত্র, এ ভিন্ন ত ভালবাসার যোগ্যতা-অযোগ্যতার অন্য কোনও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা নাই। অযোগ্য জনকে যখন ভালবাসিয়াছি বলিয়া মনে হয়, তখন কেবল এই বুঝি যে, যে ব্যক্তি একদিন আমার ভালবাসা জাগাইয়াছিল, সে আমার সাকল্য ব্যক্তিত্বকে টানিতে পারে নাই, একাংশকে মাত্র টানিয়াছে। এই আংশিক ভালবাসাতেই কেবল ভালমন্দের, যোগ্যাযোগ্যের বিচার হয়। পূর্ণ ভালবাসায় এ সকল বিচারের অবসর থাকে না।

যেখানে একজন আপনার সমগ্রতা দ্বারা আর একজনের সমগ্রতাকে আকর্ষণ করিয়া, তার পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করিতে পারে, সেখানেই এই পূর্ণ ভালবাসার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এ সংসারে এই সমগ্রতা কোনও বদ্ধ জীবের নাই। কারও বা রূপ আছে, গুণ নাই; কারও বা গুণ আছে, রূপ নাই। কখনও বা রূপ আছে, গুণও আছে; কিন্তু যে প্রাণের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া এই সংসারারণ্যে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের মত ছুটাছুটি করিতেছে, সে প্রাণ নাই। সে আর যা-কিছু হউক না কেন, আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে পারে না। আমার আধখানা জীবনের অপর আধখানা লইয়া, কাপে কাপে তাহাতে বসিয়া যাইতে পারে না। এই জন্য এই সংসারের ভালবাসায় পিপাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় না, তার জ্বালাই কেবল বাড়িয়া যায়। এইটি দেখিয়া-শুনিয়াই প্রাচীন সাধকেরা বলিয়াছিলেন—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্"

যাহা পরিপূর্ণ, তাহাতেই কেবল সুখ আছে। অপূর্ণে সুখ কৈ?

যাঁহাকে ভালবাসিব, তাঁহাকে পূর্ণ হইতে হইবে। যে-ঈশ্বরকে ভালবাসিতে বলিতেছ, সেই ঈশ্বর এমন হওয়া চাই যে, তাঁহাকে পাইয়া আমার আমিত্বের সাকল্য পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে।

আর আমার এই সাকল্য বস্তুটি, এই সমগ্রতাটি কি? আমি ত কেবল নিরাকার চৈতন্ত-স্বরূপ নই। আমার একটা দেহ আছে। এই দেহেতে এ-সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই-সকল বহিরিন্দ্রিয়ের অন্তরালে অন্তরিন্দ্রিয় মন আছে। মনের অন্তরালে বুদ্ধি, বুদ্ধির অন্তরালে আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যাভিমান বা অহঙ্কার বা empirical ego আছে। আমি এ-সকল লইয়াই আমি। এ ছাড়া আমার আমিত্ব যে কি, তাহা জানি না। এসকলকে লইয়াই আমার সাকল্য। এই দেহ আমার থাকিবে না, বুঝি ও জানি। কিন্তু মরণের পরে আমি থাকিব, না থাকিব না? যদি না থাকি, তবে তোমার ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তোমার ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? যদি থাকিব, বল, তবে এমন কিছু নিশ্চয়ই আমার থাকিবে, যাহার দ্বারা আমি যে আমি, এ বোধ আমার থাকিবে। সেই এমন-কিছুকে আমার দেহ ভিন্ন আর কি বলিয়া নির্দেশ করিব? এ স্থূল দেহ থাকিবে না, কিন্তু ইহার ভিতরে কি আমার সূক্ষ্ম দেহ নাই, যাহা এই বহিরাবরণের বিনাশে নষ্ট হয় না। আমার জ্ঞান ত থাকিবে। কারণ, এই জ্ঞান ছাড়া অস্তিত্বের বা থাকার আর কোনও প্রমাণ ত নাই। জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানের করণ বা যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ও থাকিবে। জ্ঞানের করণ থাকিলেই, সে সকল করণের বা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানও থাকা চাই। এই অধিষ্ঠানই ত আমার ব্যক্তিত্বের আশ্রয়। এই সূক্ষ্ম দেহই ত আমার সত্য দেহ, নিত্য দেহ। ইহা জড় নহে, কিন্তু চিদ্বস্তু। এই চিদ্দেহেতে প্রতিষ্ঠিত চিদিন্দ্রিয় সকলই ত আমার জ্ঞানের নিত্য যন্ত্র বা করণ। এ সকলই ত আমার সাকল্য। এ সকল লইয়াই ত আমার সমগ্রতা। আমি যাহাকে ভালবাসিব, সে আমার এই সাকল্যকে আকর্ষণ করিবে। এই সমগ্রতাকে সার্থক করিবে। তাহাকে দেখিয়া আমার এই জড়াতীত নিত্যসিদ্ধ সমগ্রতা আকুল হইয়া বলিয়া উঠিবে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ, পিরীতি লাগি, থির নাহি বান্ধে॥

যে ঈশ্বরকে ভালবাসিব, সে ঈশ্বর এমনই হওয়া চাই। সে ঈশ্বর নিরাকার, নিরিন্দ্রিয়, বিদেহী হইলে চলিবে কেন?

আবার সে ঈশ্বর যে জড়বস্তু নহেন; তাঁর ইন্দ্রিয় যে জড় ইন্দ্রিয়, রক্তমাংসের বস্তু নহে; তাঁর দেহ যে রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-ধর্ম্মাধীন এই চাক্ষুষ জীবদেহ নহে,—তাহাও কি বলিতে হয়? জড়ে ত আমার সমগ্রতাকে আকর্ষণ করে না। রক্তমাংস ত আমার রূপের পিয়াসাকে তৃপ্ত করে না। যে হিয়ার পরশ লাগিয়া এই হিয়া অহর্নিশ কাঁদিয়া আকুল, সে হিয়া ত এ সংসারে মিলিল না, মিলিবেও না। ভক্ত যে-ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেন, সে-ঈশ্বর জড় নহেন, জীব নহেন, মানুষ নহেন, মানুষেরা যে-সকল দেবতা কল্পনা করে, সে-ঈশ্বর সেরূপ দেবতাও নহেন। সে-ঈশ্বর কবির কল্পনা নহেন। মনস্তত্ত্বের সূত্র নহেন। দর্শনের সিদ্ধান্ত নহেন। সে-ঈশ্বর নিরাকার নহেন, নিরিন্দ্রিয় নহেন, বিদেহী নহেন। সে-ঈশ্বর Person—ব্যক্তি। সে-ঈশ্বর পুরুষ। সে-ঈশ্বর সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। সে-ঈশ্বরে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম আপনাপন নিত্যসিদ্ধ চিৎস্বরূপে বিদ্যমান। সে-ঈশ্বরের চিদ্দেহ সকল শ্রীর আধার।

আমাদের ভাগবত সিদ্ধান্তে ইহাঁকেই শ্রীভগবান্ কহে।

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা সাধনপথে এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার পাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই ভগবানের অন্তরঙ্গ লীলাই মহাজনপদে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গান

আমার প্রাণ-জুড়ান, মন-ভুলান,
সব-হারান তুমি গো!
আমার চোখের জলে ভিজে পাতা
চাইতে ফিরে নারি গো!

হৃদয়-কমল বনে, হে মন-ভোমরা মম
এস, বস বঁধু, মধু পিয়ো গো—
(আমার) পরাণ-কমলে, কি মধু উথলে,
উপচি উছলে পড়ে গো!

এ মধু না হ'লে চলে না তোমার,
তাই রূপে রূপে ফুটি বারেবার,
তোমারই তরে হে বঁধু আমার,
আমি যে তোমারি মধু গো!

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৩

একটি স্তোত্র

নমস্তে পরমব্রহ্মন্ নমস্তে পরমাত্মনে।
নমো ভগবতে তুভ্যং চিদানন্দরূপায় তে॥
নমস্তেঽব্যক্ততত্ত্বায় জগদ্বীজাত্মনে নমঃ।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং বিশ্বরূপাত্মকায় তে॥
নমস্তে সাক্ষিরূপায় নমস্তে পুরুষোত্তম।
নরোত্তম নমস্তুভ্যং নরনারায়ণায় তে॥
পিতা নোঽসি জগন্নাথ, মাতা ত্বং স্নেহরূপিণী।
সখাসি ত্বং সুখাধার পতিস্ত্বং প্রাণবল্লভঃ॥
সাধূনাং হৃদয়ঞ্চাসি ভক্তানাং জীবিতেশ্বরঃ।
কর্ম্মিণাং ফলদঃ সাক্ষী পাপিনামসি পাবনঃ॥
জ্ঞানং দেহি সবিজ্ঞানং দেহি ভক্তিমহৈতুকীম্।
চক্ষুশ্চ দেহি মে দিব্যং যেন স্বামীক্ষিতুং ক্ষমঃ॥

অর্থ

হে পরব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার করি। হে পরমাত্মন্, তোমাকে প্রণাম করি। হে ভগবন্, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি চিদানন্দস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি অব্যক্ততত্ত্ব, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি জগতের বীজস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নিগুর্ণ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি।

তুমি সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পুরুষোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নরোত্তম, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই নর এবং নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার করি।

হে জগন্নাথ, তুমি আমাদিগের পিতা। তুমি স্নেহরূপিণী মাতা। তুমি সুখাধার সখা। তুমি প্রাণবল্লভ পতি।

সাধুদিগের তুমি হৃদয়। ভক্তদিগের তুমি জীবিতেশ্বর। কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের সাক্ষী ও ফলদাতা তুমি। পাপীদিগের পাবন তুমি।

বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান আমাকে দাও। অহৈতুকী ভক্তি আমাকে দাও। যে দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমি তোমার প্রত্যক্ষলাভ করিতে পারিব, সেই দিব্য চক্ষু আমাকে দাও।

বিবৃতি

মহাজনমুখে শুনিয়াছি, সকল প্রকারের ইন্দ্রিয়চেষ্টার একান্তনিবৃত্তি না হইলে, প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয় না। কেবল চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের কর্ম্মেরই বিরাম হইবে, তাহা নহে। অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহারও কোনও প্রকারের সংকল্প-বিকল্পাদি থাকিবে না। এই অবস্থাকে প্রাচীনেরা সমাধির অবস্থা কহিয়াছেন। এই সমাধি যখন হয়, অর্থাৎ চক্ষু যখন বাহিরের কোনও রূপ দেখে না ও দেখিতে পায় না; কান যখন বাহিরের কোনও শব্দ শোনে না ও শুনিতে পায় না; অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলও যখন আপনাপন বিষয় গ্রহণ করে না ও করিতে পায় না; আর অন্তরিন্দ্রিয়স্বরূপ যে মন, বাহিরের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে তাহাদের বিষয় না থাকিলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়-প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিয়া, আপনার মধ্যে নানাবিধ ইন্দ্রিয়রসের সৃষ্টি করে, এই মনও যখন নিশ্চেষ্ট ও সকল প্রকারের সংকল্প-বিকল্পাদি-বিরহিত হইয়া রহে; তখনই আত্মা আপনার নিজ-স্বরূপেতে নিজেকে দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। আর সেই অবস্থাতেই আত্মার আপনার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দেতে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রত্যক্ষলাভ হয়। এইটি হইলেই সত্য ব্রহ্মোপাসনা হয়। এই ইন্দ্রিয়চেষ্টার একান্তনিবৃত্তি না হইলে, সাধকের সমাধির অধিকার জন্মে না। সমাধিলাভ না হইলে স্বরূপ-উপাসনা অসাধ্য হয়। ইহাই সর্ব্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

যতক্ষণ না এই অধিকারলাভ হইয়াছে, ততক্ষণ কি তবে আমরা উপাসনাদি

করিব না? ইহার উত্তরে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—ততক্ষণ জগৎকার্য্য আলোচনা করিয়া, জগৎ-কারণের চিন্তা করিবে। নিম্ন-অধিকারীর জন্য ইহাই বিহিত।

স্তোত্রাদি এই চিন্তার বা মননেরই সহায় ও অবলম্বনরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। এই চিন্তা করিবার জন্য যে-কোনও জাগতিক বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। সাধকেরা কখনও সূর্য্যকে, কখনও পৃথিবীর পুষ্পলতাদিকে, কখনও কলনাদিনী স্রোতস্বতীকে, কখনও বা ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডলকে, কখনও প্রবল বাত্যাকে, কখনও বা জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে, কিংবা কখনও নক্ষত্র-খচিত সুনীল আকাশকে দেখিয়া, এ সকলের আশ্রয়ে, জগৎকারণের চিন্তাতে ডুবিয়া গিয়াছেন। সমাধির অবস্থালাভ যত দিন না হইয়াছে, তত দিন এই বিশ্বপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মনন ও ধ্যান অভ্যাস করিতে পারা যায়।

অয়ি সুখময়ি উষে কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক-সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?

এসকল সঙ্গীত এই প্রকৃতির সাহায্যে পরব্রহ্মের চিন্তনেরই সহায়। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এরূপ স্বভাব-সঙ্গীত বেশী প্রচলিত ছিল। নিরাকার কবিকল্পনার তাড়নায় সে সহজসৃষ্টি সকল ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

আমরা সচরাচর যে-ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করি, তাহা রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত উপাসনার মতন নহে। রাজা শাস্ত্রাবলম্বনে পরব্রহ্মের চিন্তা করিবার উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ-মননকেই রাজা ব্রহ্মোপাসনা কহিতেন। বিচার পূর্ব্বক কোনও শাস্ত্রোপদেশের অর্থগ্রহণকেই মনন কহে। অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাকে বিচারপূর্ব্বক নিজের অনুভবের বিষয় করাই মননের উদ্দেশ্য। রাজা উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠ ব্রহ্মোপাসনার মুখ্য অঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা এখন নির্জ্জন উপাসনাকালেও অনেক সময় বিড়্ বিড়্ করিয়া নানা কথার অস্পষ্ট উচ্চারণ করি, আর দশজনের সঙ্গে উপাসনা করিতে গেলে বক্তৃতা করি। মননটা একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে।

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, একটি বন্ধুকে এরূপ বিড়্ বিড়্ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে দেখিয়া, একবার এই কল্পিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, চোক খুলিয়া, বাহিরে যাইয়া, আকাশ দেখিতে বলিয়াছিলেন। আকাশ দেখিলে ব্রহ্মের অনুভূতি যতটা সহজে হইতে পারে, থামাকা কতকগুলি মনগড়া বক্তৃতা আওড়াইলে, কদাপি তাহা হইতে পারে না। এ কথা তাঁর মুখেই শুনিয়াছিলাম।

উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে, স্তোত্রাদি পাঠ করিতে হয়। স্তোত্র-পাঠের দ্বারা দুইটি ফললাভ হয়। প্রথমতঃ স্তোত্রের অর্থেতে মনোনিবেশ সহজ হয়; দ্বিতীয়তঃ উচ্চৈঃস্বরে পাঠের দ্বারা অন্যচিন্তনও নিবারিত হইয়া, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। স্তোত্র যদি সরল ও ভক্তিরসাত্মক হয়, সে স্তোত্র আবৃত্তি করিলে, পড়িতে পড়িতেই অন্তরে ভাবের সঞ্চার হইতে থাকে। ইহাতে উপাসনা সুমিষ্ট ও সরল হয়। মহাজনেরা এই জন্য স্তোত্রপাঠের উপদেশ দিয়া থাকেন।

রাজা রামমোহন ব্রহ্মোপাসনাকালে স্তোত্রপাঠ করিতেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে—

"নমস্তে সতে তে জগৎ-কারণায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়"—

ইত্যাদি স্তোত্র আছে। রাজা এই ব্রহ্মস্তোত্রটি পাঠ করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই স্তোত্রটিকেই একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে এই ব্রহ্মস্তোত্রটি'ই এখন প্রচলিত আছে।

যাঁহারা কেবলমাত্র জগৎ-কারণ ও জগন্নিয়ন্তারূপেই পরমেশ্বরের ভজনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের কিংবা মহর্ষির উদ্ধৃত ও সংশোধিত এই স্তোত্রটিই ভাল লাগিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপেই কেবল জগতের পরমতত্ত্বকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, যাঁহারা তাঁহাকে সংসারের সকল প্রেমের ও স্নেহের সম্বন্ধের মধ্যে উপ-লব্ধি করিবার জন্য লালায়িত; যাঁহারা কেবল এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতিতেই পরমেশ্বরের অনুভব লাভ করেন না, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাঁহার উজ্জ্বলতর প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন বা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য লালায়িত; তাঁহাদের পক্ষে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র পর্য্যাপ্ত হয় না। আমরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানাদি হইতে যে প্রেরণা পাইয়াছি ও পাইতেছি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা আধুনিক সমাজ-তত্ত্বের ও রসতত্ত্বের কোনও সন্ধান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নিগুর্ণ-ব্রহ্ম-ভাব-প্রেরিত স্তোত্রাদিতে তৃপ্তিলাভ করা অসম্ভব। ইহাঁরা হয় ত এই ক্ষুদ্র স্তোত্রটিতে কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন।

আমরা জগতের পরম-তত্ত্বকে তিন ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রথমতঃ জগৎ-কার্য্য দেখিয়া, এই অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের রচনাকৌশলাদির আলোচনা করিয়া, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণরূপে তাঁহার চিন্তা করিতে পারি। এই ভাবে যখন ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ে পরমতত্ত্বের সন্ধানে যাই, তখন তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্রহ্ম

বলিয়া দেখি। এই ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুই'। এই জন্য তাঁহাকে এক দিকে অব্যক্ত ও নির্গুণ বলি, অন্য দিকে জগতের বীজ-স্বরূপ এবং বিশ্বরূপ বলিয়াও তাঁর ধ্যান করি। তার পর, বিশ্ব-ধ্যান ছাড়িয়া যখন নিজের দিকে তাকাই, তখন পরম-তত্ত্বকে পরমাত্মা ও অন্তর্যামিরূপে প্রত্যক্ষ করি। এখানেই তাঁহাকে সাক্ষিচৈতন্যরূপে, পুরুষোত্তমরূপে, নরোত্তম এবং নর-নারায়ণরূপে প্রত্যক্ষ করি। তার পর, এই সংসারের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে যখন তাঁহাকে দেখি, তখনই তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা, পতিরূপে এবং সমাজের সমষ্টিভূত জীবনে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদরূপে, সাধুদিগের মধ্যে এবং ভক্তদিগের মধ্যে এবং কর্ম্মীদিগের মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ ও লীলা প্রত্যক্ষ করি। তখনই তিনি যে ভগবান্, ইহা বুঝি। এই স্তোত্রটি উপাসনার এই তিনটি ক্রমই প্রকাশ করিতেছে।

আমরা জগতের পরমতত্ত্বের কথা জানিতে যাইয়া একদিকে তাঁহাকে নির্গুণ অর্থাৎ জগদতীত কিংবা transcendental বলিয়া দেখিতে পাই; আবার অন্যদিকে তাঁহাকে জগদন্তর্ব্বর্ত্তী অর্থাৎ সগুণ কিংবা immanental বলিয়াও দেখি। তিনি জগতের কারণ। জগৎ তাঁর কার্য্য। কারণ দুই প্রকারের';—নিমিত্ত আর উপাদান। সমবায়কারণেরও উল্লেখ আছে; কিন্তু সে কথা এখানে না তুলিলেও চলে। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ, আর মৃত্তিকাকে তার উপাদান-কারণ বলা হয়। ইংরাজিতে নিমিত্ত-কারণকে efficient cause আর উপাদান-কারণকে material cause বলে। নিমিত্তকারণ মাত্রেই আপনার ক্রিয়া ও কার্য্যকে অতিক্রম করিয়া রহে। কুম্ভকার ঘটকে ব্যাপিয়া নাই, ঘটকে ছাড়াইয়াই থাকেন। সেইরূপ জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া যখন পরমতত্ত্বকে জানিতে যাই, তখন তাঁহাকে জগদতীত বা নির্গুণ বলি। উপাদান-কারণ বলিয়া যখন জগদীশ্বরকে দেখি, তখন তাঁহাকে জগদন্তর্ব্বর্ত্তী বা সগুণ বলি। তিনি জগদাত্মা; জগদন্তর্যামী; জগন্নিয়ন্তা; আবার জগদ্বীজ, বিশ্বরূপাত্মক।

তার পর, প্রশ্ন উঠে,—এই জগতের উৎপত্তি যখন ব্রহ্ম হইতে, ইহার প্রতিষ্ঠাও ত সেই ব্রহ্মেতে। অর্থাৎ জগতের রূপরসাদি তাঁর মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। রূপরসাদিময় এই জগৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়। এ সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানেতেই এই জগতের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানেতে, এই জ্ঞানের বিষয়রূপে এই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। তাঁরই ভোগ্যরূপে এসকল ঐশ্বর্য্য তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। অতএব তিনি কেবল অরূপ নহেন, কেবল বিশ্বরূপও নহেন, কিন্তু তিনি পুরুষ। আমরা যেমন, তিনিও তেমনি। আমাদের পুরুষাভিমান আছে। আমরা এই বিশ্বের রূপরসাদির জ্ঞাতা এসকল আমাদের জ্ঞেয়; আমরা বিশ্বের রূপরসাদির ভোক্তা, এসকল আমাদের ভোগ্য; আমরাও নিজেরা বিবিধ ক্রিয়ার সৃষ্টি করি, কারণ-শক্তি আমাদেরও আছে,

আমরাও কর্ত্তা। আর এই জ্ঞাতা, এই ভোক্তা ও এই কর্ত্তা বলিয়াই আমরা পুরুষ। কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। যে-বিষয়জগৎ আমাদের জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হইয়া, আমাদের বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান সাধন ও সম্ভব করিতেছে, সে-জগৎ আমাদের সৃষ্ট নহে,আমাদের অধীন নহে। আমাদের জ্ঞান এই জন্য স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু বিষয়-তন্ত্র। আমাদের জ্ঞান জাগতিক বিষয়ের অধীন, এই সকল বিষয়-সাক্ষাৎকারেই আমাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অথবা যে-জ্ঞান হইতে বিষয়জগৎ উৎপন্ন হইয়া, যে-জ্ঞানেতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ স্থিতি করিতেছে, আমাদের জ্ঞান সেই নিত্যজ্ঞানের অধীন। সেইরূপ ভোক্তা বা কর্ত্তারূপেও আমরা স্বতন্ত্র নহি। আমাদের ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বাহিরের বিষয়াধীন; কিংবা যে ভোক্তার ও কর্ত্তার ভোগ্য ও কর্ম্মরূপে এই বিশ্বের নিত্য প্রতিষ্ঠা, আমাদের ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব তাঁরই অধীন। তিনিই এক জ্ঞাতা, এক ভোক্তা, এক কর্ত্তা—এই জন্য বিশ্বে একমাত্র পুরুষ তিনি। আমাদের পুরুষাভিমান এই কারণেই সত্য নহে, কিন্তু মিথ্যা। এই পরমপুরুষই শ্রীভগবান্। তাঁর রূপ আছে, সে রূপ জড়রূপ নহে, চিদানন্দ-রূপ। আমাদের মধ্যে তিনি পরম-পুরুষ বা পুরুষোত্তমরূপে জ্ঞাতা-ভোক্তা-কর্ত্তা হইয়া চিরবসতি করিতেছেন। ছায়া যেমন আতপের সঙ্গে থাকে, আমরা সেইরূপ তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া আছি। যে নিত্য আদর্শের তুলনায় মানুষের মধ্যে আমরা সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠনিকৃষ্টাদি বা ভালমন্দাদির বিচার করি, সে আদর্শমানুষ তিনি। এই জন্য তিনি নরোত্তম। এই নরোত্তম কল্পনামাত্র নহে। লজিকের প্রতিপাদ্য নহে। এই নরোত্তম একদিকে আপনি নর, অন্যদিকে আবার আপনিই নরের আশ্রয় ও অবলম্বন—নারায়ণ। এই জন্য যিনি পুরুষোত্তম, তিনিই নরোত্তম। যিনি নরোত্তম, তিনিই নরনারায়ণ। যেমন সকল নরের মধ্যে তিনি নরোত্তম, সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম, সকল নরের মধ্যে নর-নারায়ণ; সেইরূপ তিনি সকল পিতার মধ্যে পিতা ও পিতৃতম; সকল মাতার মধ্যে মাতা ও মাতৃতম; সকল সখার মধ্যে সখা ও সখোত্তম; সকল পতির মধ্যে পতি ও পতিতম। সাধুদিগের সাধুতার মধ্যে তিনি সাধু-আত্মা। ভক্তদিগের ভক্তির তিনি প্রাণ। কর্ম্মীদিগের কর্ম্মের সাক্ষী ও কর্ম্মফলদাতা তিনি। আর পাপীদিগের পাবন তিনি। তাঁহাকে দেখিয়াই লোক পাপ কি বস্তু বুঝে; তাঁহাকে পাইয়াই লোক নিষ্পাপ হয়।

এই যে পরিপূর্ণ, বিশ্বতোমুখ, ভগবান্, এই স্তোত্র তাঁহারই বন্দনা করিতেছে। তাঁহারই চরণে প্রার্থনা করিতেছে—হে ভগবন্, সেই চক্ষু আমাকে দাও, যাহার দ্বারা তোমাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

(১৭)

থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক

সংস্কৃতে নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মূলকারণ, একেবারে গোড়া। বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাৎ মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে চিকিৎসা করেন। আমরাও সংসার-যাত্রায় সকল ব্যাপারেরই আদি কি দেখিতে চাই। বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুঁজিতে যান, তখন অবিদ্যা, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, এই বারটি সংসারের নিদান বলিয়া দেখেন। যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বই বুদ্ধ মানেন না, ইঁহাদিগের প্রথম হইতেছেন দীপঙ্কর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ। তাঁহাদিগের নামগুলি এই—১ দীপঙ্কর, ২ কৌণ্ডিন্য, ৩ মঙ্গল, ৪ সুমনস, ৫ রেবত, ৬ শোভিত, ৭ অনোমদর্শিন্, ৮ পদ্ম, ৯ নারদ, ১০ পদ্মোত্তর, ১১ সুমেধাঃ, ১২ সুজাত, ১৩ প্রিয়দর্শিন্, ১৪ অর্থদর্শিন্, ১৫ ধর্ম্মদর্শিন্, ১৬ সিদ্ধার্থ, ১৭ তিষ্য, ১৮ পুষ্য, ১৯ বিপশ্যী, ২০ শিখী, ২১ বিশ্বভূ, ২২ ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩ কনকমুনি ২৪ কাশ্যপ। ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।

দীপঙ্কর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামণের ছেলেকে বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশ জনের মধ্যে আরও ২।৪ জন, শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিষ্পাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদমতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশ জন কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সেকালের লোকে, চব্বিশ সংখ্যাটা

বড় ভালবাসিত। থেরাবাদীদের ত চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর, সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব, কোন কোন পুরাণেও ভগবানের অবতার চব্বিশটি, আমরা যে সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ। "চতুর্ব্বিংশতিমুনিমতম্" নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধিসত্ত্বগণের চারি প্রকার চর্য্যা অর্থাৎ আচার আছে! এক এক চর্য্যায় কত শত জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্য্যার শেষ অংশ মাত্র; পূর্ব্ব তিনটি চর্য্যার নামও ইহাতে নাই। চর্য্যা চারিটির নাম—১ প্রকৃতিচর্য্যা, ২ প্রণিধানচর্য্যা, ৩ অনুলোমচর্য্যা, ৪ অনিবর্ত্তনচর্য্যা। প্রকৃতি-চর্য্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, কুলজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক, লোককে সর্ব্বদাই দান করিতে, পুণ্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনও বোধি লাভের জন্য লালায়িত নয়। ইহার পরে প্রণিধানচর্য্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্য্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক একটির নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি—আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি—আমি বুদ্ধকে অনেক বস্ত্র দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি—যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি, বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি, জগৎ অনিত্য, এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্য্যা। প্রণিধান-চর্য্যার অনুকূল যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্য্যায়ই করিতে হয়। চতুর্থ—অনিবর্ত্তনচর্য্যা, এই চর্য্যা বোধি-লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না, এই চর্য্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী। অর্থাৎ কোন বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোন না কোন সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা এক প্রকার শেষ চর্য্যার নিদান।

তবে মহাসাংঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্য্যায় অসংখ্য নিদান। শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্য্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্ম্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশলকর্ম্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধানচর্য্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের

শাক্যমুনি তখন বণিক্‌শ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারও একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্য্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্ত্তন-চর্য্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপঙ্কর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্করের পরে আরও অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাভিভূ ভগবান্ বুদ্ধ অনু ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্বী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশ জনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। মহাবস্তু অবদানের আদিতেই "নিদান-নমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফ বলি কেন? অধ্যায় বলিতে পারি না, অত বড় নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। একটু উদাহরণ দিতেছি। মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাথায় আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।

শাক্যমুনিনামকানামুপস্থিতাস্ত্রিংশকোটয়ো জিনানাং।
অষ্টশতসহস্রাণি দীপঙ্করনামধেয়ানাং॥
ষষ্টিং চ সহস্রাণি প্রদ্যোতনামধেয়ানাং * * *।
তথা পুষ্পনামকানাং ত্রয়োকোটিয়োবাদিসিংহানাং॥
অষ্টাদশসহস্রাণি মারধ্বজনামকানাং সুগতানাং।
যত্র চরে ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বজ্ঞতামভিলাষায়॥
পূজয়ি পঞ্চশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং।
কৌণ্ডিন্যনামকানামপরাণি দ্বিসহস্রাণি॥
অপরিমিতাসংখ্যেয়া প্রত্যেকজিনান কোটিনযুতাং চ।
পূজয়ি বুদ্ধসহস্রং জম্বুধ্বজনামধেয়ানাং॥
চতুরশীতিসহস্রাণি ইন্দ্রধ্বজনামসুগতানাং।
নবতিং চ সহস্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং॥
পঞ্চদশবুদ্ধসহস্রাণি প্রতাপনামকানাং সুগতানাং।
পঞ্চদশ চ সহস্রাণি আদিত্যনামধেয়ানাং *

দ্বাষষ্টিং চ শতানি সুগতানামন্যোন্যনামধেয়ানাং।
চতুঃষষ্টিং চ সহস্রাণি সমিতাবিনামধেয়ানাং॥
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবলা অপরিমাণা।
সর্ব্বে অনিত্যতায় সমিতা লোকপ্রাস্তোতা॥
যানি চ বলানি কোলিত তেষাং মহাপুরুষলক্ষবরাণ্যাং।
সর্ব্বে অনিত্যতায় কালং ন উপেন্তি সংখ্যাং চ॥
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সৎকৃতস্য অনন্তরং।
বীর্য্যারম্ভো যোজিতো অনিত্যবলস্য বিঘাতায়॥

মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি, নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশী হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরিব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এ দিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাংঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতি-কোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাসাং-ঘিকেরাও বড় কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দুকল্প কোন বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া ত বুদ্ধ-কার্য্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না; ত, কে করিবে? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন, এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয়!

জাপানদেশী সুজুকি সাহেব যে লিখিয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশীবৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব ত মনে করিলেই এক কল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভাণ করিয়াছেন মাত্র। কোন কোন মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মত করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়. কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, বুদ্ধ-নিদান লইয়া এই দুই দলে যে মতান্তর ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা গেল। আরও অনেক জিনিষ লইয়া মতান্তর আছে, পরে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, মহাবস্তুতে সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে,

চারি চর্য্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্য্যাক্রমে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজান হইয়াছে। থেরাবাদীরা "বুদ্ধায় নমঃ" বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইহাঁরা গোড়ায়ই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ", অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশজনেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন!

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্য্যায় ভগবান্ শাক্যসিংহ একজন মাত্র অর্থাৎ অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে। বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্ম্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা ;—

"এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্তং মহাকাত্যায়নমুবাচ। ভগবতা ভো জিনপুত্র সম্যক্‌সংবুদ্ধেন শাক্যমুনিনা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমা ষষ্ঠা সপ্তমাসু ভূমিষু বর্ত্তমানেন যেষু সম্যক্‌সংবুদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যক্‌সংবুদ্ধানাং, কানি নামানীতি। এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্তং মহাকাশ্যপমুবাচ॥ যেষু ভো ধুতধর্ম্মধরসম্যক্‌সংবুদ্ধেষু ভগবতা শাক্যবংশপ্রসূতেন কুশলমূলবরোপিতং। তেষাং বিপুলবলবরকীর্ত্তিনাং নামানি শৃণু॥

প্রথমতঃ, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, সৃষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ, হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্য্যগুপ্তঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণ-লব্ধদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্ম, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুরন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বরবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টশক্তিঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রণষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্খলিত-

প্রবয়াগ্রঃ, ধম্নুনাসং, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্তঃ, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্য-পক্ষস্য ॥”

যেখানে একটি ছিল, সেখানে এই ত এক নিশ্বাসে সাতানব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয় ত লেখকের দোষে তিনটি নাম পড়িয়া গিয়াছে। আর এক নিশ্বাসে আর একশত নাম আছে। আরও এক নিশ্বাসে প্রায় আর একশত নাম আছে। ইহাতে ত “অষ্টমা ভূমি” শেষ হইল। আবার “নবমা ভূমি”তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরীব থেবাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহা-দিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে!

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

গান *

বাউলের সুর

সে ব'সল কি না ব'সল তোমার শিয়রে
তুমি, মাঝে মাঝে মাথা তুলে
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে ব'সল কি না)

সে তো তোমার সাথেই ছিল
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল,
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকী নাই একটিও রে ;
একটু পায়ের ধূলো বাকী আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(যাবার বেলায়)

চাও নি তারে একটি দিন
আজ হ'য়েছ দীনহীন
সে ছাড়া আর সবাই ছিল প্রিয় রে ;
আর খাস্‌নে রে বিষ পায়ে ধরি,
(তার) প্রেমসুধা পিও রে।
(দিন ফুরাল)

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল,
২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ সাল।

৺ রজনীকান্ত সেন।

---

* স্বর্গীয় কবির রুগ্নশয্যার রচনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

যুগপরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালাদেশে সংস্কারযুগ বলিয়া একটা যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আবার এক শতাব্দী শেষ হইতে না হইতেই,—এই সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের সূত্রপাতও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সভ্যতার আদর্শ আমাদের সভ্যতার আদর্শ হইতে অনেক স্থলেই স্বতন্ত্র। তথাপি এই স্বতন্ত্র সভ্যতা, বিজয়ী রাজশক্তির প্রভাবে, আমাদের সমাজ-জীবনকে ক্রমাগতই নানাদিক্‌ হইতে আঘাত করিতেছিল। আমাদের সমাজের প্রাণ-শক্তি, চারিদিকের অবস্থার এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন ও আলোড়ন, বিশেষতঃ বিদেশীয় সভ্যতার এই বহিরাক্রমণ—ইহার মধ্যে পড়িয়া আত্মরক্ষা এবং কোন কোন স্থলে, এমন কি, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও যে প্রয়াস করিতেছিল,—সংস্কার-যুগের তাহাই ইতিহাস।

অতীতের নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে অসমান অবস্থায় পতিত দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতার শতাব্দীকালব্যাপী, পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা হইতে যে যুগ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা জটিলতায় পৃথিবীর যে কোন জাতির এক অতি সঙ্কটময় যুগের সহিত তুলনীয়। বিধাতার আশীর্ব্বাদ কি অভি-শাপ বহন করিয়া এই যুগ আসিয়াছিল, তাহা সরাসরি বলিবার মত দুঃসাহস আমা-দের নাই। চিন্তাশীল মনীষীগণ এই যুগ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ সিদ্ধান্তে গিয়া উপনীত হন, তথাপি আমাদের তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর এই সংস্কারযুগের, ধরিতে গেলে দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। রাজা রামমোহনের পরে আমরা তাঁহাকেই দেখিয়াছি। রাজা রামমোহনের রোপিত সংস্কার-বৃক্ষের মূলে, তিনিই একদিন জলসেচন করিয়া তাহাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে অনেক দিক্‌ হইতে অনেক ঝড় এই সংস্কার-বৃক্ষকে আলোড়িত করিয়াছে, তাহার শাখা-প্রশাখাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের জীবনও আলোড়িত হইয়াছে, তাহার দু একখানি পঞ্জরাস্থিও হয় ত বা বিদীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কার-যুগের আদর্শ এই এক শতাব্দীকাল একভাবে দীপ্তি পায় নাই।. সংস্কারের আদর্শ, প্রায় প্রতি দশ বৎসরে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই পরিবর্ত্তনের ছায়া দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও প্রতিফলিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের জীবন বলিতে বৎসরের সংখ্যা-গণনায় উনবিংশ শতাব্দী পার হইয়া আমাদিগকে বিংশ শতাব্দীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়। সুতরাং সংস্কারযুগ ও তাহার অন্তে যে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ দেখা গিয়াছে,৮দেবেন্দ্রনাথের জীবন এই উভয় যুগ ভরিয়াই আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যাহ্নকালে জাতির নানা বিভাগে, নানা দিক্ হইতে কত নব নব বলশালী জীবনের উদ্ভব আমরা দেখিয়াছি, এই সমস্ত জীবন, সংস্কার ও প্রতিক্রিয়া এই উভয় যুগেই যে কিরূপভাবে কার্য্য করিয়াছে, প্রেরণা যোগাইয়াছে ও পাইয়াছে, তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথের জীবন কোথায়, কেন, এবং কি ভাবে মোড় ঘুরিয়া চলিয়াছে, তাহাও আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। ফলতঃ দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘজীবন আলোচনায় বাঙ্গালীর দীর্ঘ এক শতাব্দীর সমাজ-জীবনকেই আলোচনা করিতে হয়।

বাঙ্গালীর এই গত এক শতাব্দীর সমাজ-জীবনে পরিবর্ত্তনের যে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, সংস্কারযুগের আদর্শ ও প্রতিক্রিয়ামূলক যুগের আদর্শে যে পার্থক্য দেখা দিয়াছে, বাহিরের পরিবর্ত্তনে ও ভিতরের আলোড়নে,—আদর্শের দ্রুত অভ্যুদয়,—পতন ও পুনর্গঠনে, সমাজজীবনের যে আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইতে চাহিয়াছে, তাহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের জীবনের যোগ কোথায়, বিরোধ কোথায়, তাহার সম্যক্ বিচার দ্বারাই এই ঐতিহাসিক স্মরণীয় চরিত্রকে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

জন্মকাল

যখন মাত্র তিন বৎসর রাজা রামমোহন রায় রংপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া নানাবিধ সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এবং হিন্দু কলেজ মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বৎসর কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই সময় কলিকাতায় সবে সহর গড়িয়া উঠিতেছিল। মুসলমানী আমলের সহরগুলি হইতে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিচিত্র উপাদান ও বিভিন্ন শক্তিকে সরাইয়া আনিয়া—ইংরেজের এই নূতন রাজধানী ক্রমে তাহাদিগকে আপন বক্ষে কেন্দ্রীভূত করিতেছিল। এক রাজশক্তির পতন ও অপর রাজশক্তির উত্থানের সহিত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনও এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে গিয়া সংহত হইতেছিল। সুতানটি যখন ফোর্ট উইলিয়মকে বক্ষে লইয়া সহরে পরিণত হইতে চলিল, তখন ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে পেছন

ফিরিয়া, নানাদিক্ হইতে, নানাপথে, বাঙ্গালীও কলিকাতার অভিমুখে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও ঢাকার রাজবল্লভের রাজসভায়, নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালার যে সমাজ-জীবন একদিন প্রতিফলিত ছিল, তাহাও কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইয়া কলিকাতার দিকে পা বাড়াইল। দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে আমরা জাতীয় জীবনের এই বিপর্য্যয়, এই অবস্থা-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সহরের সহিত সুদূর পল্লীর যে নাড়ীর যোগ এক সময়ে ছিল, জাতীয় জীবন এই সমস্ত কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইলে পর, কলিকাতার সহিত তাহাদের তখনও সেরূপ কোন যোগ-স্থাপন ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, আজো পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজধানীর সহিত বাঙ্গালার বহুদূরস্থিত পল্লীর যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই,—মুসলমান আমলের রাজধানীর সহিত তাহা যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল এবং হিন্দুর জীর্ণ তীর্থগুলির সহিত তাহা আজিও যেরূপ ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ আছে। সংস্কার-যুগের ইতিহাস আলোচনায় এই বিষয়টি আমাদের অতিশয় সাবধানের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেননা, গত শতাব্দীর প্রায় সবগুলি সংস্কারের প্রস্রবণই কলিকাতা হইতে নির্গত হইয়াছে অথচ এই দীর্ঘ এক শতাব্দীর সংস্কার বাঙ্গালার দূর নিভৃত পল্লীজীবনকে অতি সামান্যমাত্রই বিচলিত করিয়াছে। মূর্ত্তি-পূজার অসারতা, বেদের অপৌরুষেয়ত, বিধবার পুনরায় বিবাহ, সকল জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ,—এই সকলের নিষেধ ও বিধি লইয়া সহরের শিক্ষিত বাঙ্গালী এক শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ বিব্রত হইলেও, পল্লীবাসী বাঙ্গালী ইহাতে অল্পই ভ্রূক্ষেপ করিয়াছে। মহাজনের সুদ, দারোগার ঘুষ, নায়েব-গোমস্তার উপদ্রব, মেয়ের বিবাহের যৌতুক, দুর্ভিক্ষের অংসখ্য জীবন্ত কঙ্কালের ছায়া আর প্রেতবৎ দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ—এই সমস্তই বাঙ্গালার পল্লীকে সংস্কারের সহরে সৌখীন হাওয়ায় মসগুল হইতে বাধা দিয়াছে। গত এক শতাব্দীর কলিকাতার সংস্কার, বাঙ্গালার পল্লীকে অতি অল্পই সংস্কৃত করিয়াছে।

তথাপি দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে, কলিকাতায় রাজা রামমোহন প্রায় সংস্কারের একরূপ সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব;—গোস্বামী, ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, কবিতাকার;—শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণ, এবং অন্যদিকে মুসলমান ও খ্রীষ্টান, এবং তাহাও কি শুধু ধর্ম্মে? সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, কৃষি-বাণিজ্যে, শিক্ষায়, সমাজ-জীবনের সমস্ত বিভাগেই তিনি সংস্কারের ঝড়কে প্রবলবেগে প্রবাহিত করাইতেছিলেন। একবার তিনি খুঁজিতেছিলেন বিশ্বমানবের উদার সার্ব্বভৌমিক মিলনভূমি কোথায়? আবার তিনি ভাবিতেছিলেন, জগতের ও ভারতের বিচিত্র ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলির বিশিষ্টতা রক্ষিত হইবে কিসে?

ঠিক সেই সময়েই ডিরোজীও দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার খ্যাতনামা শিষ্যগণ এমন এক প্রকার সংস্কারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন,—যাহা আদর্শে ও আকারে রামমোহনের সংস্কার-উদ্যম হইতে বহু অংশে পৃথক্। কেন না, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ হইতে প্রকৃতপক্ষেই একটা সমাজ-বিপ্লবের সূত্রপাত দেখা দেয়। রাজা রামমোহনের শাস্ত্রব্যাখ্যা আর ডিরোজীও এবং তাঁহার শিষ্যদের শাস্ত্র উপেক্ষা—এ দুই-ই সংস্কার-যুগের বক্ষভেদ করিয়া উত্থিত ও প্রবাহিত দুইটি স্বতন্ত্র ধারা। ইহাদের আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের উন্মেষকালে,—একদিকে যেমন রাজা রাম-মোহন,—অন্যদিকে তেমনি ডিরোজীও এবং তাঁহার শিষ্যগণ। ইঁহারাই প্রথম আভাষ ও প্রকাশ। সংস্কার-যুগের আদর্শের এই বৈচিত্র্য গোড়া হইতেই—বীজ হইতেই আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দু কলেজের এই সমাজবিপ্লব-বাদ—গোমাংসের কাবাব ভক্ষণ করিয়া,—আর সহর হইতে গ্রামে যাইবার সময় পাল্কীর উপর মোরগ বাঁধিয়া লইয়া আর বৈষ্ণবের তিলক মুছিয়া দিয়া এবং ব্রাহ্মণের টিকী ও উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, হিন্দু-সভ্যতাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কিন্তু শুধু বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা এই স্বাধীনচিন্তাবাদী ক্ষুদ্র দলটিকে বিচার করিলে পর,—নিশ্চিতই ইহাদিগকে অবিচার করা হইবে। সাধারণতঃ কার্য্যে স্বাধীনতা আসিবার পূর্ব্বে প্রথমে চিন্তায় স্বাধীনতা আইসে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই এ যুগে এই স্বাধীন চিন্তার প্রথম উন্মেষ আমরা দেখিতে পাই। যে বর্জ্জন-শক্তি আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জাতির একরূপ নাই বলিলেও চলে, ইহা তাহাদের মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আমরা তেত্রিশ কোটির একটিকেও ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলাম না,—এখনও নাই,—তাঁহারা তেত্রিশ কোটি ছানিয়া রামমোহনের যে একটি,—সেই একটিকেও তাড়াইয়াছিলেন। সংস্কারযুগের ইতিহাসে—হিন্দুকলেজের এই ডিরোজীও এবং তাঁহার শিষ্যদের সমাজ-বিপ্লবের আদর্শ সাক্ষাৎভাবে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে নাই। তাহার একটি কারণ যে, এই সমস্ত বিপ্লববাদী যুবকেরা অধিকাংশ স্থলেই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিল,—সমাজের অভ্যন্তরে বিশেষ স্থান পায় নাই। তথাপি ইতিহাসের একটি অধ্যায় ইহাদিগকে সগৌরবে ছাড়িয়া দিতে হইবে,—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

এই সময়ে আবার খৃষ্টান মিসনারীগণ আমাদের আত্মার পরিত্রাণ ইচ্ছা করিয়া শ্রীরামপুর হইতে খৃষ্টের চিরপূজ্য ধর্ম্মকে যে ভাবে প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাহাতে খৃষ্ট-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার-নীতি

যেরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে কেবল রাজা রামমোহনের প্রতিভা ও স্বাজাত্যবোধই আমাদের মুখ রক্ষা করিয়াছে। শুধু তাই নয়, খৃষ্টের ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া প্রচার করিবার অপরাধে রাজা রামমোহন মিসনারীদের মুখে চুণকালী দিতে বাকী রাখেন নাই।

আবার এই রাজা রামমোহন যখন নিকৃষ্ট অধিকারীর উপযোগী বলিয়া, মূর্ত্তি-পূজাকে উপেক্ষা করিয়া,—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য এক পরব্রহ্মের ধ্যান ও ধারণা পুনঃ প্রচলন করিবার ইচ্ছায় জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং সতীদাহ অশাস্ত্রীয় ও অমানুষিক বলিয়া, রাজবিধিদ্বারা বন্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন, তখন অন্য পক্ষে স্যার রাধাকান্ত মূর্ত্তি-পূজা ও সতীদাহের সমর্থন করিয়া ব্রহ্মসভার বিরোধী ধর্ম্মসভাকে দাঁড় করাইয়া সহরের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। স্যার রাধাকান্তের বিদ্যাগৌরব, স্ত্রীশিক্ষায় অনন্য-সাধারণ উৎসাহ প্রভৃতি অপরাপর দেশহিতকর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যেন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিবার স্পর্দ্ধা না করি। রাজা রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংস্কার-যুগের ইতিহাসে আমরা যেন যোগ্য আসন দিতে কুণ্ঠিত না হই।

আর দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে—রামমোহনকে ভাবিতে গেলে, তাঁহার সঙ্গীদের বিষয় আমরা না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। রামমোহন যখন মূর্ত্তিপূজা ও সতীদাহের বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিলেন—তখন তাঁহার অধিকাংশ সঙ্গীই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কয়জন মাত্র বাঙ্গালী সেই বিপদের দিনে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বরক্ষা করিয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে এক জন। রাজা রামমোহন, বা স্যার রাধাকান্ত হইতে প্রিন্স দ্বারকানাথের জীবন স্বতন্ত্র। তথাপি চরিত্রের বিশিষ্টতা ও বলশালিতায়, দেহ ও মনের সৌন্দর্য্যে ও ক্ষমতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এক জন অসাধারণ বাঙ্গালী। সংস্কারের ইতিহাসে রামমোহনের পরেই সাধারণতঃ লোকে দেবেন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করিয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তথাপি রামমোহনের পরে দেবেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ রামমোহনের সমসাময়িক রাধাকান্ত, দ্বারকানাথ প্রভৃতিকে ভুলিয়া যাই এবং অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ রামমোহনের চরিত্রের যে সমস্ত দিক্ দেবেন্দ্রনাথে একেবারেই নাই বলিয়া, দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র অনেকাংশে দুর্ব্বল ও নিষ্প্রভ এবং সংস্কারের ইতিহাসে বহু পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে, দ্বারকানাথের চরিত্রে রাজার চরিত্রের সেই সমস্ত দিকের কোন কোন অংশ সম্যক্ বিকাশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথের জন্মকালে কলিকাতায় সহরের গোড়াপত্তন, রামমোহনের কলিকাতা আগমন ও সংস্কার-উদ্যম,—ডিরোজীও এবং তাঁহার শিষ্যদের সমাজ-বিপ্লববাদ,—শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিসনারীদের হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ,—রামমোহনের বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের আত্মরক্ষার প্রয়াস,—সমাজ-বক্ষে এই সমস্ত আলোড়ন প্রবলভাবে চলিতেছিল।

ডিরোজীও এবং রামমোহনের প্রভাব

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ডিরোজীও এবং রামমোহনের প্রভাব আলোচনা করিবার বিষয়। কেন না, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজের ছাত্র—আর রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের পিতৃবন্ধু।

দেবেন্দ্রনাথ চৌদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং মাত্র দুই বৎসর উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে শ্রেণীতে পড়িতেন, ডিরোজীও সে শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন না। শুধু তাহাই নহে,—দেবেন্দ্রনাথ ভর্ত্তি হইবার পর মাত্র চারিমাস ডিরোজীও হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তথাপি দেবেন্দ্রনাথ যে ডিরোজীওর কোনরূপ সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন নাই বা তৎকালীন ডিরোজীওর শিষ্যদের মত স্বাধীনচিন্তা ও সমাজবিপ্লববাদের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হন নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ করেন, আমরা কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি না।

হিন্দুকলেজে অধ্যয়নকালে ডিরোজীওর প্রভাব হইতে বঞ্চিত থাকা চরিত্রের সম্প্রসারণশক্তির অভাবই বুঝায়, অন্য কিছুই নহে। ডিরোজীও যে শুধু কলেজে শিক্ষকতা করিতেন, তাহা নহে। কলেজের বাহিরেও তিনি নিজের বাড়ীতে উৎসাহী ও প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রদের লইয়া সদাসর্ব্বদাই নানারূপ স্বাধীন আলোচনা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হইতে পারে, ডিরোজীওর সংস্পর্শে না আসিবার—ইহাও একটি কারণ। আর দেবেন্দ্রনাথের বয়সও তখন অধিক ছিল না। তদ্ব্যতীত হিন্দুকলেজ ছাড়িয়াই তিনি যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার মনের অবস্থা ও গতি কোনরূপ স্বাধীনচিন্তাবাদ বা সমাজবিপ্লবের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে হয় ত অনুকূলই ছিল না।

ডিরোজীও প্রভৃতি হিন্দুকলেজের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথের জীবনে কোনরূপ কার্য্য না করিয়া থাকিলেও রাজা রামমোহনের প্রভাব তাঁহার উপরে বাল্যজীবন হইতে

আরম্ভ করিয়া শেষ বয়স পর্য্যন্ত স্থায়িভাবে কার্য্য করিয়াছে, ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহনকে তাঁহার পিতা অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন,—এমন কি, রাজা আসিয়াছেন শুনিলে দ্বারকানাথ পূজা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া, রাজাকে সংবর্দ্ধনা করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ ইহা দেখিতেন। রাজা রামমোহনের গম্ভীর মুখ দেবেন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করিত। রাজাকে তিনি ভয় ও সম্ভ্রম করিতেন। দুর্গাপূজার সময় রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে—"আমাকে নিমন্ত্রণ?" রাজার এই উত্তর তাঁহাকে কিরূপ স্তম্ভিত করিয়াছিল, তাহা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভাবিতেন। রাজা যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন তিনি দ্বারকানাথের সহিত দেখা করিতে আসেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন সেখানে উপস্থিত না থাকায়—রাজা দেবেন্দ্রনাথকে তথায় আনাইতে বলেন, কেন না, বালক দেবেন্দ্রনাথের সহিত করমর্দ্দন না করিয়া তিনি বিলাত যাইতে পারেন না, এইরূপ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত ঘটনা দেবেন্দ্রনাথ যেরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যকালেই তিনি রাজা রামমোহনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে তাঁহার পিতা দ্বারকানাথের কোন প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই। তথাপি বংশগত আভিজাত্যবোধ ও খৃষ্টান পাদরীদের উপর বিরাগ—এই দুইটি ভাব দেবেন্দ্রনাথ যদি দ্বারকানাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

"বিলাসের আমোদ"

রাজা রামমোহন যখন ব্রিষ্টলনগরে দেহত্যাগ করেন, দেবেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতার ধনি-গৃহের এক জন অপরিণতবয়স্ক ১৬ বৎসরের বালক মাত্র। সেই বৎসরেই তিনি হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি রামমোহন, কি ডিরোজীও—ইহাঁদের কাহারও কথা যে তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, আমাদের তাহা মনে হয় না। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ তখনকার দিনের ধনিসমাজে এক জন প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী, ভোগপরায়ণ, বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতার ধনিসমাজের বিলাসের উপকরণাদি তখন খুব আধ্যাত্মিক রকমের ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে, যৌবনের উন্মেষকালে, সেই অপরিণতবয়সে তাঁহার ভোগ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করিবার যথেষ্টই সুযোগ পাইয়াছিলেন। কেন না, তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ভোগ-প্রবৃত্তিকে অনশনে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ত ছিলেনই না; পরন্তু আদর্শে ও আচরণে ইহার বিপরীতমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই আমাদের

ধারণা। দ্বারকানাথ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে ও বিলাসের কুসুম-সজ্জায় নিজেও যেমন নিমজ্জিত হইতে ভালবাসিতেন, পুত্র দেবেন্দ্রনাথকেও তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি সাক্ষ্য দেয় না। দ্বারকানাথের প্রশ্রয়ে, অথবা তৎকালীন কলিকাতার ধনী যুবকদের সংসর্গে,—অথবা স্বীয় ভোগপ্রবৃত্তির স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত তাড়নায় দেবেন্দ্রনাথ যে এই সময় ভোগবিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন,—তাহা আমরা দেখিতে পাই। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে—"আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলাম"। তখনকার দিনের কলিকাতার ধনী যুবকদের বিলাসের আমোদ বলিতে কতখানি বুঝায়, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না, এমন নয়। তাঁহার লাখটাকা খরচ করিয়া সরস্বতী-পূজা, তাঁহার "সাচ্চা রূপালি জরির কাজকরা সাটিনের লম্বা জোব্বা" আর "মণিমুক্তাজহরত-খচিত জুতা"—ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপোল্লাস ও সৌন্দর্য্যপিপাসা, বিলাসীদের মজ্‌লিসে তাঁহার "বাবু" খ্যাতি রটিয়া যাওয়া সম্বন্ধে যে সমস্ত জনশ্রুতি আজিও আমাদের কাছে ভাসিয়া আইসে, তাহাতে যদি নীতিবাদীরা নাসিকা কুঞ্চন করেন,—আর জীবনচরিত-লেখকেরা তাহা যথাযথ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন,—তথাপি জীবন-বাদীরা এই উভয় দলকেই ভ্রূক্ষেপ না করিবার সাহস হারাইবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এই "বিলাসের আমোদ" অধ্যায়টি জোর করিয়া লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার ধর্ম্মজীবনকে যথাযথরূপে বুঝিয়া উঠা ক্রমেই কঠিন হইবে, এবং তাহা যে হয় নাই, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। যাহা হউক, যদি এই সময়ে তাঁহার দিদিমার মৃত্যু, সহসা তাঁহাকে 'বিলাসের আমোদ' হইতে ধর্ম্মজীবনের জন্য উদ্বুদ্ধ না করিয়া দিত, তবে কে জানে, তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি কোন্ দিকে ধাবিত হইত?

ধর্ম্মজীবন ও প্রচার

দেবেন্দ্রনাথের দিদিমার মৃত্যুতে তাঁহার মনে সংসারবৈরাগ্যের উদয় হয় এবং এই শুষ্কতাবোধ ও সংসারবৈরাগ্য হইতে ক্রমে ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ তাঁহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজা রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করেন, এবং রামমোহনের ব্রহ্মসভা, যাহাকে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একাকী দশ বৎসর ধরিয়া অগ্নিহোত্রীর মত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই ব্রহ্মসভাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া নাম দেন 'ব্রাহ্মসমাজ' √ এবং দুই বৎসর পরে এই ব্রাহ্মসমাজেই রামচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম কি? উপাসনা-প্রণালী কি? প্রভৃতি বিষয় বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হন, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রস্বরূপ প্রকাশ করেন। এই সময় অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজনারায়ণ বসু এই দুই মনীষী তাঁহার দুই পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, এবং একমাত্র ইহাঁদের উভয়ের সহায়তার উপরেই নির্ভর করিয়া দেবেন্দ্রনাথ, কেশবের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-কার্য্যকে পরিচালিত করেন।

রাজা রামমোহনের আত্মীয়সভা, পরে ব্রহ্মসভা, তার পর দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ব-বোধিনী সভা, এই সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল—ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্র-নাথ এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু রামমোহনের ব্রহ্মসভার সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্মসমাজের অনেক পার্থক্য। মূর্ত্তি-পূজার অস্বীকার দেবেন্দ্র-নাথ রামমোহনকে অনুসরণ করিয়া থাকিলেও,—'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রহ্মসমাজের' যে আদর্শ রামমোহনের ছিল,—দেবেন্দ্রনাথের অনুষ্ঠানে তাহা রক্ষিত হয় নাই।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভা বা সমাজ, তাঁহার ট্রাষ্টডিড্ হইতে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের জন্য একটি সাধারণ প্রার্থনা-সভার সৃষ্টি মাত্র। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদের এক সাধারণ মিলন-ভূমির প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্মসভা। ইহা কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতকে নিরসন করিয়া কোন নূতন ধর্ম্মমতকে স্থাপন করে নাই। ধর্ম্মের একটা বিশ্বজনীন ভাব দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়াই রাজা এই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু আবার ইহাও ঠিক যে, খৃষ্টানদের গির্জ্জায় না গিয়া কোথায় বন্ধু-বান্ধবে মিলিয়া প্রার্থনা করা যায়, এমন একটি মন্দির-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হইতেই রাজা ব্রহ্মসভাকে সৃষ্টি করেন। খৃষ্টান চার্চ্চের অনুকারী না হইলেও খৃষ্টান চার্চ্চের প্রার্থনাপদ্ধতিই ব্রহ্মসভার প্রার্থনার মূল, এবং ক্রমে স্বাজাত্যবোধ আসিয়া যে এই ব্রহ্মসভাকে হিন্দুভাবাপন্ন করে এবং রাজা ইংলণ্ডে গিয়া দেহ-ত্যাগ করিলে পর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে ইহার মতকে বৈদান্তিক অদ্বৈতমতের সহিত জুড়িয়া দেন,—শূদ্রের অসাক্ষাতে ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠ করান, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাই।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সৃষ্ট এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এবংবিধ ব্রহ্মসভাকে ভাঙ্গিয়া গড়িলেন এক ব্রাহ্মসমাজ। ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এখন আসিল "ব্রাহ্ম"। দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে মূর্ত্তি-পূজাকে অস্বীকার করিলেন। আবার সেই সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্মকে ও বৈদান্তিক অদ্বৈত মতকেও নিরসন করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিধি নির্দ্দেশ করিলেন।

"বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের" স্থানে এখন আসিল—"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম।" এই নূতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপাসনা-প্রণালীও তিনি স্থির করিয়া দিলেন।

রাজা রামমোহন ব্রহ্মসভাতে উপাস্য দেবতার যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার বেদান্তমীমাংসায় ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়,—দেবেন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম তাহা হইতে অনেক পৃথক্। রামমোহন উপাসনার যে প্রণালী—যে সমস্ত শ্লোকাদি স্থির করিয়া গিয়াছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ সেই উপাসনা-প্রণালী ও সেই সমস্ত শ্লোকাদি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে, কি ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশে, কি উপাসনা-প্রণালীতে রাম-মোহনের আর কোনই স্থান রহিল না। প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের মতে বিশ্বাসে ও সাধনতত্ত্বে সর্ব্বত্রই রামমোহনকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। শুধু মিল রাখিলেন—অভাবাত্মক একটি জিনিষে অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

দীক্ষিতের নিবেদন

হে গুরু, করিলে এ কি জ্ঞানের গরিমা দেখি
  জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, হয়ে গেল ছাই ;
কি মন্ত্র দানিলে কানে কি ঝড় তুলিলে প্রাণে
  তুমুল প্রেমের বানে কোথা ভেসে যাই !
বিচার-প্রাসাদ গেল সংস্কার-কুটীর গেল
  অহমিকা-বট গেল কোথায় দাঁড়াই !

লোভ মোহ ক্রোধ গেল দ্বেষ হিংসা তৃষ্ণা গেল
  অহঙ্কার সেও গেল জীবন-সম্বল ;
কিছু নাই কিছু নাই তারি মাঝে সব পাই,
  শক্তিহীনে দিলে শক্তি এ কি মহাবল ।

নাহি গেনু হরিদ্বার বারাণসী তীর্থ সার,
  বসিয়া ঘরের কোণে গণ্ডূষে গঙ্গার,
বিচিত্র অলকনন্দা বহালে সঙ্গীত ছন্দা
  কোথা হিমালয় কোথা মন্দর-মন্দার ।

মাতৃরূপা ভগ্নীরূপা বধূরূপা কন্যারূপা
  শ্যামলা সুস্নিগ্ধা দিলে নব কল্লোলিনী ;
উষর উর্ব্বর হ'ল সাহারা কান্তার হ'ল
  ভক্তির নির্ঝর আজি প্রেমে নিস্তারিণী !

ধরা আজি তুচ্ছ দেখি ঐশ্বর্য্য সীসার মেকি
অন্তরের গুপ্তরাজ্যে রত্ন-সিংহাসন ;
এ বিভূতি লয়ে আমি কি করিব অন্তর্যামী
অনুতাপ-গঙ্গাজলে ধোয়া এ আসন।

হৃদয় দিতেছি ঢালি এ প্রাণ রেখো না খালি
দৈত্যের আলয় আর ক'রোনাক তারে ;
সগুণে নির্গুণে এস হে অনন্ত সান্তে এস
সত্ত্ব-রজ-তমে এস আলোকে আঁধারে।

মার্ত্তণ্ড-প্রতাপে এস চন্দ্রের কিরণে এস
প্রভাতে অরুণরাগে সান্ধ্য মহিমায় ;
তরঙ্গ-হিল্লোলে এস বন্যার তুফানে এস
প্রলয়ের প্রভঞ্জনে মলয়ের বায়।

বীজে এস বৃক্ষে এস কাণ্ডে এস মূলে এস
শাখা-প্রশাখায় এস প্রসূনে পাতায় ;
সূক্ষ্মে এস স্থূলে এস সত্যে এস ভুলে এস
জীবে এস জড়ে এস প্রত্যক্ষে মায়ায়।

ঘটে এস পটে এস অশ্বত্থ বটেতে এস
উপলে শিলায় এস এস প্রতিমায় ;
আগমে নিগমে এস শাস্ত্র মন্ত্র তন্ত্রে এস
এস বিসর্জ্জনে এস বোধনে পূজায়।

ঊর্দ্ধে এস অধে এস জলে স্থলে ব্যোমে এস
সম্মুখে পিছনে এস এস দশ দিকে ;
স্তুতিতে অষ্টকে এস পাঠে এস হোমে এস
শ্রুতিতে স্মৃতিতে এস বেদ-আদি ঋকে।

দারিদ্র্যে ঐশ্বর্য্যে এস সন্ন্যাসে ভিক্ষায় এস
আদানে প্রদানে এস এস বিতরণে ;
ক্রিয়ায় কলাপে এস যাগে এস যজ্ঞে এস
অশ্বমেধে রাজসূয়ে সতিল-কাঞ্চনে।

রূপ রস গন্ধে এস শব্দ স্পর্শ হর্ষে এস
ভাবেতে ভাষায় এস খাদে কি ঝঙ্কারে ;
শিরায় শোণিতে এস ধ্যান-ধারণায় এস
যোগে প্রাণায়ামে এস প্রণবে ওঙ্কারে।

কৈশোরে উন্মেষে এস যৌবনে জোয়ারে এস
শৈশবে হাসিতে এস জরায় ক্রন্দনে ;
নিষ্ফল চেষ্টায় এস সফল করমে এস
জন্মান্তরে কর্ম্মফলে মুক্তিতে বন্ধনে।

জ্বালায় দহনে এস নির্ব্বাণে সলিলে এস
প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে এস হুতাশনে ;
মেদিনী-কম্পনে এস বিপ্লবে নীতিতে এস
মহামারী মন্বন্তরে এস সুশাসনে।

হ্রাসেতে বৃদ্ধিতে এস ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে এস
জয়ে পরাজয়ে এস জীবনে কল্যাণে ;
সংগ্রামে সংহারে এস দুষ্কৃত-বিনাশে এস
যুগে যুগে জন্মে জন্মে সাধু-পরিত্রাণে।

অখণ্ড মণ্ডলে এস বিশ্বচরাচরে এস
অজ্ঞান-তিমিরে এস জ্ঞান-শলাকায় ;
সঙ্কোচে ব্যাপ্তিতে এস স্থিতিতে গতিতে এস
অন্ধের নয়নে এস দিব্য-দৃষ্টি প্রায়।

জনমে মরণে এস উদ্বাহে উৎসবে এস
রোগে এস শোকে এস এস প্রতীকারে ;
শ্মশানে মশানে এস অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় এস
অন্তিমে বিয়োগে এস বৈতরণী-পারে ।

লজ্জায় ঘৃণায় এস পাপে এস পুণ্যে এস
প্রেমে করুণায় এস কলঙ্কে গৌরবে ;
বিচারে রক্ষায় এস দণ্ডে পুরস্কারে এস
বৈকুণ্ঠের দ্বারে কিবা কিবা সে রৌরবে ।

এস

শাক্তরূপে রক্ত দিব শৈবরূপে বিল্ব দিব
বৈষ্ণবের রূপে দিব তুলসীর হার ;
এ অর্ঘ্য চরণে ধর এ পূজা গ্রহণ কর
এস গুরু এস প্রভু এস সারাৎসার ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত ।

বিমাতা

জানি না, কোন্ পাপে তাঁহাকে হারাইলাম। না হইলে তিনি ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তবে আবার চলিয়া গেলেন কেন? হায়! মা হারাইয়াও মা ত পাইয়াছিলাম, কিন্তু রাখিতে পারিলাম কৈ!

সে অনেক দিনের কথা! আজিও যখন তাহা মনে পড়ে, গা কেমন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠে। আমার যখন আট বছর বয়স, আমার ভাই শঙ্কর তখন ছয় বছরের। মা আমাদের দুটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝিলাম না, সকলের কান্না দেখিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। শুধু বাড়ীর বুড়ো ঝি আমাদের বুঝাইল যে, আর মা আসিবেন না, আর আমরা দুষ্টামী করিলে বকিবেন না, আমরা কাঁদিলে বুকে করিয়া আদর করিবেন না, আর আমরা মাকে দেখিতে পাইব না। বুকটার ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, শঙ্করের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। ভাবিলাম, কোথায় গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন। আর যে ফিরিবেন না, তা বিশ্বাস হইল না।

কিন্তু হায়, মা আর ফিরিলেন না।

দিনে অনেক বদল হয়, সবারি যা হয়, আমাদেরও তাহাই হইল। বাবার ভালবাসায়, ঠাকুরমার আদরে ও পিসীমার যত্নে, আমরা যেন সব ভুলিতে লাগিলাম, মার অভাব বড় মনে পড়িত না, কেবল শঙ্কর যখন এক একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিত—"দিদি! মা কোথায়?" তখন কোন উত্তর দিতে পারিতাম না, কাঁদিয়া ফেলিতাম।

তার পর ঠাকুরমা জোর করিয়া বাবার বিবাহ দিলেন।

সে দিন আমার বেশ মনে আছে। সেই সন্ধ্যাবেলা ঢাক-ঢোল বাজিতেছে, সানাইয়ের সুর আকাশে ছড়াইয়া যাইতেছে, সন্ধ্যার আলো ও শাঁকের আওয়াজের সঙ্গে আমার নূতন মা আমাদের ঘরে আসিলেন। এমন শান্ত চেহারা—দেখিলেই যেন তাঁহার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করে। আগে

কেন তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না? বুঝিলে বুঝি বা এত বছর পরেও আমাকে এমন করিয়া প্রাণে প্রাণে এ স্মৃতি, এ কাহিনীকে বাঁধিয়া রাখিতে হইত না।

কপালে যাহার যা না থাকে, তা তাহাদের সহিবে কেন? নতুন মার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আঁচোল ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বেড়াইতাম। তিনি আমাদের কত আদর করিতেন, কত গল্প বলিতেন, কত পুতুল দিতেন, কিন্তু আমাদের কপালে তাহা সহিল না। বুড়ো ঝি ও পড়সীরা ঠাকুরমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল, মার কাছে আমাদের যেন যাইতে না দেওয়া হয়।—"বাবা! সৎমা কি কখন আপনার হয়, ও মিট্‌মিটে ডান্ ছেলে খাবার রাক্ষস—ওই প্যারীদিদির বোনপোকে তার সৎমা বিষ দিয়ে মার্‌লে, সেও অমনি কত যত্ন আদর দেখাত।" পাড়ার রাঙা পিসী বলিল, "ও দিদি, তুমি জান না, ওই আমাদের তরীকে ভাতের ভেতর কিসের শেকড় দিয়েছিল"—এই রকম কত দৃষ্টান্তই তাঁরা দেখাইয়া দিলেন—মা আমাদের আদর-যত্ন করিলে হইবে কি, তাঁর মন ত বিষে ভরা। শেষে কি জানি যদি বিষ দেয়! ঠাকুরমা এই সব শুনিয়া আমাদের মার কাছে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

প্রথম প্রথম আমাদের বড় মন কেমন করিত, মার কাছে যাইবার জন্য কান্নাকাটি করিতাম। তখন পিসীমা আমাদের বুঝাইলেন—"পর কি কখন আপনার হয়; ও ত আমাদের মা নয়, এখন নতুন নতুন ব'লে তাই অমন আদর কর্‌ছে, এর পর কোন দিন শেষে কি কাণ্ড করবে তখন"—এমনি করিয়া কত রকম ভয় দেখাইলেন। যখন পিসীমা, ঠাকুরমা, বুড়ো ঝি এই সব ভয় দেখাইত, তখন প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিত, সত্যি না মনে করিয়া থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু তবু কেমন তাঁহার কাছে কাছে থাকিতে ইচ্ছা হইত।

এমনি করিয়া আস্তে আস্তে আমরা তাঁর কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। দিনে দিনে আমাদের এমন হইল যে,ভয়ে আমরা তাঁর ত্রিসীমানা মাড়াইতাম না, কি জানি যদি মারে, যদি সত্যিই ঠাকুরমা যা বলে—তা যদি সত্যি হয়—যদি বিষ খাওয়ায়!

হায়! তাঁর সেই ছলছল্ দৃষ্টি আমি কখন ভুলিব না। যেন চোরের মত বেড়াইতেন, সর্ব্বদাই যেন কি চুরি করিয়া মহা অপরাধী হইয়াছেন, সদাই যেন ধরা পড়িবার ভয়। আমাদের সঙ্গে লুকাইয়া কথা বলিতে কত চেষ্টা করিতেন, কত আদর করিতেন, দুর্ভাগা আমরা তখন তাহা বুঝি নাই। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসিতেন.অমনি আমরা ঠাকুরমাকে বলিয়া দিতাম। ঠাকুরমা ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেন, 'রাক্ষুসী ডাইনী'—মা ঘরের কোণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেন। একদিন শঙ্কর ও আমি সিঁড়ির ধারে খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ শঙ্কর আমাকে দৌড়িয়া ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল। মা তখন বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, শঙ্কর পড়িয়া যাইতেই,তিনি"ষাট ষাট"বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে করিয়া লইলেন। শঙ্কর তাঁহার কোলে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শঙ্করের কান্না শুনিয়া ঠাকুরমা দৌড়িয়া আসিয়া মার কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন, মাকে.মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বৌ, না হয় আছই সৎমা, তাই ব'লে কি দুধের ছেলের উপর একটু মায়া হয় না! ইচ্ছে ক'রে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, আবার এখন লোক-দেখান সোহাগ করা হচ্চে।—ফের যদি তুমি ওদের সাম্‌নে এস, তবে ভাল হবে না বল্‌ছি।—আহা!—দাদুর আমার কপালটা একেবারে গেছে, ও মা! এমন ডাইনী ঘরে এনেছিলাম গো।"—মা চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের ঘরে গেলেন। রাঙা পিসী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মার এই কান্না দেখিয়া বলিলেন, "ও মা! আবার কান্না হচ্ছে—সতীন-পুতের জন্য দরদ ত' কত, ওরে আমার দরদী রে, বলে—

'বেয়ানের মার আদরে,
সেজে পাটীতে না ধরে'—

কালে কালে কতই দেখ্‌ব।" রাঙা পিসী মুখ ঘুরাইয়া ঠাকুরমার পিছনে পিছনে চলিলেন।

আর একদিন মার বাপের বাড়ী হইতে মিষ্টি আসিয়াছিল, মা লুকাইয়া আমাদের তাহা দিতে গেলেন। মিষ্টির লোভে আর তাঁর কাছে যাইতে একটুও দেরী করিলাম না। তিনি আমাদের হাতে দুটি সন্দেশ সবে তুলিয়া

দিয়াছেন, আমরাও যেমনি তা মুখে দিতে যাইব, অমনি কোথা হইতে বামা-দাসী আসিয়া বলিলেন, "বৌ-ঠাকরুণ, বড় যে সন্দেশ দিচ্ছ! আমি এখুনি ঠাকরুণকে ব'লে দিচ্ছি!" আর কোথা যায়, ঠাকুরমা সেই সন্দেশের কথা শুনিয়া, বাঘিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া আমাদের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন। মাকে বলিলেন, "হুঁ—সন্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ওরে আমার সন্দেশ-দিয়োনি রে!" বামাকে বলিলেন,—"ভাগ্‌গিস্ বামা তুই দেখ্‌তে পেয়েছিলি, নইলে আজ কি সর্ব্বনাশই হ'ত।" মাকে বলিলেন, "ফের যদি তুমি বউ আবার এই সব কর, ত' ভাল হবে না বল্‌ছি।" মা মুখে কাপড় দিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমাদেরও কিন্তু সন্দেশ না পাইয়া ঠাকুরমার উপর বড় রাগ হইয়াছিল।

এখন কত কথাই মনে আসিতেছে। তিনি বাড়ীর বউ হইয়াও কেউ না হইয়াই থাকিতেন। কখন কাহার সঙ্গে এ সব লইয়া একটা কথাও কন নাই, মুখ বুজিয়া শুধু কাজ করিয়া যাইতেন। বাবার কাছেও কোন দিন এ সব কথা বলেন নাই; চুপ করিয়া থাকিতে আসিয়াছিলেন, চুপ করিয়াই গেলেন।

সময় কাহার জন্য বসিয়া থাকে না, সুখে দুঃখে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটিয়া যায়, আমাদেরও কাটিল। আমি বার বছরে পড়িলাম। আমার বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক কথা-কাটাকাটি ও হাঁটাহাটি গোলমালের পর একজন ডাক্তারের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইল।

পাকা দেখার দিন আমার এক সই আসিয়া আমাকে সাজাইয়া দিল, মা একবারও কাছে আসিলেন না। রাঙাপিসী তাহা দেখিয়া, ইচ্ছা করিয়াই মাকে শুনাইয়া একজনকে বলিলেন, "কৈ গো, কনের মা কোথায়? তাঁর যে আজ দেখাই নেই। ও মা, মেয়ের বিয়ে!" আর একজন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ও মা, জান না, সতীন-ঝি চ'লে যাচ্ছে, সেই দুঃখে সে শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছে।' কথা শুনিয়া সবাই হাসিয়া উঠিল। পাকা দেখা হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল।

সেই দিন রাত্রে মা আমাকে ডাকিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন।

কত ভাল কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন। অমন মিষ্টি কথা আর কার মুখে কখন শুনি নাই। কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর কাছে থাকিতে হইল না। কোথা হইতে ঠাকুরমা আসিয়া মাকে খামকা বকিয়া উঠিলেন,—"আর তিনটে দিন ত ও আমাদের কাছে আছে, এইটুকুর জন্যে আর ওকে অমন করা কেন? একরত্তি মেয়ে, তাকে আর ও সব কুমৎলব শেখান কেন? পরের ঘরে গিয়ে বাঁচ্‌বে, তাও প্রাণে সইছে না?" এই কথায় আমি আর সেখানে থাকিলাম না, ঠাকুরমার সঙ্গে চলিয়া আসিলাম।

তার পর যথাসময়ে গায়ে হলুদ হইয়া গেল। সে সময়ও মা আমার কাছে আসিলেন না। কিন্তু দেখ্‌লাম যে, তিনি খিড়কির জানালার ভিতর দিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখিতেছেন।

তার পরদিন আমার বিবাহ। সানাইয়ের মিষ্ট আলাপ, কর্ম্মবাড়ীর সোরগোল, ছেলেমেয়েদের কলকল, পাড়ার লোকের হাঁকডাক, সব মিলাইয়া সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সন্ধ্যার পর যখন আমাকে সাজাইয়া তুলিল, লগ্নের তখন অনেক দেরী। রাঙাপিসী, পাড়ার মেয়েরা আর আর সবাই গহনা দেখিবার জন্য আমাকে ঘেরিয়া বসিলেন। কে কোন্‌টা দিয়াছে, এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা সব দেখাইয়া বলিয়া দিতেদিলেন। হঠাৎ একজন বলিল,—"কনের মা কি দিল গো?" ঠাকুরমা মুখখানা বাঁকাইয়া বলিলেন,—"সে আবার কি দেবে?" রাঙাপিসী বলিলেন, "সত্যিই ত. আহা! আজ যদি ওদের মা বেঁচে থাক্‌ত, মা নেই ব'লে তো—বাছারা আমার বেঁচে আছে, এই ঢের, 'ষাট ষাট' ওরা আমার বেঁচেবর্ত্তে থাকুক, শ্বশুরঘর আলো করুক।" স্ত্রী-আচারের সময় মা আসিলেন, দেখিলাম, কাঁদিয়া তাঁহার চোখ লাল হইয়াছে, তিনি কান্না চাপিতে পারিতেছেন না।

পরদিন সকালে আমি শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, আমাকে দেখিবার জন্য যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। যাইবার সময় মা আসিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাঙাপিসী বলিয়া উঠিলেন, 'শুভ যাত্রার সময় আর চোখের জল ফেলে অমঙ্গল কর কেন?' মা উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় তিনি আমার হাতে একটি ছোট টীনের

বাক্স দিলেন। ঠাকুরমা বারান্দা হইতে তাহা দেখিলেন! তখনই বামা দাসী দৌড়াইয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিল, "দিদিমণি, ও পান খেয়ো না,· ঠাকুরমা মানা করেছেন।" তার পরই আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিলাম যে, মা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার চোখে জল ধরে না, তবু যেন তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরি। বাবা ষ্টেসনে আমার সঙ্গে আসিয়ছিলেন। গাড়ী ছাড়িলে তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে সেই টীনের বাক্স খুলিলাম, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তাহার ভিতর এক ছড়া মুক্তার মালা। মালা ছড়াটা বাবা মাকে কিনিয়া দিয়াছিলেন। সকলের সামনে না দিয়া কেন যে তিনি চুপি চুপি দিলেন, তা তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারিয়াছি।

তার পর অনেক দিন বাপের বাড়ী যাওয়া হইয়া উঠে নাই। বাবা আসিয়া মাঝে মাঝে দেখিয়া যাইতেন।

একদিন সকালে উঠিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে তরকারী কুটিতেছিলাম। উনি সেখানে আসিলেন, তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম—আমি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলাম। উনি মাকে বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া কি বলিলেন, আমার বুকটা যেন কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, কার ত' কিছু হয়নি। মা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "বৌমা, বেয়াই তার করেছেন, তোমার ভায়ের বড্ড বাড়াবাড়ি ব্যাম, তোমায় যেতে হবে।"

সে দিন রাত্রেই ওঁর সঙ্গে আসিলাম। শঙ্করকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাকে যেন চেনা যায় না। বিছানার সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। বিছানার কাছে বসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, তাহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম, 'শঙ্কর!' শঙ্কর একবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার তখনি চোখ বুজিল। রাঙাপিসী কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, 'তুমি ত খুব রক্ষা পেয়েছ, এখন ওই রাক্কুসীর চোখ পড়েছে এর ওপর, কি যে হবে, জানিনে মা—মা কালী করুন, এখন ভাল হয়ে ওঠে, তবে ত'।'

রাক্ষসীটি যে কে, তা আর বুঝিতে বাকি রহিল না। শুনিয়া আমারও যত রাগ পড়িল সেই রাক্ষসীর উপর। মনে হইল, ভাল করিয়া গোটা কতক কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। মার ঘরের দিকে চলিলাম। যাইবার সময় আঁচলটা পায়ে বাধিয়া পড়িয়া গেলাম। ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে নাই, সকল জায়গায় খুঁজিলাম। বাকি রইল ঠাকুরবাড়ী। বাড়ীর ভিতরে পুকুরের সামনে নারিকেল গাছ-ঘেরা মন্দির। সেইখানে খুঁজিতে চলিলাম। মন্দিরের কাছে আসিয়া দেখি, দরজা ভেজান। একবার মনে হইল, রাক্ষুসী আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসে নাই ত? শুনিতে পাইলাম, কি যেন বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না। রাক্ষুসী নিশ্চয়ই আমার ভায়ের মন্দ করিতে আসিয়াছে। কথাগুলো একবার ভাল করিয়া শুনিবার জন্য দরজায় কান পাতিয়া দম বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, মা হাঁটু গাড়িয়া গলায় কাপড় দিয়া, হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন—"মা, আমার খোকাকে ভাল ক'রে দাও মা, আমি বুক চিরে রক্ত দেব।" আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল! এই কি না রাক্ষুসী! আমার কান্না আসিতে লাগিল। এত দিন পরে যে মাকে চিনিতে পারিলাম বলিয়া কি জানি কার উদ্দেশ্যে মাথা সেই দরজার চৌকাঠে আপনি নুইয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া শঙ্করের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিল—"হবে হবে, ভাল হবে" কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—'ভাল ক'রে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব।'

আশ্চর্য্য! তার পর হইতেই শঙ্কর ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। মা তাহাকে দেখিতে একবারও ঘরের মধ্যে আসিতেন না, বাহির হইতে দেখিয়া আবার আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেন।

ক্রমে শঙ্কর সারিয়া উঠিল। ঠাকুরমা আজ এর পূজা, কাল তার পূজা দিতে লাগিলেন, আমি বুঝিলাম যে, এ পূজা সত্যিই কার!

ক্রমে ছ'মাস পরে শঙ্কর একেবারে ভাল হইয়া উঠিল। ঠাকুরমা সে দিন তাহার আরোগ্য উপলক্ষ্যে কাঙ্গালী খাওয়াইতেছিলেন, আমরা তখন খুব ব্যস্ত

ছিলাম। হঠাৎ আমার কানে সেই কথা বাজিয়া উঠিল—"ভাল ক'রে দাও মা, বুক চিরে রক্ত দেব"—তাইত! কি করিয়াছি। এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন? ছুটিয়া মন্দিরে গেলাম—গিয়া দেখিলাম, ছিন্ন লতিকার ন্যায় মা আমার সিংহবাহিনীর পদতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা—পার্শ্বের ছোট একটি বাটীতে ভরা রক্ত!!

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী।

মায়ের সাধ

গোপাল আমার, মায়ের নয়নে
আবার সে রূপ ধর,
কালিন্দীর কাল বিষজল-মাঝে
কালীয় দমন কর।

অরুণ কমল তরুণ তোমার
কোমল চরণ দুটি,—
ধূলায় চলিতে যেন প্রতিপদে
শতদল উঠে ফুটি'।

যেখানে যখন রাখিছ চরণ,
ধরণী পুলকে ভোর,
মুখর নূপুর গুঞ্জে মধুর
বেড়িয়া চরণে তোর।

গোপাল আমার, জননীর এই
আশীষ-বচন ধর,
নৃত্যপর ও কোমল চরণে
মৃত্যু দমন কর।

গহন কাননে গোধন-চারণে
মা হয়ে পাঠাই তোরে,
ওরে নীলমণি, দুখিনী জননী—
কি তার পরাণ করে।

তবু সাধ যায় সে রূপ দেখিতে,
বাঁশী করে হাসি মুখে
কণ্টক বন দলিয়া চলিছ
ক্রীড়া-কৌতুক সুখে।

'রাজা হওয়া খেলা' ছেড়ে রঘুমণি
খেলায় কাননে যায়,
কি খেলায় ভোর, যাদুমণি মোর,
খেলার কে পার পায়!

সিন্ধু-মথনে গরল উঠিল,
বিশ্ব বিনাশ পায়,
খেলা ছলে, ভোলা সাজি বাপধন,
কণ্ঠে ধরিলি তায়।

গোপাল আমার, আর বার সেই
অপরূপ রূপ ধর,
ক্রীড়াকৌতুকে বনদাহকারী
দাবানল পান কর।

মল্ল চাণূর মহাবলী, ক্রূর,
গোপাল বালক অতি,
খেলা ছলে যায় জিনিতে তাহায়,
কি জানি কি তার মতি।

মত্ত করী সে কুবলয়াপীড়,
কোন ভয় নাই তায়,—
আমার গোপাল রণ-অঙ্গনে
নেচে যায়, নেচে যায়!

শিরদানে বীর যশোমন্দির
গগন-পরশী গড়ে'
করি প্রাণপণ, করে আরোহণ,
কীর্ত্তি-শিখর 'পরে।

পুণ্যেরে কেহ পণ্যের সম
ক্রয় করে ধন পণে।
মোক্ষ-লাভের আশায়, তাপস
গৃহ ছাড়ি যায় বনে;

অর্জ্জুন ব করে মহারণ
যশে দশদিক্ ভরে;—
আপন ভোলা যে গোপাল আমার,
রথের রজ্জু ধরে।

ক্ষ্যাপা নাহি জানে মান অপমান
যশে কিবা আসে যায়,—
নিজ আনন্দে নিজে মাতোয়ারা
নেচে যায়, নেচে যায়!

দুখিনীর ধন ওরে নীলমণি,
পরাণ-পরাণী মোর,
সদা মনে চাই, আমি ম'রে যাই
নিছনি লইয়া তোর!
শঙ্কা হরণে স্মরণ করিয়া
রক্ষা বাঁধিতে চাই,
গোপাল বয়ান হেরিলে শঙ্কা
সকলি বিসরি যাই।
পূতনার বুকে খেলা করে সুখে
ফণীর মাথায় নাচে,
শঙ্কা,—শঙ্কা পাইয়া পলায়
আসিতে তাহার কাছে।
সংসার-বনে, জ্বলে দাবানল
বনবাসী ত্রাণ তরে,—
আমার গোপাল খেলাছলে সেই
দাবানল পান করে।
গোপাল আমার মায়ের নয়নে
আবার সে রূপ ধর,
নৃত্যপর ও কোমল চরণে
মৃত্যু দমন কর।

শ্রীসরলাবালা দাসী।

কমলের দুঃখ

(ইন্দু—শৈল)

ঠাকুরঝি !

তোমার যে ভাই কি আক্কেল, তা আমি বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লুম না। মায়া যে আমার এখানে রাগ ক'রে এসে রইল, সেটা কি ভাল দেখাচ্ছে। আমি অতসত বুঝি না, যখন হয়ে গেল—তখন হয়ে গেল—তাই নিয়ে তাল পাকিয়ে একটা তুল ক'রে লাভ? মায়া আমার কাছে এসে রয়েছে, তাতে কিসের ক্ষতি, বোনের বাড়ী কি বোন এসে থাকে না —কিন্তু এ রকম ক'রে এসে থাকায় সকলেরই মনে কষ্ট আর নানান দিকেই গোল। সংসারটা নয়-ছয় হয়ে যাবে, এটা কি তোমার বুদ্ধিতে এল না? আর তারই বা কি বুদ্ধি—পাঠালেন কিনা সরকারকে। কেন, নিজে একবার আসতে পার্‌লেন না? ঘরের কথা পথে ঘাটে জানালে বুঝি খুব বাহাদুরী হয়? এমন অনাছিষ্টি ত দেখিনি···যা রয় সয়, তাই ভাল। আমার বাপু গা জ্বালা করে—অসইরন সইতে নারি। এ যেন সব বিলিতি কাণ্ড। পোড়াকপাল, লেখা-পড়া শিখে এই বুঝি শেষ বিদ্যে হ'ল, পৃথিবীতে জন্মে একটুখানি ছাড়্‌তে শিখ্‌লে না—কেবল আপনার গোঁ নিয়েই আছে—গোঁ ভরেই চলেছে। চল বাপু,—তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু এ কি, স্বামী—দেবতা—তা ত চুলোয় গেল—মা—মা—মা—আমি অবাক্। সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি, সে দিন আমার এমন রাগ হয়েছিল, বল্লুম—নিতে পাঠিয়েছে, যা, তা শুন্‌লে না—বল্‌লে, আমি যাব না। আমার তখন ভয়ানক রাগ হ'ল, আমি একখানা দুধ জ্বাল দেবার পোড়া কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলাম, শেষ তার মুখের পানে চেয়ে, তার চোখের কালি পড়া দেখে, আমার হাত কেঁপে কাঠখানাও পড়ে গেল, তাকে বুকে ক'রে জড়িয়ে নিয়ে কেঁদে অস্থির। সেও কাঁদে, আমিও কাঁদি। কি করি ঠাকুরঝি, আমার বড় জ্বালাই হয়েছে। মার পেটের বোন নেই, ওই একটা বোন,—তার দুঃখ আর সইতে পারিনি ভাই! চেহারা হয়েছে যেন একখানা শাদা কাগজের মত, অমন চোখ, যেন এই কদিনে কি হয়েছে। কি যে করি, বল্‌তে ত পারিনে যে তুই যা—বল্‌তে গেলেই—বুকের ভেতর কেমন ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠ্‌তে ইচ্ছে হয়। সে দিন যাবার কথা তুল্‌লাম—কেঁদে ভাসিয়ে দিলে; বলে কি—"দিদি! এই ঘরে সে থাক্‌ত—

আমায় থাকতে দাও—আমায় থাকতে দাও।" আমার বুকটা যেন কি রকম ক'রে উঠ্‌ল। কি ভুলই আমরা করেছি—এখন দেখ্‌ছি, আমরাই এর বিহিত কর্‌তে গোড়ায় পার্‌তাম। এখন আর উপায় নেই। কত বোঝালুম, 'তুই বড় ঘরের বউ, তুই এ রকম হ'লে সমাজে তোর স্বামীর মাথা হেঁট হবে, লোকে কত আকথা-কুকথা কইবে—বাড়ী না গেলে কি হয়—ছিঃ, ছেলেমানষী করে না।' আমার ছুটো পা জড়িয়ে বল্‌লে—'দিদি! ও কথা আর আমায় ব'ল না, আমি কি ব'লে সেখানে যাব, আমার সেখানে নরকের জ্বালা সইতে হয়। তুমি যদি না থাকতে দাও, তবে আকাশের তলাই আমার ঘর হবে, আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না।'—আমি তার মুখ হাত দিয়ে চাপা দিলুম,—কেবল কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—কি করি ভাই—এমন ক'রে কাঁদ্‌লে কি মানুষ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে। মিহিরটা কোথায় বারাণ্ডায় খেলা কর্‌ছিল, এসে আমাদের দুজনের মুখের দিকে খানিকটা তাকিয়ে বলে কি, 'মা, তুই মাসীকে মেরেছিস্, মা, তুই দুষ্টু' ব'লে আমার ত চুলগুলো টেনে ছিঁড়্‌লে, মায়াকে না গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'মাসি, তুই কাঁদ্‌ছিস্—আমি মাকে মেরেছি।' আঃ, ছুঁড়ী ত একেই কাঁদ্‌ছিল, ছেলেটাকে বুকে ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ল—"ওরে আমার মাণিক, ওরে আমার সোনা—কেউ যে আমায় দেখ্‌তে পারে না ধন।" আমি পাথরের মত হয়ে: গেলাম। বল ত ভাই, কি করি।

তুমি ভাই নগেনকে বুঝিয়ে বল, নিজে এসে নিয়ে যাক—যদি যায়, তবেই উপায়, নইলে এই হ'ল—সবই নষ্ট হ'ল। আর ফেরান যাবে না।

আমার এক একবার গা জ্বালা করে, আবার বুঝি—মেয়েমানুষের মন, কি রকম—একটা কুটি হারালে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, আর এই প্রাণ নিয়ে কথা—এ মুখে যতই বলি, তাচ্ছিল্য ক'রে কি উড়োন যায়! কি করব। অদৃষ্ট। বাড়ীর কর্ত্তাকে ত জান, নির্ব্বিকার—কোন কথাই নেই, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে "মনের ওপর ত জোর চলে না—কি আর হবে—আছে থাক্।" অমর এসেছিল কমলের চিঠির কথা বল্‌তে, জানই ত সে কমলকে দেবতার মত ভক্তি করে, আর সত্যি কথা বল্‌তে কি ঠাকুরঝি, পুরুষমানুষ বটে, আকাশের মত প্রাণ—সর্ব্বত্যাগী হয়ে গেল। চিঠিখানা পড়ে মনে হ'ল—সত্যিই মায়ার পোড়া কপাল। নগেন ত সেই বিদ্যেধরীর চরণেই পড়ে'। কার প্রাণে না, কোন্ মেয়ের না এমন লাগে বল।

তোমার ওপর রাগ করি এই জন্যে যে, তুমি বড়ঘরের গিন্নী, এত দেখ্‌তে পার আর সংসার আঁট্‌তে পার না। লোক বজায় ত রাখ্‌তে হবে। লোক বজায়েও অনেক বাঁধন থাকে—আমি ও সব একেলে কথা ভাল বুঝি নি—বুকের ভিতর আগুন যে রাখে, সে রাখুক,—পাঁজরা পুড়ে খাক্ হয়ে যাক্,—তাই ব'লে মেয়েমানুষের মুখ ফুটে

সে জ্বালা বেরুবে, এ ঠাকুরঝি আমি বুঝ্‌তেও পারি না আর আমার ভালও লাগে না। এ সব বিলিতি ঢং—কিছু মান্‌তে চায় না—আমার দিদিমা বল্‌ত—

'মনে মনে মজে যে
ঘরের কোণে মরে সে'

তা আমার বাপু ও ঘরের কোণে মরাই ভাল—সবাইকে ডেকে হেঁকে জানিয়ে মর্‌বার দরকার নেই—আর তাতে যে কি সুখ, তা ত বুঝি নি, যে আমার প্রাণের লুকোনো জিনিষ, সে দুঃখ ত পুজোর মত - সে পুজো আবার লোকের কাছে গেয়ে বেড়াব কি– তার আবার কবিতাই কি, তার আবার গানই বা কি? হিঁদুর মেয়ে দুঃখকেও দেবতা মনে করে—যা প্রাণের, তাকে কি অমন বাইরে আনা যায়—তা হ'লে আর প্রাণের থাকে কই? আমি ও সব বেহায়াপনা দেখ্‌তে পারি না—সংসার দেবতা, দেবতার সঙ্গে বেহায়াপনা কি?

যাক্, তুমি যে এমন সংসারটি পেতে বসেছিলে, সে যে একেবারে যেতে বস্‌ল—তার কি কর্‌ছ। এমন সোনার সংসার ছারেখারে গেল—সব থাক্‌তে।

আমার কাছে যখন এসেছে, তখন আমি তাকে ফেল্‌তে পার্‌ব না। মানুষের অত যাতনা আমি দেখ্‌তে পারি নে—আমার কাছে থাক্‌লে যদি তার মনটা ভাল থাকে—থাক তবে আমারই কাছে, আমি মুখে তাকে বোঝাই, আড়ালে কাঁদি—আহা, তার যদি দশা দেখ, ধ'রে চুল না বেঁধে দিলে বাঁধে না—বেঁধে দিলে খুলে ফেলে—বলে আমার আবার সাজ-সজ্জার কি আছে—গায়ের গহনাগুলো খুলে ফেলেছে, আমি এ সব আর দেখ্‌তে পারি নি—গঙ্গার ঘাটে গেরোণের রাত্তিরে নাইতে গিয়ে শ্মশানে সেই মড়া দেখেছিলে মনে আছে, ছুঁড়ীর মুখখানা তেমনি সাদা হয়ে গেছে,—হয় ত এই রকম ভেবে ভেবে ম'রে যাবে। জোর ক'রে না খাওয়ালে খায় না। নগেনের কথা তুল্‌লে, বলে, "ও নাম আমায় শুনিয়ো না। তুমি তাকে মানুষ বল দিদি! অদৃষ্টের ফেরে যা হয়েছিল, তাও আমি এক রকম সয়ে ঠিক হয়ে যেতাম, আমি কি চেষ্টা করিনি, আমি অনেক যুঝেছি– যুঝে যুঝে অন্তর ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে, তাতেও আমি তাকে স্বামী ব'লে– দেবতা ব'লে পুজো কর্‌ব মনে কর্‌তে পারি নি– কেন পারিনি, যে দেবতা হয়, তাকে গড়ে পুজো কর্‌তে হয় না, আমার সোনার মন্দিরে যে শ্মশানের হাড় নিয়ে আস্‌তে পারে, তাকে কি ক'রে ভাল মনে দেবতা জ্ঞান কর্‌ব বল, দেবতা ত দূরে থাক, মানুষ পর্য্যন্ত মনে কর্‌তে পারিনি। কি সুখে আমি আর সেখানে ফির্‌ব—ঘর আমার ভেঙেছে, আমার যদি ঘর হ'ত, তবে আমার সে মন্দিরে কি কুকুরে এঁটো পাত কুকুরে মুখে ক'রে আন্‌ত। না না—আর আমার ঘর নেই···সব গেছে, যখন সে ফেলে দিয়ে চলে গেছে—তখন আবার কার

জন্যে সাজ, কার জন্যে ঘর, কার জন্যে হাসি, কার জন্যে ভাবা, আমার সব ফুরিয়েছে দিদি, আমার সব ফুরিয়েছে—এখন বাকী কেবল মৃত্যু—হলেই নিশ্চিন্ত কি না বল্‌তে পারি না—তবে গেলে বুঝি হাড় কখানা জুড়োয়। আর পারিনে দিদি! আর আমি কোথাও যাব না।"...ঠাকুরঝি! আমাদের তখন ছেলে বেলায় বিয়ে হয়েছিল—অতসত বুঝি নি—শিবপুজো করি; স্বামীকে শিবের মত দেখি, তা নয়, লেখা-পড়া শিখে এই সব হ'ল আর কি? কে জানে—বুঝি পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল।

সে দিন উনি বল্লেন, কমল নাকি মকদ্দমার যত টাকা নগেনকে ফিরিয়ে দিয়েছে—নগেনের আরো সুবিধেই হ'ল।

তুমি আমার প্রণাম নিয়ো, মিহির ভাল আছে, দিনরাত মাসীর কাছে থাকে। দেখ, যদি পার ত নগেনকে বোঝাবার ব্যবস্থা কর। ইতি—

তোমার স্নেহের

'সু'বউ!

(মায়া—নগেন)

ভেবেছিলাম, তোমায় কোন উত্তরই দেব না। কিন্তু যতবার তোমার চিঠির দিকে তাকালাম, চোখে যেন আগুনের জ্বালা জ্বলে উঠ্‌ল। তাই লিখ্‌লাম। আমায় চিঠি লেখ্‌বার তোমার অধিকার? তোমার কথায় যখন আমার অধিকার নেই, তখন আমার কথায় কি তোমার অধিকার? হঠাৎ আবার তোমার সেই উথ্‌লে উঠ্‌ল, "আমার ঘর আমার সংসার"—হা হা ঠিক, আমারই ত ঘর, সংসার, তাই পথের কুকুরে—ঘেয়ো কুকুরের এঁটো পাত আমার ঘরে এনেছিল। আমার প্রাণটা যদি ছিঁড়ে শকুনিতে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খায়—তাতে যখন তোমার হাসি আসে, তখন আমি ত তা হ'লে হাসির রোল তুল্‌ব। তুমি যেতে বলেছ, যাব, সে তোমার কথায় নয়—যাব কোথায় জান, যেখানে সাধ ক'রে কেউ যায় না। একটা নিরীহ কপোত, তার যৌবনের নূতন সুর নিয়ে, বুকের ভিতরে ভরে, ঘন পাতার আড়ালে তার প্রাণের রাগিণীতে কূজন করছিল, তুমি বাজের মত তার উপর তোমার ওই ক্রূর নখ বিদ্ধ করলে, একটা কালসাপের মত তীব্র বিষাক্ত চেরা জিব বার ক'রে তাকে দংশন করলে—মনে কর আমি ম'রে গেছি—আমি আর যাব না। কোথা যাব নরকের নীল আগুনে পুড়ে মরতে—যদি নরকেও যেতে হয়, তবে সে আমার আছে—যার পায়ের ছায়ায় পদ্ম ফুটতে ফুটতে যায়—সেই ছায়ায় লুটোতে লুটোতে যাব, সে যেখান দিয়ে যায়—শিউলি ঝরে ঝরে পড়ে—মল্লিকা-পাঁতি থরে বিথরে হেসে

লুটিয়ে ওঠে—তোমার নরককে তোমার শ্মশানে তুমি তোমার ভূত-পেত্নী নিয়ে থাক, আমি সেখানে আর যাব না।...কে তুমি? তুমি ত আমার কেউ নও, আমিও তোমার কেউ নই। ভুল করেছিলে—পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দেখা—শুধ্‌রে ফেল, সে কথা ভুলে যাও। জান ত শুভদৃষ্টির সময় মুখের পানে চাইনি। কিসের কথা লিখেছ, সে আমার ফুলশয্যা নয়, আমার সে কাঁটার শেজ, তার চেয়ে আমার তার চলে-যাওয়া-পথের ধূলি-শয্যা গৌরবের, সুখের, আনন্দের, সোহাগের।

অনেক দিন ধ'রে অসহ্য যাতনায় জীবন কাট্‌ছে—মানুষের যেমন সীমা আছে—তার সহ্যেরও সীমা আছে, আমি এ সীমাহীন অসহ্য অনন্ত আঁধারে এ যাতনা আর সইতে পারি না। ইচ্ছা করে, কোন একটা নিবিড় অন্ধকারের ভেতর চুপ ক'রে ব'সে থাকি—যেখানে বাতাসও ছুঁহ করে না। জান কি আমার প্রাণের বেদনা—তুমি স্বামীই হয়েছ লোকচক্ষে আমার চোখে ত নয়। তোমার কাছ থেকে দূরে চ'লে এসেছি—মনে হচ্ছে—যদি একটা আঁধার গ্রহ সৃষ্টি করতে পারতাম, এই ঘৃণিত পৃথিবীর বাইরে গিয়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা হিম কন্‌কনে, দাঁতে দাঁত লেগে যায় যেখানে, সেইখানে নিজের এই নিশ্বাসটাকে ঘুরিয়ে ফেলে দিতাম, আর সেই নিবিড় ঘোর অন্ধকার জমাট মেঘের মত আমার বুকের ওপর চেপে ধরত—তবে যেন এ দারুণ ব্যথা একটু বেরিয়ে যেত। হায়! সুখের-আতিশয্যে-ভরা মানুষ, তুমি কি বুঝবে এ অন্তরের ব্যথা। তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেই সুখের সন্ধানেই যাও, আর আমার কথায় থেক না। আর আমায় চিঠি লিখ না—আর আমায় মরমের ফাঁদে বাঁধিয়ো না। স্বামি-স্ত্রীর কোন সম্পর্ক তোমার সঙ্গে রাখি নি, হাতের নোয়াগাছটা পর্য্যন্ত খুলে ফেলেছি জেন, কল্যাণ অকল্যাণও ভাবনার অতীত করেছি। আর কেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। প্রিয়তমে লিখ্‌তে—তোমার হাত কাঁপেনি, অবশ হয়নি।

মানুষের পাখী পুষ্‌লে মায়া হয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে দুটো কথা দুদিন কইলে তার জন্য যে মায়া হয়, আমার সেটুকুও নেই। তোমার ঘর শূন্য কবে, কবে শিখ্‌লে—কেন সায়েঙের আওয়াজে আর তোমার ভূত প্রেত পেত্নীর গানে ঘর ভরে থাক্‌বে এখন, যন্ত্রের গানই তোমার ভাল, প্রাণের গানে তোমার কি দরকার। যাক, তুমি তোমার পথে চ'লে যাও, আমি আমার পথে চ'লে যাই! ইতি

মায়া।

(নগেন—মায়া)

বেশ—ভাল, ভবিষ্যতে তোমায় আমায় আর কোন সম্পর্ক রইল না, ভালই হ'ল। এত দিন আগে এটা বুঝিনি কেন, তাই ভাব্‌ছিলাম—তাই মনে ছায়া পড়্‌ত। তোমার

রূপ—তোমার মধুর স্বর আমায় প্রথমে চারিদিক্ হ'তে আকুল করেছিল—এখন তোমার চেয়ে আরও রূপ, গান, কথা আমি পেয়েছি, যাক, গোল তা হ'লে তুমি একরকম মিটিয়ে নিলে। ভাল, কিন্তু রইল বাকী-কিছু বাকী রইল—ভেবেছ, তুমি যার নেই, তার সুখ নেই—দিন ফিরতে পারে, হয় ত তোমার হৃৎপিণ্ডের শোণিতে তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে। আমি যাকে পেয়েছি, বেশ পেয়েছি।

কি অশুভক্ষণে এই বাড়ীতে তুমি পদার্পণ করেছিলে যে, সব নষ্ট হয়ে গেল। তোমার জন্যে আমার অত গুণের ভাই পর হ'ল—তোমার জন্যে আমি এই জেনেশুনে নিজের উচ্ছন্নের পথ খোলসা ক'রে নিলাম—তোমার জন্যে যে বিষ—মানুষে ইচ্ছা ক'রে খায় না, আমি অবাধে দিবারাত্র তাতে ডুবে রয়েছি। যাক্, সব চুলোয় যাক্, কে চায় তোমায়, কে চায় সংসার—সুরা—সুরা-সুরা আর আমার হেনা—দুনিয়া অধঃপাতে যাক, আমি মস্‌গুল হয়ে থাক্‌ব।—তবু আবার বলি, যদি এ নেশার ঘোর আমার কাটে, তবে তোমার—তোমার—তোমার অগ্নির জ্বালা সৃষ্টি কর্‌তে পারি কি না দেখ্‌ব, দেখ্‌ব, দেখ্‌ব। না—তাও বুঝি আমার নেশার খেয়াল। জীবনটাই খেয়াল। ইতি

(কমল—অমর)

সুচরিতেষু,

বাসনামত্ত প্রাণ এমনি করেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে যায়। এই জ্বালাই তার পরিণাম। বাইরে যদি শীতল বায়ু বয়, সেখানটাও অগ্নিতে তপ্ত হয়ে ওঠে—এ জ্বালা নিভে না, আরো বাড়ে। ইন্দুদিদি ঠিকই বলেছে—সত্যই অমর, ও ভালবাসাও কামনা। তাই এখন বুঝ্‌ছি ভাই, বাসনার অন্ত নেই—সহজে এ নিব্‌তে চায় না। মন বলে—তুমি সরল হও, মানুষের ভিতর নিজেকে বিলিয়ে দাও—আবার সেই জগতের সম্পর্কে এস, অমনি বাসনা জাগ্‌ল। বল্‌বে, এমন সুন্দর জগৎ—একে কি ফেলা যায়, নারী এত মধুর, সে মধুর অধরের সুধা ফেলে দেব, ফুল এত কোমল, সে সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বে না। এমনি ক'রে চলেছে, বাসনা ফুরোয় না, কামনাও মেটে না। মানুষের জীবন এ প্রহেলিকা, না নিদ্রা, না জাগরণ, না স্বপ্ন, না ঘুমঘোর! ভালবাসা ভালবাসা ক'রে যে সবাই মরে, এও সেই কামনা। আমি বুঝেও মনকে বাঁধ্‌তে পারি না। না বুঝি বুঝ্‌তেও পারি না—তাই অতৃপ্তি তার বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা নিয়ে জেগে ওঠে। তাই আমার আমার করি। অথচ এক কণিকা ধূলোকে—আপনার কর্‌বার শক্তি নেই—মানুষকে আমার কর্‌তে যাই। তার উপর অধিকার আরোপ কর্‌তে যাই।

এমনি মনের ভ্রম। মায়াকে যে আমি ভালবাসি, সেও আমার কামনা—কে জানে, মন কামনাশূন্য হয় কি না। যখন তার কথা মনে হয়, চন্দ্রোদয়ে যেমন সাগর উথ্‌লে ওঠে, আমার বুকের মধ্যে ঠিক তেমনি হয়। দেখ কি ভুল, পরস্ত্রীর রূপকল্পনা কর্‌ছি—ধন্য কামনা, ধন্য ইন্দ্রিয়ের অশান্ত ভোগতৃষ্ণা। কিন্তু সাগরের যেমন আনন্দ হয়, আমার ত তেমনি আনন্দ হয়, আনন্দ হতেই আমিও উন্মাদের মত তার রূপে ডুবে যাই—দেখি, উপরে ওই অনন্ত তারকারাশি সেই মায়ার কথাই কইছে, আমি দেখ্‌ছি, ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলে মায়ার বাহুলতিকার আভাস; ওই ধূসর নীলাভ আকাশ মায়ার পট্টবস্ত্র; আমার মায়া যেন জগতের শ্রেষ্ঠ বিস্ময়ে মিলায়ে রয়েছে—অমর! এও কি আমার বাসনা—এও কি কামনা, বুঝ্‌তে পারি না, বুদ্ধি তর্ক ক'রে এ ভাবকে ধর্‌তে পারে না। কিন্তু ভাই, যদি এ আমার কামনা হয়—হোক্ কামনা, যুগযুগান্ত যেন দেবীর এই ধ্যানে আমি ডুবে থাকি, মিছে এ সংসারের কলরব। ওই চাঁদের পানে তাকাই—ভাবি, এও রূপ 'ও'ও রূপ, তবে তফাৎ—কিছুই নয়;—এও আনন্দ 'ও'ও আনন্দ—আনন্দ সবই এক। আনন্দে ত অভাব থাকে না—আমিয়ো ত মায়ার অভাব মনে করি না। ভালবাসি, ভালবাসি, কেন ভালবাসি, তা বল্‌তে পারিনে। বিচারে আমি অপটু! ইন্দু-দিদিকে বল, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ এ সংসারে অমঙ্গল হবে না। তবে যে কেন হ'ল, সে বল্‌তে পারিনি—প্রকৃতি যে একখানা যবনিকা এঁকে রেখে দিয়েছে, তার আড়ালে কই যেতে পারিনি—তা হ'লে সব্বাইকে ব'লে দিতাম, ওরে ভাই, এই আনন্দ! তা হ'লে সকলের দুঃখ—সব জ্বালা—অভাব অশান্তির ঝঞ্ঝনা—শীতল ক'রে দিতে পার্‌তাম। দেখ, অতীতকে আমি পুরাণো গৃহদেবতার মত শ্রদ্ধা করি—পূজা করি—গৃহদেবতা যেমন সংসারের মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে ব্যস্ত, অতীত তেমনি ভবিষ্যতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে ব্যস্ত—আমার অতীত আমার ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত কর্‌ছে—মায়ার জ্বলন্ত প্রেমের মধ্য দিয়ে আমি নিজের স্বরূপ জান্‌তে পার্‌ছি—মানুষ একলা জগতে থাকে, যখন দু-জনের ভাবাবেশ হয়,তখন সে নিজের শূন্যতা, একলা বুঝতে পারে; মানুষ যখন নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের পূজায় তৃপ্ত হয়, তখন তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশের সূচনা হয়। আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার মায়া নারীপূজার প্রথম আদর্শ, মায়ার পূজায় আমার নারীর মহত্ত্ব জেগেছে। অন্তরে বাহিরে আমি কি দেখ্‌ছি অমর, এ এক অপূর্ব্ব পুলক, সে জ্যোতি আমার ভবিষ্যতের জন্যে গড়ে তুলছে, সে উদ্দাম বাসনার একান্ত কামনা আজ আমার এক অবরণ-বরণ-সুন্দর আলোকে আকাশ বাতাস ভরে দিয়েছে। আমি দেখ্‌ছি, নারী কত উচ্চে, বিশ্বের বাসনার ফুটন্ত পদ্ম নারী কার নিশ্বাসের উপর দুল্‌ছে, লুব্ধ মুগ্ধ ভ্রমর সেখানে শুধু মুখর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে, সেই

রূপের জ্যোতিতে অনিমেষনয়নে চেয়ে রয়েছে। বাতাসে পদ্ম দুল্‌ছে, বারিতে একটু উছল শব্দের ঝঙ্কার বেজে উঠেছে, সেই লহরেই কামনার তরঙ্গ—নারী তার মূলে, নারীর আশে পাশে কামনা ও বাসনা, কিন্তু সে পদ্মের মৃণাল অতল জলে - সেখানে সব স্থির, কামনাশূন্য, পরিপূর্ণ, উচ্ছল, স্থির, শান্ত, নিবিড়। আমি হয় ত ঠিক তোমায় সব বোঝাতে পার্‌ছি না, আমি নিজের ভাবে নিজে ডুবে আছি।

ওই যা, ভারি মেঘ ক'রে উঠ্‌ল, এমন শান্ত প্রকৃতি ছিল, অকস্মাৎ কি ভীষণ হয়ে উঠ্‌ল—দিক্‌প্রান্ত হ'তে দিক্‌প্রান্ত পর্য্যন্ত মিশায়ে গেল, নক্ষত্রখচিত তারকার মালা কোথায় মিলায়ে গেল। সর্পিণীর জ্বলন্ত নিশ্বাসের মত এক একবার বিজলীর ঝলা ঝলক দিচ্ছে—তার পরই নিবিড় ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, তার উপর মূষলধারে বৃষ্টি আর মেঘের গর্জ্জন। এমন সৌন্দর্য্য, এমন সুন্দর কোন্ যাদুকরের হাতের যষ্টিতে সব বদ্‌লে,—ও কি, কি ভয়ানক আলো—কি ভয়ানক কড় কড় শব্দ—বুঝি বাজ পড়্‌ল···

অমর! তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে সব ফেলে উঠে গিছলাম দেখ্‌তে, কি দেখ্‌লাম জান—হায়! কি রহস্যেই এই সংসারটা ডুবে রয়েছে।—আমাদের এই বাঙলার সামনেই বাজটা পড়েছে—বাইরে গিয়ে দেখি, জবা কাঁদ্‌ছে—আমি ভাব্‌লাম, কি হ'ল—দেখ্‌লাম, একটা মরা পাখী কোলে ক'রে মেয়েটা কাঁদ্‌ছে, পাখীটা এই আঁবগাছে থাক্‌ত, এই গাছে তার বাসা ছিল, ভারি চমৎকার ডাক দেয় ও শিস দেয়। আমি এসে অবধি দেখ্‌ছি, একজোড়া এই-খানে বাস কর্‌ত। বাজে পাখীর মৃত্যু হয়েছে, মেয়েটা সেই মরা পাখীর জন্যে কেঁদে আকুল—আর একটা এই ঝড়বৃষ্টিতে উড়ে উড়ে ডাক্‌ছে—সেই মরা পাখীর মাথার উপর ঘিরে ঘিরে কাঁদ্‌ছে। কি করুণ সুর! হায় অমর! ওই সমস্ত ঝড় থেমে গেল, মেঘও প্রায় কেটে গেল, কেবল কি ওই নিরীহ পাখীর প্রাণটুকু নেবার জন্যে প্রকৃতির এত বড় আয়োজন; বিধাতার দারুণ রুদ্র দণ্ড বজ্রের রূপে এত তেজের সঙ্গে আলোড়ন কর্‌লে কি এ ছোট পাখীটাকে যাতনা দেবার জন্যে—কে জানে মৃত্যু কি, কিন্তু মনে হয়, যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ দয়াময় পরাৎপরই হন, তবে এই সামান্য পাখীটাকেও কি ঝড় থেকে বাঁচাতে—এই বজ্ররূপী কালানলে না পুড়িয়ে বাঁচাতে পার্‌লেন না? এই ছোট মেয়ে এর জন্যে কাঁদ্‌ছে—কত জোরে জোরে এর ঠোঁটের মধ্য দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাতাস দিয়ে জীবন আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, আর বল্‌ছে, একে কি বাঁচান যায় না—আর তিনি দয়াময়—তাঁর কি একবারও তা মনে হয় না? কে জানে এর মীমাংসা কে কর্‌বে। যে গড়ন গড়ে, সেই ভাঙ্‌তে পারে, যে এ গড়েছে, সেই এ ভেঙেছে—যার আইন, তারই আইনের ফাঁকি চলে।

মেয়েটা তিন দিন খায় নি, কত বোঝাই, তার বাপ কত বলে, তবে খায়—নইলে তিন দিন ধ'রে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগ্‌ল—সেই গাছটার তলায় মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল —আর আমায় এসে বলে "ওই গোঁড়েরা বল্‌ছিল, দেবতায় নিয়ে গেছে, আচ্ছা, সে দেবতাকে ব'লে এর প্রাণ ফিরে পাওয়া যায় না?" আমি অবাক্ হয়ে রইলুম। অমর! যার পশু-পাখীর উপর এত দয়া, তার প্রাণ কি? আমরা চেনা মানুষের জন্যেই দুদিন একটু ভাবি; এই পর্য্যন্ত। সে দিন সকালে আমায় ছলছল আঁখি—কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌ছে "দেখ, ঘাসগুলো পাতাগুলো—এই দেখ ফুলগুলো সব কেঁদেছে, কেন কেঁদেছে—সেই পাখীটার জন্যে না?" ঘাসের উপর সারা নিশার শিশির পড়েছিল, মুক্তোর মত টলটল কর্‌ছিল। আমি বল্লাম, না শিশির পড়েছে। ও বল্‌লে, "না, দূর, ওরা রোজ রাত্তিরে কাঁদে, অন্ধকারে ওদের থাক্‌তে হয় ব'লে। ওদের ঘরে ত কেউ আলো জেলে দেয় না, তাই না? গাছের সঙ্গে, লতার সঙ্গে, পাতার সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, ঘাসের সঙ্গে, মাটীর সঙ্গে এ যেন এক জীবন্ত সম্পর্ক পাতিয়েছে। এ তাদের সঙ্গে কথা কয়। সে দিন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, মাঠের শেষে সূর্য্যি ঢলে পড়েছে, বকের শ্রেণী একছড়া সোনার মালার মত পড়ন্ত রোদে কোথায় উড়ে চলেছে, কাল কাল বাদুড়গুলো সারাদিনের পর ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে জলে প'ড়ে আর উঠে যাচ্ছে—আমি নদীর ধারে একটা মোড়া পেতে বসেছিলাম—চারিদিকে কুলায় ফিরে আস্‌বার কলরবে পাখীরা বাগানটা ঝঙ্কারে আকুল ক'রে তুল্‌ছিল, দূরে ঘেসেড়ানীরা ঘাসের বোঝা মাথায় ক'রে সারি দিয়ে গান গাইতে গাইতে নদী পেরিয়ে আস্‌ছিল—তাদের সেই ঘাসের বোঝার মাথায় মাথায় পড়ন্ত রোদের ঢলে-পড়া রশ্মি পড়েছে, একটা নারকল-গাছের পাতার উপরে একযোড়া গাঙ-শালিক কত রকম ক'রে আপনাদের কথা কইছিল, ক্রমশঃ যেন ঘোর ক'রে সন্ধ্যা নেমে এল, আমি অনন্যমনে তাই দেখ্‌ছিলাম, হঠাৎ পিছনে কার গলার আওয়াজ যেন আমায় চমকিত ক'রে তুল্‌লে—আমি যেখানটায় ছিলাম, সেখানে একটা কামিনীগাছের ঝোপ আমায় ছেয়ে ঢেকে রেখেছিল, দেখি, জবা একটা গোলাপের গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আপন মনে বক্‌ছে—গাছে কতকগুলো কুঁড়ি আধ-ফুটন্ত হয়েছে,—তারা হাওয়ায় দুল্‌ছে, একটা একটু বড় হয়েছে—সেইটা যত হাওয়ায় দোলে—জবা তাকে বল্‌ছে,"হ্যাঁ ভাই, তুই কাল ফুট্‌বিনি, তবে আমি কি ক'রে কাল তোড়া গেঁথে দেব?"—ফুলটা যত হাওয়ায় দোলে, ও তত বলে—"না ভাই, কাল তুই ফুট্‌বি—কেন, ওই ত স্থলপদ্ম বল্‌লে—আমি ফুট্‌ব, না হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি"—ফুলটা হাওয়া লাগে আর দোলে—ও বল্‌ছে "হ্যাঁরে, তোদের যখন তুলি, তখন লাগে, না? তবে আর তুল্‌ব না।" সে তখনও দুল্‌ছে "তবে কাল ফুট্‌বি—লাগে না?"—হাওয়াটা যখন একটু থাম্‌ল, গোলাপও একটু দুলে স্থির হ'ল—জবা ভাব্‌লে, ফুল বল্‌লে "আচ্ছা,

আমি ফুটব।" আমি অবাক্ হয়ে সেই প্রকৃতির মেয়েকে প্রকৃতির ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা কর্‌তে দেখ্‌লাম—হঠাৎ আমার উপর চোখ পড়ায়—বোধ হয়, স্বাভাবিক লজ্জা হ'ল—ছুটে পালিয়ে গেল—যেমন বনের হরিণী উন্মাদ দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কাল চোখের বড় বড় কাল কোমল পাতার মধ্যে দিয়ে একবার তাকিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ধায়। আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম, এক এক ক'রে আকাশে তারা ফুটতে লাগ্‌ল, একটা পেঁচা বিকট চীৎকার ক'রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, আমার চমক ভেঙে গেল—ধীরে ধীরে বাঙলার ঘরে চ'লে গেলাম। তার পর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে নাই, যখন তন্দ্রা-জড়ান ঘুমের ঘোর ভাঙা ভাঙা হয়েছে, তখন দেখি, বাইরে চাঁদের আলোয় ভরে গেছে—বোধ হ'ল, একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ভিজে পাতার উপরে জ্যোৎস্নার আলো ঝক্‌মক্ কর্‌ছে—কখন বা টপ্ টপ্ জলের ফোঁটার শব্দ—মাঝে মাঝে দু একটা বাদুড়ের পাথার শব্দ—নিশি যেন জ্যোৎস্নায় ও ঝিল্লীরবে আকুল হয়ে উঠেছে—দূরে একটা বাঁশঝাড়ে হাওয়ায় পাতার পত্‌পত্ শব্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে···উলুকে প্রহর হেঁকে গেল, একটা পেঁচা থেকে থেকে ঘুৎকার ক'রে উঠ্‌ছে, একটা কাল পাখী তার প্রকাণ্ড কাল পাখার ছায়া ফেল্‌তে ফেল্‌তে ভীষণ ডাকে রজনীর ভীষণতা ডেকে দিয়ে কোথায় উড়ে গেল···হঠাৎ যেন বাঁশীর সুরের চেয়েও মধুর, বীণার শেষ ঝঙ্কারের চেয়ে মিঠে, দূর নহবতের রাগিণীর বাতাসে মিশান সুরের মত দোলান, পাপিয়ার খোলা গলার মত, ঝর্‌ণার ঝির্ ঝির্ শব্দের মত, কে যেন দূরে কলকণ্ঠে গাইছে শুন্‌তে পেলাম—দেখ্‌লাম, স্তব্ধ নিশীথিনী এলায়িত কুন্তলভারে তারার মালা পরে—চাঁদের সঙ্গে সেই গান শুন্‌ছে—শুন্‌তে শুন্‌তে চাঁদ ঘুমিয়ে পড়্‌ল, শুন্‌তে শুন্‌তে নিশা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। বাতাসে যে মর্ম্মর উঠ্‌ছে, তার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝাউ-বনের সর্‌সর্ ঝিন্ ঝিন্ শব্দ। নিশীথ নিঝুম ঝিম্ ঝিম্ ঝিল্লী ফুকারে উঠ্‌ছে। পাগ্‌লী তখনও গাইছে—

ফুলের মত ফুটেছি সই
তাই ত এ ফুল ভালবাসি
এর অধর পানে চেয়ে চেয়ে
আপন মনে আপনি হাসি
মুখখানি তার হাসি-ভরা
যেন গোলাপ তুলি ধরা
ফুটেছে ফোটেনিক তবু কেমন মেশামিশি,
(তাই) ফুল বদলে পেয়ে এ ফুল, আপন ভুলে ভালবাসি।

আশ্চর্য্য, এ গান তার মুখে কেন—ভাব্‌লাম, পাগ্‌লীর আর ভাব কি—যখন যা খেয়াল হয়, তখনই তাই গায়—কিন্তু কি মধুর—গান শুন্‌তে শুন্‌তে মনে কত তোলা-পাড়া কর্‌লাম, তার পর আবার তন্দ্রা এসেছে—ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন তার পরদিন সকাল হ'ল, দেখি, আমার ঘরের সাম্‌নে ব'সে একরাশ ফুল নিয়ে মালা গাঁথ্‌ছে—কতকগুলো ফুলমালা আমার টেবিলটার ওপরে রেখেছে—আর নিজে মাথায় গায়ে পায়ে চারিদিকে ছড়ান ফুলের মাঝে ব'সে আপন মনে মালা গাঁথ্‌ছে আর গুন্‌ গুন্‌ কর্‌ছে। কত রকম বুনো-ফুল কোথা থেকে এনেছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "হ্যাঁরে, এ ফুল কোথা পেলি? এ ত এ বাগানে নেই?" বল্‌লে "ওই গোঁড়েদের ছেলেরা—আমি বড্ড ফুল ভালবাসি কিনা, তাই ওরা রোজ এনে দেয়—ওরা আমায় খুব ভালবাসে।" 'আচ্ছা, এত মালা গাঁথিস্‌ কেন?' 'গাঁথি—এই সব ফুল ফোটে আর আমি মালা গাঁথি—দেখ দেখ, এ কেমন সোন্দর—না?' একটা গোলাপফুল হাতে ক'রে বল্‌ছে, দেখ দেখ, এ কেমন হাস্‌ছে—ঠিক ও তোমার ঠোঁটের মত, না—আহা! দেখ দেখ, ঠিক একরকম—বাঃ বাঃ, কি মজা—ফুলের মত ঠোঁট—বাঃ বাঃ! দেখ, আমি খুব ফুল ভালবাসি ব'লে বাবা আমার নাম দিয়েছে জবা। জবা ত ফুল, তবে আমিও ফুল! হো হো! বাঃ বাঃ!" আমি ত অবাক্‌—সত্যি, জবা জবাই বটে—কি মধুর, কি সুন্দর, প্রকৃতির এমন সৃষ্টি অথচ পাগল, কি অদ্ভুত। না না, এ পাগ্‌লী নয়, বুঝি ফুলই এমনি হয়ে মানুষ হয়ে এসেছে, তাই রূপের আনন্দে বিভোর। রূপ দেখে আর তায় ডুবে যায়—ফুল দেখে আর মজে, একবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে—না হ'লে বলে নিজেকে ফুল? সে দিন সন্ধ্যার সময় আমি বেড়িয়ে ফিরে আস্‌ছি, দেখি, জবা তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'হ্যাঁরে, গাছের তলায় আলো দিচ্ছিস্‌ কেন?' বল্‌লে—"বাবা বলে, তুলসী-তলায় আলো দিতে হয়, তুমি বুঝি কিছু জান না, এখানে যে নারায়ণ থাকে; কিন্তু দেখ, আমার ইচ্ছে করে—সব গাছের তলায় এমনি ক'রে পিদীম দিই, তা আমার এই একটি পিদীম আছে, আমার আর ত নেই। আহা, ওরাও রাত্তিরে সব অন্ধকারে থাকে।" অমর! এ বালিকা আমার কাছে এক প্রহেলিকা। তোমার কি মনে হয়? বিস্ফারিত পদ্মপলাশলোচনে ছল ছল অশ্রু তার দু কপোল বয়ে পড়্‌ল। আমারও আঁখি কূলে কূলে ভরে উঠ্‌ল। সত্যিই ত তার একটি বই পিদীম নেই।

এর কথা কত আর লিখ্‌ব, সে দিবারাত্রই এমনি বকে, আর ফুল নিয়ে খেলা করে, আবার ফুল শুকিয়ে গেলে কাঁদে। আশ্চর্য্য, শুখ্‌নো ফুলগুলো নদীর জলে ভাসায় আর কাঁদে—চোখের জলে আর নদীর জলে মিশে সাগরে যায়। সাগরও তার দুখের কথা জানে।

আমি এখন ভালই আছি। ইন্দুদিদির বাড়ীর সকলে কেমন আছে? মিহিরের

খবর কি—খুব দুষ্টুমী করে, না? শুনলাম, নগা নাকি দার্জ্জিলিঙের বাড়ীখানা সেই মাগীর নামে লিখে দিয়েছে। তুমি আমার স্নেহ নিও। চিঠির উত্তর ত তোমার কাছে পাবার যো নেই—দেখা হলেই বলবে, যে তোমার প্রকাণ্ড চিঠি, বাবাঃ—ইতি

তোমার স্নেহের
কমল।

(মায়া—শৈল)

বড়দি, তুমি আমায় ব'লে পাঠিয়েছিলে, ফিরে যাবার জন্যে, কোথায় যাব? নিত্য আমাকে এ ডাকাডাকি আর কেন? তোমায় কি ব'লে সব আরো জানাব, তা বুঝতে পারিনি।—দিদি! আমি অনেক যুঝেছি, অনেক কষ্টে নিজেকে এখন মনের মতন গড়ে নিতে যাচ্ছি, আমাকে আর কেন তোমরা বাধা দাও? সংসারকে বজায় রাখ্‌ব, এ অনেকবার মনে মনে করেছি; কিন্তু পারি নি কেন জান—এ কেনর উত্তর নেই—জীবন শেষ হলেও এর উত্তর দিতে পারব না—এ কেনর উত্তর কেউ দিতে পারে না। সমাজের ধর্ম্মের সঙ্গে, আমার মনের প্রকৃতির ধর্ম্মের সঙ্গে অনেক ঝগড়া হয়েছে; অনেক কাটাকাটি হয়েছে; আমার কাছে আমার মনের ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ হ'ল, মন সমাজকে জয় করেছে। তোমরা কি আমায় দ্বিচারিণী হ'তে বল? আমি মনে একজনের আর দেহে একজনের—এ হতেই পারে না। যে দেশে সাবিত্রী দময়ন্তী জন্মায়, সে দেশে স্বামী কি, তা আবার কি বুঝিয়ে দিতে হবে। আমায় তোমরা আত্মীয় হয়ে আর পাপে জড়াতে চাও কেন? তোমরা ভুল বুঝেছ—আমার এ দুর্ব্বলতা নয়।

তুমি লিখেছ, না গেলে খারাপ হবে। কি খারাপ হবে, আর কি বাকি আছে, সবই হয়ে গেছে। আর কিসেরই বা বাকী। এ আমার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার বোঝ্‌বার ভুল, আমি যদি মুখ ফুটে বলতে পারতাম, এ ঘটনা হ'ত না, তখন বুঝিনি, তখন নিজেকে বুঝতে পারিনি—আর বিয়ের কথাও তখন ভাল কাকে বলে, সে কি ঠিক বুঝেছিলাম,—কেবল কাঁদতে জানতাম—মেয়েমানুষ কাঁদতে শিখেছিলুম—কেঁদেছিলুম। কেঁদে আসছি, কেঁদে চলে যাব। দোষ কার নয়, "আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি"—নিজের কর্ম্মফলে নিজে কলঙ্কিনী নাম বহন করতে হ'ল। কিন্তু ধর্ম্ম জানেন, আমি দেহে মনে প্রাণে কখন দ্বিচারিণী নই। সেখানে ছিলাম কমল ছিল ব'লে, কমল চলে এল, প্রাণ যেন ছটফটিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়, বাড়ী ভাগ হ'ল, মনে হ'ল আমি অন্যের বাড়ীতে—জান নাকি অসুখ করেছে ব'লে বাড়ীভাগের পর আর খাইনি—তার পর সে রাত্রির

ঘটনা! যাক্, আর সে সব লিখ্‌তে—মনে কর্‌তে ঘৃণায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যাক্, পূর্ব্বজন্মেরই পাপে যদি এমন হয়, আমি এ জন্মে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব—যার ধ্যানে আনন্দ, তার ধ্যানেই জীবনপাত কর্‌ব। সমাজের ধর্ম্ম নানান প্রকার প্রাণের ধর্ম্ম এক। সে তার প্রাণের প্রাণকেই খোঁজে তাকেই সে চায়—দুনিয়া উল্টে যাক আর মৃত্যুই গ্রাস করুক, প্রাণের এক ধর্ম্ম।

তবে তুমি ত জান, আগে তাকে ফেরাবার জন্মে অনেক যুঝেছি, কত দিন কত রকম অবস্থায় এসেছে, আমাকে হাজার বিছের কামড় কামড়েছে, আমি নিজে পুড়ে পুড়ে জ্বলে আছি। তার এমন একটু মহত্ত্বও নেই যে, মানুষ বলেও শ্রদ্ধা আন্‌ব। সে দিন এক-খানা চিঠি পেয়েছি—সে চিঠি যদি দেখ, সে তারই উপযুক্ত—বোধ হয় জীবন্ত ব্যাঘ্রকেও মানুষ এত হিংস্র মনে করে না। যে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চায়, তার আর মনুষ্যত্ব কোথায়? হয় হোক, চায়, নিক্—মৃত্যুও আমার এ নিষ্ঠা ভাঙ্‌তে পার্‌বে না।

না বড়দি, আর আমায় কিছু ব'ল না। আমি মরে গেছি, মরে গেছি মনে কর না কেন। এখন দেখ্‌ছি, আমি মলেই সমস্তের শান্তি হয়; কিন্তু তাও অধিকার নেই··· তার মত ছাড়া। আমায় ব'লে দাও মেয়েমানুষ কত সইতে পারে—সে কথা তুমি কি বুঝ্‌তে পার না দিদি? না তোমরা মনে কর যে, সে একেবারে মরে গেছে। যাকে ভগ-বান্ ফেলে দিয়েছে, তাকে তোমরা কেন টান? সমুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি, কেবল অন্ধকার ধূ ধূ ক'রে সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে—আছে কতকগুলা ভস্ম আর ছাই। আমি ছাইয়ের ওপর আমার প্রাণের ছবি আঁক্‌ছি—বাতাসে কিন্তু সে ছাইও উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর কেন···দেখ, যে মানুষের প্রেমে একবার ডুবেছে, সে ঘৃণা—লজ্জা—ভয় রাখে না, সে কুলের কথা ভাবে না, তার ভালবাসাই তার কুল, তার ভালবাসাই তার সার রত্ন। তোমরা কি বল্‌তে চাও যে, পুরুত ডেকে বিয়ে দিলেই—অগ্নি শালগ্রাম খাড়া ক'রে বিয়ে দিলেই—সব সত্যি হয়···তা যদি হয়, তবে অগ্নি আমার অন্তর দেখেছে, যদি তার দৃষ্টিশক্তি থাকে, যদি তাই সত্য হয়, নারায়ণ সাক্ষী···তিনি আমার অন্তর দেখেছেন, যদি নারায়ণের সে ক্ষমতা থাকে। যার হাতে মন্ত্র পড়ে রাখীর রাঙা সুতো বেঁধে দিলে, সে জানলে, পাপ এসে আমায় নরকের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হায়! ভগবান্ আমার সব কথা সেই পাপের আশ্রয়ের দিনে বুঝান নি কেন? না না, ভগবান্ নেই, ভগবান্ নেই, ভগবান্ নেই···না না, আমি ভুল বলেছি দিদি, আছে—আছে—আছে—সেই অন্তর্যামী আমার অন্তর দেখ্‌তে পাচ্ছে, সেই আমাকে এ দুঃখের জগতে কমলের মধুর স্মৃতি দিয়েছে; সেই আমাকে এ বিরহের মাঝে তাকে ভাব্‌বার—পূজো কর্‌বার অবিরাম অবসর দিয়েছে। পাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার শক্তি একদিনে বাড়ে না—আমি এত দিনে তাকে বুঝেছি,—বুঝিছি সত্যের কাছে পাপ দুর্ব্বল। আমি বুঝ্‌তে

পারলাম যে, এ সয়তানের রাজত্বে বাস করলে—সয়তানের অঙ্কলক্ষ্মী হ'লে পাপের পূর্ণতা হবে, সে আমার দ্বারা হবে না, তাই চলে এসেছি। সয়তানে ও দেবদূতে যুদ্ধের ছবি দেখেছ, আমি তেমনি ক'রে বুঝেছি। আজ তোমরা আমায়. কত উপদেশ - কত বোঝাতে এসেছ, কিন্তু যে দিন প্রথম তোমরা বুঝেছিলে, তখন বুঝি ভেবেছিলে, এ আমার খেয়াল! হায়, বড়দি, জগতে সবই খেয়াল—মনের ধর্ম্মের ওপর হাত দেওয়া—এও সমাজের এক খেয়াল। সবই খেয়াল। একজনে একজনের জন্যে জগতের সুখস্বস্তি ত্যাগ করলে, প্রাণ পর্য্যন্ত দিলে—সেও তবে খেয়াল। যাক্, ও সব আমায় আর কিছু বল না—আমি ত বলেছি যাব না। আমার সঙ্গে তোমরা যে সম্পর্ক বাধাতে গিয়েছিলে, সে অনেক দিন আগে আমি কেটে ছেঁটে ফেলেছি—আর আমার ও সব কথা শুনবার সাধ নেই, স্পৃহাও নেই, অহুদিন অনুক্ষণ আর ও সব ভাল লাগে না। আর কেন ও সব?

সে দিনকার সেই চিঠিখানা ঠিক যেমন গুলি মারলে ভেঙে ফেটে গুঁড় হয়ে অণু-পরমাণুর মত ধূলোয় ও ধোঁয়ায় পরিণত হয়, আমার সমাজধর্ম্ম তেমনি গুঁড়ো হয়ে গেছে। তারও স্বপ্ন ভেঙেছে, আমারও ভেঙেছে।

কুমারী-হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে যে দিন প্রথম কমলের রূপের আলো পড়েছিল, সেই দিন যে বীজ হ'তে অঙ্কুর—মুকুল ফুলে পরিণত হয়েছিল, আজ তা ফলে পুষ্ট হয়ে এসেছে। একে তোমরা যদি বিষফল বল বলতে পার, তবে বিষ আমি একাই পান করেছি, সে বিষের জ্বালা আমারই—সে বিষে আর কাকেও জ'রে যাবার কোন কারণ বুঝিনি—একজন বিষ খায়, ফল ভোগ করে দশজন, এ ত কখন শুনিনি। যাক্, যা হবার হয়েছে, যা হবার, তা হবে, না, সবই আমার অদৃষ্ট। ভবিষ্যৎ যতদূর দেখ্তে পাচ্ছি, সমস্তই আঁধার—আঁধার—আঁধার—নিবিড় ঘোর তিমিরের ঘোমটায় ঢাকা—

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

মহাজন-সিদ্ধান্তে পুরুষ ও প্রকৃতি

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা যে-ঈশ্বর-তত্ত্বের সাক্ষাৎকারে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন নিরাকার নহে, কিন্তু চিদাকার; নিরিন্দ্রিয় নহে, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়সম্পন্ন; বিদেহী নহে, কিন্তু চিদ্দেহধারী; সেইরূপ এই ঈশ্বরতত্ত্ব নিঃসঙ্গ নহে; কিন্তু সর্ব্বদা সাঙ্গোপাঙ্গসমন্বিত। ভগবান্ বলিতে এই সমুদায় লক্ষণকেই নির্দ্দেশ করে।

ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য-নির্দ্দেশের জন্য চিদাকারের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ঈশ্বর জগৎ ও জীব হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, জগৎ ও জীব ঈশ্বর-ছাড়া নহে। এই ঈশ্বরই এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। জগৎ বলিতে আমরা এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্য বুঝি। রূপরসাদির সাহায্যেই এই জগৎ-প্রপঞ্চ আমাদের অনুভবগম্য ও জ্ঞানগোচর হয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ছাড়া এই জগতের অস্তিত্বের আর কোনও প্রমাণ আমাদের নিকটে নাই। আর শব্দাদি ধর্ম্ম শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রিত। এই সকল ইন্দ্রিয়-জ্ঞানেতেই শব্দাদির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদা সজাগ থাকে না। আমরা আজ জগতের যে রূপ দেখিতেছি, আমাদের জন্মের পূর্ব্বেও তার এই প্রকারের রূপ ছিল। এ পৃথিবীতে কোন চক্ষুষ্মান্ জীব যখন জন্মায় নাই, তখনও এই ব্রহ্মাণ্ড আলোকমণ্ডিত ছিল। যখন কোনও শ্রুতিসম্পন্ন জীব উৎপন্ন হয় নাই, তখনও এই আকাশে শব্দ-লহরী খেলা করিত। সেই অতি-আদি-যুগে, কোন্ চক্ষুতে এই আলোক প্রকাশিত, কোন্ শ্রুতিমূলে এই শব্দ ধ্বনিত হইত? সে-কালে কোন্ ইন্দ্রিয়গ্রামের আশ্রয়ে এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ছিল? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসাতেই পরম-তত্ত্বের নিত্যসিদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই সকল নিত্যসিদ্ধ চিদিন্দ্রিয়-গ্রামের দ্বারাই ভগবান্ নিত্যকাল এই জগৎপ্রপঞ্চকে ধারণ করিয়া আছেন। ভগবদি-ন্দ্রিয়-জ্ঞান ব্যতীত জগতের আর কোনও প্রতিষ্ঠা ও প্রামাণ্য নাই; থাকিতেই পারে না। সুতরাং জগৎ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, ঈশ্বরই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। আশ্রি-তের কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই, স্বাতন্ত্র্য সম্ভবে না; কিন্তু আশ্রয়-বস্তু, সর্ব্বদাই আপনার আশ্রিত অপেক্ষা বড়, আপনার আশ্রিত হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া যায়। এই জন্যই জগতের কোনও স্বাতন্ত্র্য না থাকিলেও, ঈশ্বর জগতের আশ্রয় হই-য়াও, সর্ব্বদাই জগৎ হইতে বড় ও জগৎ হইতে স্বতন্ত্র আছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে

জগতের কোনও স্ব-তন্ত্র ভেদ নাই। কিন্তু স্ব-গত ভেদ আছে। ঈশ্বরের মধ্যেই এই জগৎ তাঁহার জ্ঞেয় ও ভোগ্যরূপে তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। এই ভেদেরই নাম স্ব-গত-ভেদ।

যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ ভগবানের নিত্য-জ্ঞানের ও নিত্য-ভোগের বিষয় হইয়া আছে, তাহাকেই আমাদের প্রাচীন ভাগবত-সিদ্ধান্তে ভগবদৈশ্বর্য্য কহিয়াছেন।

কিন্তু জীবের প্রতিষ্ঠা কোথায়? জগৎ-প্রপঞ্চ যেমন ভগবদ্জ্ঞানের বিষয়, সেইরূপ জীব-জ্ঞানেরও বিষয়। জীবও আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা এই জগৎকে সর্ব্বদা জানিতেছে ও জগতের বিচিত্র রূপরসাদি সম্ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই জীব আপনিও আবার আপনার স্বজাতীয় জীবের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া আছে। এই জীবেরও তবে একটা আশ্রয়, একজন জ্ঞেয় ও ভোক্তা আছেন। কারণ, জগতের যদি একটা নিত্যপ্রতিষ্ঠা থাকে, এই জগতের সমষ্টিভূত ও ব্যষ্টিগত রূপরসাদির যদি একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ থাকে, এই জীবের কি সেই প্রকারের কোনও অনাদিসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই?

ইহা কখনও হইতেই পারে না। এই জগৎ যেমন পরিণামধর্ম্মী, জীবও ত সেইরূপ পরিণামের অধীন। জগৎ যেমন তিলে তিলে ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে, জীবও ত সেইরূপ ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে *। জগতের এই ক্রমবিকাশ যেমন তার একটা নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে, জীবের এই ক্রমবিকাশও সেইরূপই তাহারও একটা অনাদিসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে। জীব যদি কোথাও আপনার নিত্য-স্বরূপেতে বিদ্যমান না থাকে, তবে এই জগৎ-রঙ্গ-মঞ্চে জীবের এই প্রত্যক্ষ ক্রমবিকাশের বা পরিণামের কোনও অর্থ ত হয় না। আমি মাতৃগর্ভে শুক্র-শোণিত-বিন্দুরূপে সঞ্চারিত হইয়াছিলাম। ক্রমে আমি জরায়ু-শয্যায় মানুষের অবয়ব লাভ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ভ্রূণ হইতে পরিপূর্ণ-মূর্ত্তি শিশু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলাম। শিশু হইতে ক্রমে ফুটিয়া ফুটিয়া বালক, পরে যুবক হইলাম। এই যে ফোটা, এই যে বিকাশ, এই যে অভিব্যক্তি, ইহা কি একটা আকস্মিক ব্যাপার, না ইহার মধ্যে কোনও অপরিহার্য্য বিধি-বন্ধন, কোনও অনুল্লঙ্ঘনীয় আইন-কানুন ছিল? যে শুক্র-শোণিত-বিন্দু, অথবা এই শুক্র-শোণিত-বিন্দুর অভ্যন্তরস্থ যে আদি জীবাণু বা কোষাণু হইতে ক্রমে ক্রমে আমি ফুটিয়াছি, তাহার বিকাশে

* এখানে জীব বলিতে দেহেন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-সম্পন্ন জীবকেই বুঝিতেছি। দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত যে জীবতত্ত্বকে, গীতায় ভগবান্ তাঁর "পরাপ্রকৃতি" বলিয়াছেন, সে জীবকে বুঝি নাই।

কি মানুষ না হইয়া একটা কুকুর-শাবক অথবা একটা উদ্ভিদ জন্মিতে পারিত? যে বীজ হইতে যা-কিছুই জন্মিতে পারিত, আকস্মিক ঘটনাসম্পাতে তাহা হইতে আমি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, এই কি বলিব? তাই যদি হয়, তবে জীব-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা থাকে কৈ? Law of Biological Evolution জীবাভিব্যক্তির বিধি বা নিয়ম বলিয়া কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় কি? নিয়ম বলিলেই নিয়তি বুঝায়। বিধি বলিলেই একটা পৌর্ব্বাপর্য্য, একটা ধারা, একটা সম্বন্ধের বন্ধন; আর এই পৌর্ব্বাপর্য্যের, এই ধারার, এই সম্বন্ধের একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বুঝায়। লক্ষ্য নাই অথচ বিধি আছে; নিয়তি নাই অথচ নিয়ম আছে; গন্তব্য নাই, অথচ গতি আছে;—ইহা আমরা জানি না, বুঝি না; এ বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতাতে নাই; আমাদের কল্পনাতেও আসে না।

আমরা এই জগতে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠি, ইহার দ্বারাই আমাদের এই আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের বা personality'র একটা অনাদি-সিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised স্বরূপ আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। আমাদের ব্যক্তিত্বের বা personality'র এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপই এই বিকাশের নিয়ন্তা, এই evolutionএর regulative idea; ঐ স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই, পদে পদে আমাদের এই জাগতিক রূপের অভিব্যক্তি হইতেছে। ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেই আমরা অমৃতের পুত্র। ঐ স্বরূপ আছে বলিয়াই আমরা মরিয়াও মরি না। ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা কহিয়াছেন—

> "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

এই বস্তু কখনও জন্মে না, অর্থাৎ কালবিশেষে ইহার উৎপত্তি হয় না। আমরা যাহাকে জন্ম বলি, তাহা কেবল এই নিত্য-বস্তুর একটা সাময়িক প্রকাশ মাত্র। যাহার উৎপত্তি নাই, তাহার বিলয়ও হয় না। অতএব এই বস্তুর কদাপি মৃত্যু হয় না। এ বস্তু একবার উৎপন্ন হইয়া, ক্রমে বিলয় পাইয়া, আবার উৎপন্ন হয় না। এ বস্তু অজ, নিত্য, অপচয়-শূন্য, পরিণাম-শূন্য। শরীর নষ্ট হইলেও এই বস্তুর বিনাশ হয় না।

অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ প্রভৃতি বিশেষণ উপনিষদে এবং ভগবদ্গীতাতে

ব্রহ্মপক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে। অনেকে এই জন্ত জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু; জীব-ব্রহ্মের ভেদ অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত, সত্য নহে; এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু মহাজন-সিদ্ধান্তে জীব-ব্রহ্মের ভেদ নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই ভেদ-নিত্য না হইলে, জীবের জীবত্ব, জীবের সংসার লীলা—সকলই মায়িক ও অলীক হইয়া যায়। জীব আর ব্রহ্ম পরমার্থতঃ এক হইলে, জীবের এই প্রত্যক্ষ ভেদ বুদ্ধি আসে কোথা হইতে?—এই প্রশ্ন উঠে।

যাঁহারা জীব আর ব্রহ্মের পারমার্থিক অর্থাৎ নিত্য ভেদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, এই সৃষ্টির মধ্যে মায়া-শক্তি বলিয়া একটা বস্তু আছে, যাহার প্রভাবে জীবের এই ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যাহা বস্তুতঃ কখনও ঘটিতে পারে না, তাহাকেই ঘটাইয়া, এই মায়াবিনী মায়া অসত্যে সত্যবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। এই মায়াকে অতিক্রম করিলে পরে, সাধক ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিয়া কৈবল্য-মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকটে, আমাদের এই ব্যক্তিত্বের কোনও নিত্য-প্রতিষ্ঠা থাকে না। আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ এই মায়াবিনী মায়ার কর্ম্ম। মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তি এই ভ্রান্তি উৎপাদন করে।

বৈষ্ণব মহাজনেরা এই অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। যাঁহারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তাঁহারাও ইহার স্ববিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতে পারেন না। এই মায়ার উৎপত্তি কোথায়? এই ভ্রান্তির মূল কি? এ সকল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর তাঁহাদের নিকটে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও-কিছু যখন ব্রহ্মাণ্ডে নাই ও থাকিতেই পারে না, তখন এই মায়া আসিল কোথা হইতে? এই মায়া হয় ব্রহ্মেরই শক্তি, না হয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের বিক্ষেপিকা একটা স্বতন্ত্র শক্তি। মায়ার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে, অদ্বৈতবাদ টিকে না। মায়াকে ব্রহ্মেরই শক্তি বলিলে, ব্রহ্মেতে জ্ঞানবিক্ষেপিকা ভ্রান্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই গোল মিটাইবার জন্য অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে কহেন যে, এই মায়া-শক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নয়, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নও নয়। অদ্বৈত-মতের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত, এইরূপেই এই অনির্ব্বচনীয় মায়া-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন, যদি ব্রহ্মের মধ্যে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকার করিয়া, এই মায়াবিনী মায়ার স্থান করিতে হয়; তবে জগতের ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ রহিয়াছে; জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নও নহে; জগৎ ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাতে অভেদের মধ্যেই ভেদের ও ভেদের মধ্যেই নিত্য অভেদের প্রতিষ্ঠা হইতেছে;—এ কথা স্বীকার করিতে আর আপত্তি কি?

ফলতঃ আমাদের জ্ঞানের ও আনন্দের বা ভোগের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতেও ত সর্ব্বদা, সর্ব্বত্রই, এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। আমার প্রকৃতিতে যাহা নাই, আমি তাহাকে কিছুতেই ত জানিতে পারি না; আর এরূপ বস্তু আমাকে কোনও আনন্দও ত দিতে পারে না। আমার প্রকৃতির মধ্যে জড়ত্ব-ধর্ম্ম আছে বলিয়াই, বাহিরের জড়বস্তুর জ্ঞানলাভ আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে। এই প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্য-ধর্ম্ম আছে বলিয়াই, অপর চৈতন্য-বস্তুকে আমি জানিতে পারিতেছি। আমার এই জড়-ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াই, জড়বস্তু আমার ভোগের বিষয় হয়, আমাকে আনন্দ দান করে। এই আত্মচৈতন্যের চরিতার্থতা সাধন করিয়াই, চেতন-বস্তু-সকল আমার ভোগের ও আনন্দের কারণ হয়। যে যাহা নয়, সে তাহা জানিতে পারে না, সে তাহা ভোগও করিতে পারে না। এই জন্য জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন একত্ব বা অভেদ বিদ্যমান থাকে। ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যেও এই অভেদ বিদ্যমান থাকে। আবার জ্ঞেয় যদি জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন না হয়, ভোগ্য যদি ভোক্তা হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধেরই প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যেই কেবল কোনওরূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, একের মধ্যে এই প্রকারের কোনও সম্বন্ধের অবসরই হয় না। অতএব, জ্ঞেয় একদিকে যেমন জ্ঞাতার সঙ্গে অভিন্ন না হইলে, জ্ঞান সম্ভব হয় না, সেইরূপ ভিন্ন না হইলেও হয় না। ভোগ্যও একদিকে ভোক্তার সঙ্গে অভিন্ন না হইলে, তার ভোগসাধন করিতে পারে না, আবার ভিন্ন না হইলেও পারে না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের এবং অভেদের মধ্যে ভেদের প্রতিষ্ঠা হইয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান বা চৈতন্য ও ভোগ বা আনন্দ সম্ভব হয়।

কিন্তু আমরা ভেদ বলিলেই অভেদের অভাব, আর অভেদ বলিলেই ভেদের অভাব বুঝি। আমাদের চিন্তাতে একই সম্বন্ধের মধ্যে যুগপৎ এই ভেদের ও অভেদের স্থান করিতে পারি না। এইজন্য ভেদের মধ্যে অভেদ এবং অভেদের মধ্যে ভেদ, আমাদের চিন্তার অতীত ব্যাপার। এই কারণেই বৈষ্ণব মহাজন-সিদ্ধান্তে জগৎ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের ভাগবতেরা এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তেতে অদ্বৈত-মতকে গ্রহণ এবং দ্বৈতমতকে সার্থক করিয়াছেন। এখানে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের সমন্বয় হইয়াছে।

এই সৃষ্টি-প্রবাহে বা phenomenal world'এ এই যে কেবল জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের সঙ্গে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নহে। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ কেবল ব্যবহারিক জগতে বা practical world'এই প্রতিষ্ঠিত

নহে; পারমার্থিক জগতে এবং পারমার্থিক জ্ঞানে এবং পারমার্থিক আনন্দেতেও এই ভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞানের নিত্য বিষয়-রূপে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ নিত্যের আশ্রয়েই এই বিশ্বের পরিণাম-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া, অনাদিকাল হইতে তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে। এই সকল জীবও সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানের ও ভোগের বিষয় হইয়া, অনাদিকাল হইতে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে।

ফলতঃ যেমন কেবল এই জগতের বিষয়ের দ্বারা আমাদের জ্ঞান কিংবা ভোগ বা আনন্দ পূর্ণ হয় না; আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য যেমন আমাদের মতন জীবকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়রূপে পাইতে চাই এবং আমাদের মতন মানুষকে আপনার ভোগ্যরূপে না পাইলে যেমন আমাদের ভোগের পূর্ণতা সাধিত হয় না; সেইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানের এবং ভোগের পূর্ণতার জন্য তাঁরই নিজের মতন জ্ঞেয়ের এবং ভোগ্যের আবশ্যক হয়। আমরা জড়কে জানিয়া, নিজেদের জ্ঞানশক্তির অতি সামান্য পরিমাণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকি। উদ্ভিদকে জানিয়া, এই শক্তির আরও একটু বেশি সার্থকতা সাধিত হয়। পশুকুলকে জানিয়া, তার চাইতে আরও একটু বেশি সার্থকতা লাভ করি। মানুষকে জানিয়া, আমাদের জ্ঞানবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে চরিতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু এখানেও পশুপ্রকৃতি; কিন্তু নরাকারসম্পন্ন অসভ্য বর্ব্বর মানুষকে জানিয়া আমাদের জ্ঞানশক্তির যতটুকু স্ফুরণ হয়, সভ্য ও বিজ্ঞ মানুষকে জানিয়া তদপেক্ষা বেশি হয়। সভ্য ও জ্ঞানী মানুষ অপেক্ষা সিদ্ধ-মহাজনকে যদি আমরা আমাদের জ্ঞানের ও ধ্যানের বিষয় করিতে পারি, তবে তাহাতে আমাদের জ্ঞান আরও উজ্জ্বল, উদার, উন্নত ও সার্থক হইয়া থাকে। জ্ঞেয় যত বড় হয়, জ্ঞেয় যত জ্ঞাতার অনুরূপ হয়, ততই জ্ঞান পূর্ণ ও সার্থক হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ও সার্থকতার নিমিত্ত, তাঁহার অনুরূপ বিষয় থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর যেমন পূর্ণতম, শ্রেষ্ঠতম, সুন্দরতম, তাঁর জ্ঞানের বিষয়ও সেইরূপ পূর্ণতম, শ্রেষ্ঠতম, সুন্দরতম হওয়া আবশ্যক। তিনি নিজেই যদি আপনার জ্ঞেয়রূপে আপনার নিকটে নিত্য-প্রকাশিত না থাকেন, তাহা হইলে, তাঁর জ্ঞান কদাপি পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আবার তিনি নিজেই যদি আপনার ভোগ্যরূপে আপনার সমক্ষে প্রকাশিত না হন, তাহা হইলে, তাঁর ভোগও কদাপি পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এইটি প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের ভাগবত-সিদ্ধান্তে, শ্রীভগবানের নিত্যজ্ঞানের ও নিত্য-আনন্দের বিষয়রূপে, তাঁহার এক নিত্য-সিদ্ধা, নিত্যযুক্তা, অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পুরুষ। ভগবান্ person—তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। একান্ত একাকিত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। বৈশিষ্ট্যের জন্য দুই বস্তুর প্রয়োজন। দুইটি বিভিন্ন বস্তু যেখানে, সেখানেই একটিকে অপরটি হইতে বিশেষিত করিতে পারা যায়। ভগবান্‌কে কেবল জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলেই তাঁর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা personality'র প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের মতন অপর person'এর বা ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহারই উপরে যেমন আমাদের personality'র বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। আমাদের মতন, আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমকক্ষ অপর মানুষ না থাকিলে, যেমন আমাদের personality'র বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, হইত না, হইতে পারে না। সেইরূপ শ্রীভগবানের আপনার সমকক্ষ অপর কোনও তত্ত্বের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁর personality'র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সুতরাং ভগবানের এই নিত্যসিদ্ধ personality'র প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁর স্বরূপের মধ্যে, তাঁরই সঙ্গে নিত্য-যুক্ত, তাঁর সমানধর্ম্মী অপর personality'র প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অথচ সমান হইয়াও, এই বস্তু বা ব্যক্তি ভগবান্ অপেক্ষা ন্যূন হইবে। কারণ, ভগবানের সমান ত কেহ নাই, কেহ থাকিতে পারে না। এই বস্তু সর্ব্বদাই ভগবানের সমান হইয়া উঠিবে, আর সর্ব্বদাই ভগবান্ ইহাকে ছাড়াইয়া যাইবেন ও ছাড়াইয়া থাকিবেন।

এইরূপ ভাবে যে তত্ত্বের সঙ্গে নিত্য-যুক্ত থাকিয়া, যাহাকে আপনার পূর্ণ-জ্ঞানের ও পূর্ণানন্দের আশ্রয় করিয়া, ভগবান্ পরম-পুরুষ হইয়া আছেন, তাঁহাকেই মহাজন-সিদ্ধান্তে প্রকৃতি কহেন। এই প্রকৃতি শ্রীভগবানের জ্ঞানের ও আনন্দের আকর্ষণে নিয়তই তাঁর সমান হইয়া উঠিতেছে, আবার নিয়তই ভগবান্ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন।

এই সমান হওয়া ও ছাড়াইয়া যাওয়া, আমাদেরও জ্ঞানের ধর্ম্ম। আমাদের জ্ঞেয়বস্তু যতক্ষণ না আমাদের সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ জ্ঞান পূর্ণ হয় না। কিন্তু যেই জ্ঞেয় জ্ঞাতার ধাপে আসিয়া উঠে, অমনি জ্ঞাতা, এই জ্ঞানপ্রভাবেই, আবার তাহাকে ছাড়াইয়া যান। আনন্দ এবং ভোগ সম্বন্ধেও ইহা দেখি। ভোগ্য ভোক্তার সমকক্ষ না হইলে ভোগ পূর্ণ হয় না। কিন্তু ভোগ পূর্ণ হইবামাত্রই আবার ভোগ্য নীচে পড়িয়া থাকে, সেই পূর্ণ-ভোগপ্রভাবেই ভোক্তা সেই ভোগ্যকে অতিক্রম করিয়া যান। জ্ঞানের ও আনন্দের এই উভয় সম্বন্ধেতেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে এই হুড়াহুড়ি লাগিয়া আছে। সমান হওয়া আর নীচে পড়িয়া যাওয়া, মিলন আর বিরহ, নিত্যমিলন ও নিত্যবিরহ, ইহা জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এবং ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধের নিত্যধর্ম্ম।

পুরুষ এই জন্য সর্ব্বদাই প্রকৃতি অপেক্ষা বড় হইয়া রহেন। প্রকৃতি সর্ব্বদাই

পুরুষের সমান হইতে যাইয়া, সমান হইবামাত্রই পুরুষের নীচে পড়িয়া যান। আবার উর্দ্ধগামিনী হন,আবার সমান হন,আবার নীচে পড়িয়া যান,আবার উর্দ্ধে উঠেন। প্রকৃতি এইরূপভাবে নিত্যকাল পুরুষের অনুসরণ করেন। এইরূপ ভাবে পুরুষ নিত্যকাল প্রকৃতিকে আকর্ষণ করেন। নিত্যকাল পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এই লীলা চলিতেছে।

এই পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্ব মহাজন-সিদ্ধান্তের মূল তত্ত্ব। মহাজন-সিদ্ধান্তের ঈশ্বর-তত্ত্ব এই জন্য যুগল-তত্ত্ব। মহাজনেরা কেবল পুরুষের ভজনা করেন না। কেবল পুরুষ নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার। তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ বলা যায় না। প্রকৃতি-সহযোগেই পরমতত্ত্ব পুরুষ বা person হয়েন। যেমন সন্তান নাই, মাতা-পিতা আছেন, ইহা হয় না; যেমন পতি নাই পত্নী, কিংবা পত্নী নাই পতি, এরূপ কল্পনাও করা অসাধ্য; যেমন যেখানে দাস,সেইখানেই প্রভু, যেখানেই প্রভু, সেইখানেই দাস; সেইরূপ প্রকৃতি নাই, পুরুষ আছেন, কিংবা পুরুষ নাই, প্রকৃতি আছেন, ইহা কদাপি সম্ভব হয় না। যেখানে পুরুষ, সেখানেই প্রকৃতি। যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পুরুষ। এই পুরুষ-প্রকৃতি-সমন্বিত যুগল-তত্ত্বই আমাদের মহাজনসিদ্ধান্তের চরম ঈশ্বর-তত্ত্ব। এই জন্য সাধকেরা চিরদিনই যুগলোপাসনা করিয়া থাকেন।

সন্তানকে বাদ দিয়া মা'র পূজা হয় না। মা'র মাতৃত্ব সন্তানকে লইয়া। সন্তান যেখানে নাই, সেখানে মাও নাই, রমণী মাত্র আছেন। এই জন্য সত্য মাতৃপূজা-মাত্রেই যুগলোপাসনা। আমাদের দেশের গণেশ-জননীর পূজা এবং রোমান ক্যাথলিক্-খৃষ্টীয়ান্ মণ্ডলীর ম্যাডোনার পূজা—দুই' প্রকৃত মাতৃপূজা। দুই'এতেই সন্তান ও মাতা একাধারে প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টীয়ান্-মণ্ডলীর ঈশ্বর-তত্ত্বও, বাস্তবিক যুগল-তত্ত্ব! ঈশ্বর পিতা বা Father; কিন্তু পুত্রকে দিয়াই পিতার পিতৃত্বের প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য যেখানে পিতা, সেইখানেই পুত্র। যেখানে Father, সেখানেই Son—যেখানে পরমেশ্বর পিতারূপে বিদ্যমান ও প্রকাশিত, সেইখানেই যিশুখৃষ্ট তাঁর Only begotten Son একমাত্র নিত্যসিদ্ধ পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণব মহাজনদিগের যুগলোপাসনাও এই যুগল-তত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাজনেরা যে ঈশ্বরতত্ত্বের উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ, নিত্য-লীলাপর এই যুগল প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

কিন্তু ভগবানের অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতি এক হইলেও, তাঁর তটস্থা প্রকৃতি অসংখ্য, অশেষ। এই তটস্থা প্রকৃতিই জীব-প্রকৃতি। ঐ যুগলের চারিদিকে এই অসংখ্য তটস্থা প্রকৃতি বা জীবসকল আপনাপন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নিত্যসিদ্ধ স্বরূপেতে নিত্যকাল বাস করিতেছে। এ সকল কথা ক্রমে বলিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপান্তরের কথা *

রস বিচারের বিষয় নহে, অনুভূতির বস্তু। কল্পনায় যাহার উন্মেষ, সত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা। জীবনে তাহার চরম অনুভূতিই জীবনের ধর্ম্ম। কল্পকলা সেই রসের অনুভূতিকে রূপের আশ্রয়ে প্রকাশ করে। বিচিত্র রূপে, বিচিত্র বর্ণে, গন্ধে, সুরে, মহাভাবের আবেশে কি আভাষে, মানুষের জীবন-কুঞ্জে তাহার স্ফূর্ত্তি হয়। এই জীবনের রূপ ও রঙের খেলার মাঝে প্রাণ-নিকুঞ্জে যে দিন বাঁশী বাজিয়া উঠে, সে দিন সে মুহূর্ত্তেই সুন্দর মধুর রূপে বিশ্ব ভরিয়া যায়, আর অনেক দিনের অন্ধকারের অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে। জীবনের এই যে অনেক দিনের জড়তা, তাহা নির্ব্বিষ খোলসের মত পড়িয়া থাকে; বিশ্ব-প্রকৃতি মধুর রূপে হাসিয়া চায়। এক আত্মা মহা-ইন্দ্র-সম সহস্র কটাক্ষে দেখে, জগতে সুন্দর-কল্যাণ, মধুর-মঙ্গল গ্রহ-নক্ষত্র, ঋতু-কাল-মাস-বর্ষ, তৃণ-গুল্ম-বৃক্ষ-লতা, নদ-নদী, শ্যামায়মান প্রান্তর অভ্রভেদী হিমালয়, তরঙ্গ-চঞ্চল বিশাল সাগর সেই একই রূপের রূপবৈচিত্র্যে আপনার আত্মবিকাশ করিতেছে।

বাঙ্গলার গীতিকবিতায় আমি সেই আত্মবিকাশের কথাই বলিয়াছিলাম। সেই রূপান্তরের কথা, সেই রূপ হইতে রূপে বিলাস-বিবর্ত্তের কাহিনী, সেই মহাভাবের সাধনা, সেই সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার প্রতিষ্ঠার কথাই কহিয়াছিলাম।

যে আলো লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, সে আলোক যে আমার প্রাণে জাগিয়াছে। মরমের 'মণিকোটায়' নিজের যে লুকান আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে ত' চাপিয়া রাখা যায় না। আত্মা যে আপনার বিকাশ আপনি আপনিই করে। তাই সেই প্রদীপ হাতে করিয়া ঘরে ঘরে প্রাণের দুয়ারে দুয়ারে সেই নিভান দীপগুলি জ্বালাইয়া দিতে চাই। আমি কানে যে সুর শুনিতেছি, সে সুর আমার দেশবাসীকে আমি শুনাইতে চাই। যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বলিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গলার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গলা আপনার আত্মবিকাশ আপনি করিবে, আপনার গান আপনি গাইবে, আপন সাধন দ্বারা সেই সিদ্ধি লাভ করিবে ও আপন গৌরবে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবে। আমিই দেখিব, আমাদের ঘরে ঘরে সেই প্রদীপ জ্বলিতেছে; আমরাই শুনিব, সেই বাঁশরী কত বিচিত্র রাগিণীতে বাজিতেছে। তোমার প্রাণের উজ্জ্বল

---

* সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউটের অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া চল, দেখিবে, তোমারই আকর্ষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; দেখিবে, তোমারই আলোকে চন্দ্র-সূর্য্য আলোকিত হইতেছে। চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা!

আমি শুনিয়াছি, আমার কথাগুলি নাকি অনেকে বুঝিতেই পারেন নাই। আজ আমি সেই কথাগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমার বাঙ্গলা কেমন করিয়া সুখে দুঃখে সোহাগ-আবেগে নিত্য নূতন হইয়াছে, বিচিত্র হইয়াছে, রসের সঙ্গে রসের মিলন ও বিরোধে কেমন করিয়া মরা বাঙ্গালী গান গাইয়াছে, তান তুলিয়াছে, সেই গানের কতটা খাঁটি, কতটা মেকি, তাহারই কথা বলিয়াছিলাম। চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলার গীতিকবিতার ধারা কেমন করিয়া বহিয়াছিল, মহাপ্রভুর জীবনের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার অপূর্ব্ব বেগ ও স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, কেমন করিয়া আবার সেই ধারা, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি আকার ধারণ করিয়াছিল, আবার সেই ধারাই কবিওয়ালাদের গানের মধ্যে কেমন করিয়া মধুর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর মত বহিয়া গিয়াছিল—সেই গীতিকবিতার ছবি আঁকিতে আঁকিতে ও সেই ধারাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার জন্য 'রূপান্তরের' কথা বলিয়াছিলাম। আজ আমি সেই রূপান্তরের প্রাণধর্ম্মের কথা শুনাইতে চাই।

কিন্তু সাধারণ জ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের তর্কবিতর্কের ঘোর মোহজাল রচনা করিলে নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হইতে হয়। যাহা চাই, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লওয়া সহজ,—শুধু তর্কে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। জীবনের রসানুভূতির ভিতর দিয়া তাহাকে পাইতে হয়। আপনার প্রাণের মধ্যে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের সঙ্গে স্নেহ চাই, শ্রদ্ধা চাই, ভক্তি চাই, প্রেম চাই। তাহা না হইলে, যাহাই বলি না কেন, যত তর্কই করি না কেন, যাহা চাই, তাহা কিছুতেই মিলে না। এই তর্ক-যুক্তি কথা-কাটাকাটিতে যাহা পাওয়া যায়—ইহ বাহ্য! তাই মীরাবাই গাইয়াছেন—:

"বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"

আমি দার্শনিক নহি, বিজ্ঞানবিদ্‌ নহি,—আমি প্রাণধর্ম্মের ধর্ম্মী। আমি সেই প্রাণ-চিন্তামণির আলো লইয়া ঘুরিতেছি—সেই কাব্যলোকের কথাই বলিতে চাই। রূপান্তরের কথা সেই কাব্যলোকের কথা। সে কাব্য-লোক প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে। সে লোক যে মধুর উজ্জ্বল! জীবনের ধারায় প্রাণকে খুঁজিতে

খুঁজিতে, যে দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই রূপান্তর হয়। আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের আলোকে নিজেকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার নিজের সত্য পরিচয়-লাভ হয়। সেই কথাই রূপান্তরের কথা,—ইহাই প্রকৃত কবিতার কথা।

কথাটি আরও বুঝাইয়া বলিতে হয়। একটি ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, মনের সাধারণ অবস্থায় শুধু চক্ষু দিয়া দেখিলে একটি রূপ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সেই রূপ কি ফুলের প্রকৃত রূপ, সমগ্র রূপ? ফুল কি শুধু একদিনে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে? তাহার মধ্যে কি জন্মজন্মান্তরের কাহিনী লুক্কায়িত নাই? কত কাল ধরিয়া সে যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল—কতবার ঝরিয়া ঝরিয়া আবার ফুটিয়া উঠিল! কে তাহা গণনা করিবে। তাহার রঙের প্রতিরেখায় যে অনন্তকালের ছাপ, তাহার প্রত্যেক পাপড়ীর মধ্যে যে অনন্তকালের সুখ-দুঃখ জড়াইয়া আছে, তাহার প্রত্যেক কাঁটার মধ্যে যে অনন্তকালের বিরহবেদনা জাগিয়া আছে! ফুল ত' শুধু ফুল নয়, সে যে সকল বিশ্বের যে মহাপ্রাণ, তাহারি প্রাণ-কণিকা! সে যে অনন্ত লীলাময়ের লীলা-সহচর! তাহার মধ্যেও যে বিশ্বরূপ জাগিয়া আছে। সকল বিশ্ব যে প্রাণময়, সকল রূপ যে চিন্ময়! সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্! সকল জীব-জন্তু, তরু, লতা, সকল পদার্থ—যাহাকে তুমি অচেতন ভাবিয়া হেয় জ্ঞান কর, সবই যে সেই এক মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত, সবই যে একই চিন্ময়, অনন্তরূপে উদ্ভাসিত! ফুলও অনন্ত! তুমিও অনন্ত! তুমি যদি তোমার মনগড়া সাধারণ জ্ঞান কি বিজ্ঞানের ঠুলি চোখে পরিয়া ফুলের এই অনন্ত রূপ না দেখিতে পাও, তাহাতে কি ফুলের স্বভাব, কি ধর্ম্ম বদ্লাইয়া যাইবে?

শুধু চক্ষে যাহা দেখি, তাহা ফুলের সাধারণ রূপ। আবার সেই ফুলই, যখন আমি তাহাতে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া প্রাণ দিয়া দেখি, যখন সেই ফুলটী আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া উঠে, আমার রস সাধনার মূর্ত্তি হইয়া জাগে, তখনই ত' আমার প্রাণের সাক্ষাৎ লাভ করি। তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণ যে অতল অনন্ত, আর আমার ফুল যে আপন গৌরবে তাহার বিশ্বরূপে, চিন্ময়রূপে, অনন্ত হইয়া আমারি প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া আছে! তাহার সঙ্গে রসের লীলা চলিতেছে—তখনই রূপান্তর।

আমাদের সকলের জীবনেই এইরূপ রূপান্তর ঘটে বা ঘটিতে পারে। একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। প্রেম জাগিবার আগে সেই নারীর যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাই কি তার যথার্থ রূপ? অনুরাগের অবস্থায় যখন তাহাকে দেখি, তখন যে প্রাণ দিয়া দেখি! তখন যে আমার প্রাণকে দেখিতে পাই এবং সেই প্রাণের যে চক্ষু, সেই চক্ষু দিয়া তাহাকে দেখি! তখন যে—

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ-মূরতি !
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে—
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে !

যতই আমরা প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই যে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া উঠে! অনুরাগ গাঢ় হইলে—

আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

তার পরে সেই মূর্ত্তি যে আমার ধ্যান-ধারণার বিষয় হইয়া পড়ে !

সেই—সেই তরঙ্গিত পরাণ-মূরতি
সকল চাঞ্চল্য-ভরা অচঞ্চল গতি।
সকল লাবণ্যে গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !
সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল রকম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !—
সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়,
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়,
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়—
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই শুভক্ষণে তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ—সেই মুহূর্ত্তই যে আমার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত! আমি আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি !

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি ! সত্যরূপাধার !
অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ-রস-গন্ধ-ভরা আত্মার মন্দির !

পদতলে কলকলে কাল উর্ম্মিমালা
শিরে কোন্ দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা!

তখনই মনে হয় যে, এই প্রেম যে অনন্তের পথে যাত্রা করাইয়া দিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব শুদ্ধ পবিত্রভাবে প্রাণমন ভরিয়া যায়। মনে হয়, কোথায় কাহার সন্ধানে চলিয়াছি। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে যেন কোন্ মহা-দেবতার জাগ্রত জীবন্ত বিগ্রহ। কাহার উদ্দেশে অভিসার করিয়াছি, কোন্ মহাসাগরের দিকে আমার জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে। তখনই বাঞ্ছিতকে বলি,—

রাখ বুকে বুক কর গো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন্ সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, কার পিছে পিছে
শুনি কার শঙ্খধ্বনি—

তার পর এই প্রেম যখন আরও গাঢ় হয়, তখন প্রাণের দুইটি তীর ভাসাইয়া দেয়, এবং সেই স্রোতের মধ্যে কত কি জাগিয়া উঠে! তখনই গাহিয়া উঠি,—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালেনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা
অন্তরের অঙ্গে অঙ্গে
কে দিল বুলায়ে রঙ্গে?—
যে ফুল ফোটেনি আগে
সেই ফুলে গাঁথা মালা!
এই যে হৃদয়মাঝে
কি সুন্দর কুঞ্জ রাজে!—
যে দীপ জ্বলেনি আগে
ওরে! তারি আলো জ্বালা।

তার পরেই মনে হয়, এই যে প্রেমের খেলা, এ যেন তিন জনের খেলা—একজনের লীলা। সেই একজনের চরণ-নূপুরের রুণুরুণি প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাই। সে যে হাসিয়া হাসিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে নাচে। এই প্রেমের যত না মাধুর্য্য সবই যেন নিজে আস্বাদ করে। আমরা যেন তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া

তাঁহার আনন্দ-মন্দিরে তাঁহারি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিই। তখন আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। তখনই প্রেমিক গাহিয়া উঠে,—

ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি জানি জেগেছে,
হৃদয়-কমল-মাঝে কি ধূম লেগেছে

* * * *

* * * *

কে নেয় রে মধু লুটি
হেসে হেসে কুটি কুটি ?
তালে তালে মধু ঢালি
কে দেয় রে করতালি ?
ওরে দেখ্ দেখ্ দেখ্ কি ধূম লেগেছে
পরাণ-কমল-মাঝে কি জানি জেগেছে !

যখনই দেখিলাম, হৃদয়ের মাঝে "কি জানি জেগেছে", পরেই দেখিলাম, "কে জানি জেগেছে।" তখনই উপলব্ধি করিলাম যে, এ প্রেম ধন্য, তখনই আমার যে প্রেমের সহচর, তাহার দিকে চাহিয়া গাহিয়া উঠিলাম,—

ওগো ফুল ! ওগো মিষ্টি !
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি !
ধন্য আমি, ধন্য তুমি,
পুণ্য সে মিলন ভূমি !

তখন যে আমার হৃদয়বিহারী করতালি দিয়া ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন ! আমি আবার গাহিলাম,—

কে বলে রে ধন্য ধন্য ?
কে দেয় রে করতালি ?
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আছে ?

কে বলে রে ধন্য ধন্য
এ কার নূপুর বাজে ?
কার পদরজঃ
পরাণ-পঙ্কজ
শোভা করে ?—

তখনই কি প্রেমিক তাহাকে দেখিতে পায় ? তখনও নহে। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। এই প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সকল জীব যে—

"ঠেকে গেছে প্রেমের দায়"

এক জন্ম হউক, অসংখ্য জন্ম হউক, এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইবেই হইবে! তখন সেই শুভক্ষণে প্রেমিক দেখিবে, তাহার চোখের কাছে, প্রাণের মধ্যে, তাহার অন্তরে বাহিরে দুই বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হৃদয়ের হৃদয়বিহারী চিন্ময় চিদানন্দে পূর্ণ আনন্দরূপ-ঘন-রসামৃত-স্বরূপ তাহারই প্রেমের প্রেমিক ভগবান্!

এই যে প্রেমের কতকগুলি অবস্থা নির্দ্দেশ করিলাম, ইহার প্রত্যেক অবস্থাই রূপান্তরের অবস্থা, শেষ অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছি, তাহাই রূপান্তরের চরম। এই প্রত্যেক অবস্থাই সত্য, এই সমস্ত অবস্থা লইয়াই প্রেমের রাজ্য।

সেই প্রথম যখন রূপ আসিয়া চোখের সাম্‌নে দাঁড়াইল, সেই অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শেষে যখন সকল রূপের যিনি স্বরূপ, তিনি আসিয়া প্রাণের সম্মুখে প্রাণের মধ্যে দাঁড়াইলেন—এই সব লইয়াই যে প্রেম,—এই সব লইয়াই একটি অখণ্ড সত্য-রাজ্য। ভগবান্ যে বাঁশী বাজাইয়া তাঁহার নিকট ডাকেন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইন্দ্রিয়ের ডাকও সেই ভগবানের ডাক। ইন্দ্রিয়-জগতে যে প্রেমের আরম্ভ, অতীন্দ্রিয়-জগতে তাহার পরিণতি। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই এই যে, সে আঙ্গুল দিয়া অতীন্দ্রিয়ের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এই যে অখণ্ড সত্য-রাজ্য, ইহার কোন অংশই বর্জ্জন করা যায় না,—করিলে সত্যের অঙ্গহানি হয়। এই সমগ্র সত্যটি যখন আমাদের প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যে প্রেম, তাহার রূপান্তর ঘটে। প্রেমের যে স্বভাব, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, শুধু আমাদের চোখ খুলিয়া যায়, প্রেম আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে কবির প্রাণে এই সমগ্র অখণ্ড সত্যের প্রদীপ জ্বলিয়া না উঠে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন যে, কলাকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিষ, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে ইংরাজেরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে, সকল কলাকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কলাকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি! সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না। রস-সাধন না হইলে রসসৃষ্টিও বিড়ম্বনা। বিলাসের ধর্ম্মই এই যে, সে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রামে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সে যে আপন বিলাসের বিষয় লইয়া তন্ময় হইয়া পড়ে ও আপনার আবেগে ইন্দ্রিয়-রাজ্য অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয়-রাজ্যে পৌঁছায় এবং সেইখানে তাহার রূপে রূপে রসে রসে বিলাসবিবর্ত্ত! মহাপ্রভু রামানন্দের মুখে এই বিলাস বিবর্ত্তের কথাই শুনিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের যে বিলাস, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের খোঁজ পায় না, সেই রূপে রূপে রসে রসে বিলাস-বিবর্ত্তের সন্ধান রাখে না, শুধু ইন্দ্রিয়রাজ্যের মধ্যে বিলাসকে আবদ্ধ করিয়া সেই বিলাস লইয়া একটা মন-গড়া অসার কাল্পনিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে কলাকলার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাঁহাদের আমি তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিব না—শুধু বলিব, এই যে বিলাস, যাহার একদিক্ দেখিতেছ, অপর দিক্ দেখিতে পাইতেছ না—ইহ বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রামের কথা তুচ্ছ নিম্নস্তরের কথা, কলাকলায় তাহার স্থান নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয় কলাকলার রাজ্যে প্রবেশ করিলে কলাকলা অপবিত্র হইয়া যাইবে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। নীতির কথা বল, তত্ত্বের কথা বল, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে যাহা আছে, সব কাটিয়া ছাঁটিয়া দাও, ইন্দ্রিয়-ভোগের যে স্পৃহা, তাহার নাম মুখে আনিও না, মানুষকে দেবতা করিয়া তুল, কলাকলার দোহাই দিয়া জীবনকে অপবিত্র করিও না। জীবনকে অপবিত্র করে কাহার সাধ্য? জীবের জীবন যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলার উপরে হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার—এমন দাম্ভিকতা কার? মানুষ কি এই পর্দ্দাঘেরা নীতি-কথা বুকে বাঁধিয়া মিথ্যার উপর দাঁড়াইয়া মিছামিছি বিনাকারণে দেবতা হইয়া উঠিবে? মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না? আজও কি চৈতন্যের দেশে এ কথা শুনিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা সয়তানের খেলা? আমরা কি ইংরাজী আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না? ইন্দ্রি-

য়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রয়ের সন্ধান মিলে না? ইন্দ্রিয় যে অতীন্দ্রিয়ের ভিত্তি, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া দিয়া একটা মনগড়া শুদ্ধ পবিত্রলোকের প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়াও যেমন, শূন্য-আকাশে গৃহ-নির্ম্মাণের চেষ্টাও ঠিক সেইরূপ! মিথ্যা কল্পরাজ্যে তাহা স্থান পাইতে পারে, সত্য-রাজ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই? কাহারও প্রাণে সেই বংশীধ্বনি খুব স্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠে, কাহারও প্রাণে খুব ক্ষীণ ও অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হয়; কিন্তু একেবারে শুনিতে পায় না, এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে?—যদি থাকে, তবে আমাকে বলিতেই হইবে যে, তাহার জীবনের কোন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। সে কতকগুলি নিয়ম মুখস্থ করিয়া বসিয়া আছে—জীবনের কোন সন্ধান পায় নাই। সে যেদিন সেই নিয়মগুলি ভুলিতে পারিবে, সে দিনই প্রথম সত্যরাজ্যে পদক্ষেপ করিবে। সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য কোন কল্পকলার রসসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। তাহাকেও আমি কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারিব না। যে দিন লীলাময় আপনি বুঝাই-বেন, সে দিন বুঝিবে। এখন শুধু মহাপ্রভুর ভাষায় এইটুকু বলিয়া রাখি,—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, মানুষকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাকে কাজের লোক করিয়া তুলিতে হইবে, সাধারণে যাহাতে তত্ত্বকথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে, জনসাধারণে যাহাতে তাহার প্রচার হয়, কল্পকলার বিষয়কে এমন করিয়া গড়িতে হইবে। তাহাদেরও উত্তর—ইহ বাহ্য!

আবার কেহ কেহ বলেন, সমাজের সংঘাতে যখন ব্যক্তির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে, পরাধীন যখন তাহার শৃঙ্খলের ভারে নড়িতে পারে না, তখন কাব্যরস মানুষের প্রাণকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করে, তাহাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে লইয়া যায়। এই স্বপ্নের জন্য, জীবনকে এই স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী করিবার জন্য কল্প-কলার সৃষ্টি। তাহারও উত্তর—ইহ বাহ্য!

কেহ কেহ বলেন, যাহা শুধু হিতকর, যাহা কোন অশুভ, ক্ষতি, কোন অমঙ্গল আনে না, তাহাই সুন্দর ও যথার্থ কল্পকলা। তাহাদেরও আমি বলিব—ইহ বাহ্য!

কল্পকলা যদি শুধু আমাদের আনন্দ ও আমোদের জন্যই হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ধর্ম্ম থাকে না, তাহার আত্মবিকাশ হয় না, আমাদের কতকগুলা ভাবের খেয়ালের ছাঁচে পড়িয়া তাহার জীবনের আসল প্রাণটুকু মরিয়া যায়। তাহার কোন সার্থকতা হয় না। সত্য তখনই সুন্দর হয়, যখন তাহার এই বহিরাবরণের ভিতর ছাপা-ইয়া সে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত ভাবকে বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়। মানব-প্রকৃতির গভীর

হইতে গভীরতম প্রদেশের যে প্রাণের খেলা, তাহাই যথন সে প্রকাশ করে, যথন আত্মার নিগূঢ় কথাটি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তথনই কল্পকলার রূপসৃষ্টি হয়। বিশ্বের অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার যাহা সাধারণ স্থানে সাদা চোখে বন্ধ থাকে, মানবের সেই 'ভিতর গাঁয়ের' কথা, কাম-কামনার অতীত যে মাধুর্য্য, সেই আত্মার রসভোগের যে ব্যঞ্জনা, বিশ্বশক্তির যে মূর্ত্ত স্ফুরণ, মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির আত্মায় আত্মায় যে রমণ, কল্পকলা তাহারই চাবি,—সেই চাবি ঘুরাইয়া আত্মা নিজের রূপের আদর্শটিকে সেই অনন্ত রহস্যময় ঘরের দুয়ার খুলিয়া বাহির করিয়া আনে।

বিশ্বের যে দিকে নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখি,—দেখি, প্রতি পত্রে, প্রতি রঙে, প্রতি রূপে সেই আত্মার প্রতিরূপ। ঋতুর আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে, মানবের কার্য্যকারণের সম্বন্ধে, প্রকৃতির বিপ্লব বহ্নিদাহে, মানুষের নিজকৃত স্বকপোলকল্পিত নানা শক্তির বিকাশে, এক মহা সুশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলায় যেন এই বিশ্ব অহরহ অন্দোলিত হইতেছে। আঁখির সম্মুখে বাস্তব সত্য-জগৎ প্রতিভাত, কিন্তু তাহাতে সেই অন্তরতমের যে রূপ, তাহা আমাদের চোখে পড়ে না। কল্পকলা সেই অন্তরের রূপটিকে বিশ্বের বুকের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করে, যাহা মায়া বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার সত্যরূপকে জাগাইরা দেয়। যাহা এমনি আমাদের চোখে পড়ে, যাহার ভিতর সেই অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতের রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হয় না, কল্পকলার সেই সত্যকে মনের কাছে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া ধরিয়া দেয়। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণের কাছে সেই সত্যকে আনিয়া দেয়। রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তাহার ধ্যানগত অনুভূতিই কল্পকলার বিভূতি। কল্পকলাবিদ্ সেই বিভূতি দর্শন করেন। ইহাই সত্য। কল্পকলা শুধু মানুষের খেয়াল-রঙ্-মহালের রঙ্গিণী নটী নহে। যাঁহারা সত্যের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে পরানুরক্তির আসক্তি জাগিয়াছে, যাহাদের চিত্ত সর্ব্বভাবে সেই পরানুরক্তিতে ভিজিয়া গিয়াছে, যাঁহাদের ভাব সেই রসের মধ্যে গাঢ়তা লাভ করিয়াছে, সেই প্রাণ-মন-দেহ দিয়া অনুধ্যান, সেই অহৈতুকী সান্নিধ্যলাভের জন্য যাঁহাদের প্রাণ প্রেমরসে বিভোর হইয়াছে, তাঁহারাই কল্পকলার স্রষ্টা।

মনের যে আকাঙ্ক্ষা, সে সত্য বস্তুকে সুন্দর করিয়া চায়। শুধু তাহার একটা ভাবের আভাষে প্রাণ ভরিয়া উঠে না, তাহাতে সে তৃপ্ত হয় না। সেই রূপ-রসের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিকে ধরিতে চায়, তাহাতে দোষ হয় এই যে, বস্তু তাহার নিজের স্বাধীন ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। সে তথন আমার আকাঙ্ক্ষার, কামনার ভোগ্য দাস হইয়া দাঁড়ায়। তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিতে বাধা পায়।

তাই তখন আর সুন্দর থাকে না। বস্তুর যে নিজের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও গতি আছে, তাহাই তাহার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, আর সেই জন্যই তাহা সুন্দর। সে যে রস জাগাইয়া দেয়, তাহাই সুন্দর। তোমার আমার মনে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহার সঙ্গে সেই বস্তুর রসাঙ্গসমূহ মিলিত হইয়া আমার প্রাণের কাছে এমন একটি রূপের দ্বারা রসের আভাষ জাগায়—যাহা সুন্দর—অতি সুন্দর!

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত' জড় নয়, জড়তা আমার মনের মধ্যে তাই; এই চিন্ময় ধামের রূপ-মাধুর্য্যের ভিতর সুন্দরকে ব্যভিচারী দোষে দুষ্ট করিয়া জড় বলি। অঙ্গ-সমূহের যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যাহার যথাযোগ্য সন্নিবেশে রূপসৃষ্টি হয়, আর সেই রূপের ভিতর তাহার আত্মার মধুর রসটি জাগিয়া উঠে, তখনই তাহা সুন্দর। তাই সুন্দরের জন্য প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের প্রাণের রসের তেমনই স্বাভাবিক ভাবের মিলন হওয়া চাই। যখন মনকে রসের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তখনই সুন্দর, সুন্দর হয়। এই সুন্দরকে প্রকাশ করিবার জন্যই কল্পকলার সৃষ্টি। মানব অন্তঃকরণের ভিতর যে ভাবরাশি ঘুমাইয়া থাকে, মানুষের মনে যে গভীর জটিল রহস্যগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আপনি খেলা করে, তাহার প্রাণের ভিতরে যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত তৃষ্ণা, যত দ্বৈতের জঞ্জাল, দৈন্য-বিরোধ, যত মিলন-সোহাগের মাধুর্য্য, তাহার বেদনা, তাহার যাতনা, তাহার রাগ অনুরাগ, তাহার ভাব অভাব, মহাভাব এই সব দিয়া আমাদের সমগ্র জীবনের যে অনুভূতি, জীবনচক্রের এই মহা-পরিধির ভিতরে মানুষ যেমন করিয়া বাঁচে, যেমন করিয়া মরে,—এই জাগ্রত ভাবের রূপ ধরিয়া সৃষ্টি করাই কল্পকলার উদ্দেশ্য। আর সেই রূপের ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দ-ঘন-চিন্ময় কেমন প্রতিরূপ হইয়া ভাঙ্গা গড়ার লীলা লীলায়িত ভাবে আমাদের প্রাণ-মন-দেহ দিয়া সাধন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ করা, সুন্দর করিয়া মধুর করিয়া তোলাই কলাবিদের প্রাণের সৃষ্টি-কাহিনী।

কেহ কেহ বলেন, কল্পকলার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টি অপেক্ষা হীন। কারণ, প্রকৃতিতে জীবন উদ্‌বুদ্ধ, মানবের সৃষ্টিতে তাহা মৃত, প্রকৃতিতে তাহা সজীব জীবন্ত! কল্পকলার উপাদান হয় কাঠ, নয় পাথর, নয় মাটী, নয় মোম, নয় কথা, নয় সুর। এ সব পদার্থও যে সত্য, মৃত নয়, ইহাদের মধ্যেও মহাপ্রাণ জাগিয়া আছে! কিন্তু শুধু এই সব উপাদান দিয়াই ত কল্পকলার সৃষ্টি হয় না। আত্মার অনুভূতি দিয়া সেই সৃষ্টির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই অনুভূতিতে যে মহাজীবনের আভাস, তাই এই সব কাঠ-পাথর অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে! জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের কাছে ধরিতে যাই, প্রকৃতির বুকে যে সব সৃষ্টি আমরা

জীবন্ত বলিয়া দেখি, কল্পকলা তাহাই ধরিয়া নব নব রূপে জীবিত জ্বলন্ত সত্তার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যের স্বরূপটি ধরিয়া দেয়। সেই জন্য কল্পকলার সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ! কিন্তু—ইহ বাহ্য! এ সকল কথা সার্ব্বভৌমিক কল্পকলার কথা নয়। প্রকৃতি যে আদর্শে আপনার বুক হইতে রূপের সৃষ্টি করে, মানুষও সেই একই আদর্শে তাহার প্রাণ হইতে রূপ সৃষ্টি করে। এই উভয় সৃষ্টিই যে সেই লীলামৃত-রসাধার সেই আনন্দ-ঘন মহান্-রসরাজের লীলাভঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। কেহ হীন নয়, কিছুই হীন নয়।

কবীর গাহিয়াছেন—

"আপুহি সবমে রমা হৈ,
আপ সবনকে পার।
রূপ রংগ সব আপুহী,
আপুহি সিরজন হার॥
আগে বহুত বিচার ভৌ,
রূপ অরূপ ন তাহি।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া,
নহি তহি সংখ্যা আহি।

আপনি সৃজন করিয়া আপনিই হরণ করিতেছেন। সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, সকল রূপের মধ্যেও তিনি। রূপ ও রঙের যে রঙ্গ, যে লীলা, এর ত' সংখ্যা-সীমা নাই। জীবনে যাহাদের রূপের পরিচয় ভাল করিয়া হইয়াছে, তাহারাই এই রূপ রঙের লীলা-মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারে।

অনন্ত রূপের মাঝে এ মন শুধু দু-একটা রূপকেই চিনিতে পারে, ধরিতে পারে, অসংখ্য সুরের হিন্দোল মাঝে একটি সুর হয় ত' আমরা চিনিতে পারি, অসীম জ্যোতি-রাশির মাঝে আমরা যেন পতঙ্গবৎ উড়িয়া বেড়াইতেছি। কল্পকলার রূপের ধ্যানে যখন সমাধি হয়, তখন সেই আসল রূপটি ফুটিয়া উঠে। এই সাধনায় সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না আগম নিগম তন্ত্র সারে।
সে যে ভক্তি-রসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

কল্পকলার স্রষ্টা সত্য সত্যই এই রূপের ভিতর দিয়া দর্শন করে, স্পর্শ করে। সে মহাভাবের গান তাহার কানে অহরহ ধ্বনিত হয়। কলাবিদের প্রাণ সেই মহাপ্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপনি বাজিয়া উঠে। এই বিশ্ব তাহার কাছে এক বিরাট্ আয়নার মত

ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কলাবিদ্ সেই আর্সিতে নিজের রূপের প্রতিরূপ দেখিয়া নিজ মাধুরী আস্বাদন করেন। প্রতিরূপের ভিতরেই তাঁহার বিলাস-বিবর্ত্ত ফুটিয়া উঠে, তাঁহার আত্মার রূপ বিশ্বের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে, বিশ্বের প্রাণের রূপ তাঁহার প্রাণে প্রতিভাত হয়। এই যে অন্তরে অন্তরে রূপের পরিচয় লাভ করা যায়, তাহাই প্রাণের রূপান্তর!

আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতি-কবিতায় সেই প্রাণে প্রাণে অনুভূতি, সেই "স্বাদিতে নিজ মাধুরী" প্রাণের সেই সার্ব্বভৌমিক কল্লকলার রূপান্তর হয় নাই। চণ্ডীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক কবিদিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। তাহার কারণ আছে। গীতিকবিতায় প্রাণ কবির আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে। কবির প্রাণে জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে যে রূপের পরিচয় কবি লাভ করেন, তাহার আত্মার নিগূঢ় কথাটি, মর্ম্মটি প্রকাশ করিয়া তোলাই গীতিকবিতার ধর্ম্ম। কথাটি অপ্রিয় হইলেও আমাকে বলিতে হইবে, বাঙ্গলার আধুনিক গীতিকাবতায় সে জিনিষটা পাওয়া যায় না। এই যে শতবর্ষব্যাপী আমাদের আধুনিক সাহিত্যে গীতিকবিতার বিরাট্ আয়োজন, ইহা আমাদের জীবনের কোন কর্ম্মই, কোন সাধনাকেই সার্থক করে নাই; কোন সত্যকেই সুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে নাই। এ সেই—

> "পিতলকি কাটারি কামে নাহি অওল
> উপর কি ঝক্‌মকি সাব"

এই সমগ্র সাহিত্যই অনুভূতির নয়—মাথার বোঝা। ধার করা—পরের দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহরণ করা। ইংরাজী সাহিত্যে ও ফরাসী কবিতার তর্জ্জমা হয় ত বা নরওয়ে সুইডেনেরও ছাঁদে গড়া। তাহাতে বাঙ্গালীর প্রাণ নাই, ধর্ম্ম নাই—আছে শুধু অনুকরণ! অনুকরণে কখনও জীবন আসে না, ধার করিয়া কখনও সম্পদ্ অর্জ্জন করা যায় নাই। এই সাহিত্যও সেই কারণে বস্তুহীন, প্রাণহীন, একটা অসার কাল্পনিক ভাবুকতায় ভরা। বাঙ্গালার প্রাণের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই।

রূপে ধরা দিবার জন্যই ভাব প্রাণের অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া উঠে। ভাব যতই রূপের ভিতর দিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে। ভাব যখন সত্য সত্যই রূপের কাছে ধরা দেয়, তখনই তাহা মধুর ও সুন্দর। সত্য যখন মানব মনে প্রতিভাত হয়, ভাব যখন সেই আকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ভাব কাল্পনিক নহে, সত্যের অবভাস নয় তাহা সত্যরূপ, তাহাই সত্য

মূর্ত্তিমন্ত জলন্ত! সত্যের রাজ্যে নিত্য যে লীলা চলিয়াছে, তাহাতে ভাব ও আকারের পার্থক্য নাই। সে লীলা কাব্যলোকের নিভৃত মিলন-কেন্দ্র। আমাদের বিচার-বুদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কিন্তু মিলন-মন্দিরে যখন বুদ্ধি সেই রূপের টানে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহার সেই পাটোয়ারী বুদ্ধি রূপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিয়া বাঁচে, আর প্রাণ তখনই সত্যকে অনুভব করিয়া একেবারে গ্রহণ করে। যাহা সত্য, তাহাই সুন্দর। যাহা সুন্দর, তাহাই যে অনন্ত, স্বাধীন। যাহা স্বাধীন, তাহাকে তোমার মাপের রশি দিয়া বাঁধিতে পারিবে না; যাহা অনন্ত, তাহাকে তোমার মাপকাটি দিয়া পরিমাণ করিতে পারিবে না।

তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম—অখণ্ড অনন্ত প্রেম! ভাব যেমন আপনার ভাবে গলিয়া আকারের ছাঁচে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তেমনি জীবনকে সেই প্রেমে ঢালিয়া দিলে তবেই জীবনের সত্য রূপটি ধরা দেয়। এই প্রেমের সোহাগ-বাঁধন যদি না থাকিত, তবে কি এই যে মহাভাবের অপার আনন্দ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি অনন্ত অভাব, অসীম দুঃখ—এই দুইকে মিলাইতে পারিতাম? যত দুঃখ, যত অভাব, যত যাতনা, যত ঘৃণা, যত হিংসা, সেই প্রেমেরই অন্তরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সবের মধ্যেই যে সোহাগের বাঁধন! এই সবই যে অনন্ত প্রেমের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। যখন সত্য হারাইয়া মেকি লইয়া প্রাণ কাঁদে, তখন সেই অনন্তের পানে মুখ তুলিয়া প্রাণ বাঁচে। জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তাহা প্রেম, প্রেমে এই মূর্ত্তি-স্রোতের জন্ম, প্রেমেই এই প্রাণ-স্রোতের চঞ্চলতা। সারা বিশ্ব সেই প্রাণস্রোতে মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি, রূপের পর রূপ, এই লীলা-চঞ্চল-বারিধি-বুকে অবিরাম প্রাণ স্রোতে টলমল করিতেছে। সেই:লীলা-চঞ্চল মূরতি-স্রোতের সঙ্গে প্রাণের নিঃসঙ্গ পরিচয়-লাভই প্রেমের এক দিক। রূপের ভিতর দিয়া প্রাণের এই লীলামূর্ত্তির পরিচয় যখন ধ্যানগত হয়, তখন সেই মূর্ত্তির সহিত অহৈতুকী পরিচয় হয়, তখন সেই নিজের মাধুরী সেই মূর্ত্তি-স্রোতের ভিতর আস্বাদন হয়। তখনই সত্য রূপান্তর। প্রেমের প্রথম জাগরণে রতির রাগানুরাগ জাগে, সেই জাগরণের সঙ্গে নিজের মাধুরী আস্বাদের কামনা, বাসনা, মমত্ব, মদনত্ব জাগে। যখন তাহা প্রেমের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়?—সেই প্রেমের ভূমিতে একবার পা রাখিতে পারিলে অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির আভাষ প্রাণে—স্ফটিকে সূর্য্যকিরণ-প্রতিবিম্বের মত :স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। প্রাণ যখন দর্পণের মত স্বচ্ছ হয়, তখনই আত্মার যে প্রাণময় সৌন্দর্য্য, তাহার স্বরূপকে পাই। তখন বুঝিতে পারি! সে প্রাণের সত্য অনুভূতিতে, নিখিল রস, রসশেখরের রস-চঞ্চল যে সত্যমূর্ত্তি, তাহাই প্রাণে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের রূপকে

সত্যদর্শন হয়, তাহাকে স্পর্শ করা যায়, তখন তাহার গায়ের গন্ধ নাসিকায় ভাসিয়া আসে—প্রাণ-স্রোতের লীলায় তখন সেই ধ্যানগত পদ্ম ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের জীবনে, কবির জীবনে, এমনি করিয়া সেই সত্য পরিচয় হয়। কলাবিদ্ ও কবির রূপান্তর—তাহার দৃষ্টি তাহার প্রকাশ!—সাধক তাহার সাধনায় সমাধিত—তাই মিলাইয়া আনন্দ-ঘন-রসে মজিয়া যায়! এই যে রূপান্তর, ইহা সেই অনন্তের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়লাভ—প্রাণে প্রাণে বুকে বুকে স্পর্শমণি ছুঁইয়া সোনা হওয়া!

আমি বলিতে চাই যে, একমাত্র চণ্ডীদাসের গান ছাড়া বাঙ্গলা গীতি-কবিতার শেষ যুগে রামপ্রসাদের গানে সেই রূপান্তর হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রাণের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার কল্পকলার যে সৃষ্টি, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিপ্রধান মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল। মহাপ্রভুর জীবনের মত এত বড় কাব্য আর কখনও রচিত হয় নাই। সাধক রামপ্রসাদ যে রসের আদর্শ আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি কাহার জীবনে যে ফুটিয়াছে, এ কথা এখন নাই বলিলাম। চণ্ডীদাসের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল,—তাঁহার সৃষ্টিই তার প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল, তাঁহার সৃষ্টিও তাহারই প্রমাণ।

বাউলের গান

ডাক দিয়েছে অচিন পাখী কোন বনে,
তুই শুন্‌লি না কানে,
তুই পড়াস্ শুধু শেখা বুলি,
মনের ফাঁকি বুঝ্‌লিনে—
শুধু, রাধা রাধা বলে আধা
(মন রে) সে সুরের দিশে পেলিনে—
হরি বল হরি বল হরি বল মন!

গরব ক'রে ভাব্‌ছ রে মন আসর জমাবে,
সুখের শিকলি দিয়ে পায়ে পাখী পড়াবে,
তোর মনের শিকলে গাঁট পড়েছে
তুই চোখ খুলে সে দেখ্‌লিনে—
ওরে যেমন এ মন, তেমন সে ধন,
তুই নয়ন মেলে দেখ্‌লিনে—
হরি বল হরি বল হরি বল মন!

রূপের কাজল পইরে চোখে
কর রূপ-নগরে বাস,
রূপের ফসল্ বুন্‌ছ রে মন
করছ রূপের চাষ;
সাঁই বলে রে পেলে রে মন
সেই অচিন রূপের খোঁজ,
এমন ছেঁড়া কথার জোড়া গাঁথায়
ও আউল! এমন পাগল হতিস্‌নে,
হরি বল হরি বল হরি বল মন!

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]   [বৈশাখ, ১৩২৪

বৌদ্ধধর্ম্ম

(১৮)

মানুষ ও রাজা

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খ্রীষ্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আলো হউক', অমনি আলো হইল। তিনি দেখিলেন, আলো উত্তম হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে। এ কথা লইয়াও আবার গোলমাল আছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই হইল—অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সবই সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল, ঈশ্বর তাহাই ভাঙ্গিয়া গড়িয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কোন কোন শাস্ত্রে লিখে:—ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। অমনি তিনি বহু হইয়া গেলেন। কোন কোন শাস্ত্রে বলে:—সমস্ত জগৎ 'অপ্রজ্ঞাত', 'অলক্ষণ' ছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ড দুই ভাগ হইল, এক ভাগে পৃথিবী ও আর এক ভাগে অন্তরীক্ষ হইল। দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন:—এক হইতেই সব হইয়াছে; কেহ বা বলেন:—দুইই ছিল, দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন :—তোমার সে কথায় কাজ কি? তুমি আপন চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? এই কথাই ভাব। আকাশ কোথা হইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কি? এমন কি, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। মহাসাঙ্ঘিকেরা কিন্তু, মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরে পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকদের মত যে অতি পুরাণ, তাহা আমরা পরে দেখাইব। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলেন :—অনাদিকাল হইতেই 'সম্বর্ত্ত' (প্রলয়) ও বিবর্ত্ত (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) 'আভাস্বর' নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি 'সত্ত্ব' 'আভাস্বর' হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহারা 'স্বয়ংপ্রভ', 'অন্তরীক্ষচর', 'মনোময়', 'প্রীতিভক্ষ', 'সুখস্থায়ী', ও 'কামচর' থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্য্যের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না। তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়ীঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কি রঙ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোন কোন জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙ্গুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভাল লাগিল; আবার চাকিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরও পাঁচ জনে চাকিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পুরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারী হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতিঃ লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না; সুতরাং চন্দ্রসূর্য্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল, দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইমত হইয়া গেল। এইরূপে অনেক দিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া

উঠে; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকে। ভাল রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং 'আমি বড়' 'তুমি ছোট' এই মান অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে সে ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভুঁই-পটপটি উঠিল—চারিদিকে যেন বেঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা, তাহার কি বর্ণ! কি রঙ! কি গন্ধ! কি আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌচাকের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীবসকল দুঃখে গাইয়া উঠিলেন—হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মত তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল; যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভাল থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভাল, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। 'আমি বড়', 'তুমি ছোট' এই মান অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মত হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান।

এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় আবার গজাইয়া উঠে; শুধু গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, বার ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না; কিন্তু ক্রমে দু'-একজন ভাবিল, দু'বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু'বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল, বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু'বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ বাড়িতে লাগিল। আর সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের

দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঢেলা, ঢিল, পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধূলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম্ম উপস্থিত হইল। অধর্ম্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কি ? একটি জীব আর একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়—এত বড় অন্যায়। ইহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেকদিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্ম্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে এক দিন দুই দিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্ম্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান ক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্ ক্ষেত, ঠিক করিয়া দিতে হইবে—এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার, এই ক্ষেত রামের, এই ক্ষেত শ্যামের। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল :—আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কি করিয়া চলিবে ? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক্ আর না দিক্, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি কর কি ? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ ?" "আর এরূপ করিব না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে ?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"দেখ ভাই, আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই, আমাকে মারিতেছে, কি অন্যায় ! কি অন্যায় ! এইরূপে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল :—আইস, আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান্, সকলের মন যোগাইয়া চলে,—এমন লোককে আমাদের ক্ষেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া

দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজী হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এই জন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটীতে মাটী হইয়া গেল। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেত-ওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।

মহাবস্তু অবদানে বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। সুতরাং মহাবস্তুর বর্ণনাটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

পালিত্রিপীটকেও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্‌গিঞ্‌ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে—গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বাশিষ্ঠ-ভারদ্বাজ, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

যে কেহ মহাবস্তুর অবদানের 'রাজবংশে আদি' অধ্যায়টি ও অগ্রণ্য সূত্রটি মন দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, মহাবস্তু দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন, সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে রাজা যে সকলের সম্মতি অনুসারে ক্ষেত আগলাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক। ক্ষেত ত ক্ষেতই আছে, তাহার আবার আগলান কি? সুতরাং ক্ষেত আগলাইবার কারণও বলার দরকার হয়। কেন ক্ষেত আগলাইবার দরকার হয়, বলিতে গেলে বলিতে হয়, লোকের দোষে। সে দোষ কি? কেমন করিয়া হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। মহাবস্তুতে এগুলি সব পর-পর বলা আছে। উহাতে বাজে কথা নাই। কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি বাজে কথা আছে। স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেল, ক্রমে বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম নগর পত্তন হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোন দরকারই দেখি না। তাই বলিতেছিলাম, মহাবস্তু দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারিবর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড় কি না, এ সকল কথায় মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেও বোধ হয়, মহাবস্তু আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। এখনকার দিনে ত অবস্থাটি ঠিক উল্টাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্ত্তি খৃঃ পঞ্চমশতকে বলিয়াছেন :—

গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্য কঃ।

"তুমি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি ?

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্রেমের সংশয়

সে কি গো বুঝিবে মোর নয়নে কেন যে লোর
ঝরিয়া পড়িছে দিন-যামী,
কেমনে জানিবে কালা মরমে সহি কি জ্বালা
কেমনে রয়েছি বাঁচি আমি।

আমি তো কখন সখি নয়নে হানিনি আঁখি
বলিনি কখনো কোন বাণী,
আমারি লাগি সে সখি ইতি উতি দেয় উঁকি
তোরাই করিস্ কানাকানি।

মম লাগি লয়ে ধেনু যমুনায় লয়ে বেণু
গাহে সে পীরিতি মাখা-গান,
তোরাই বলিস্ ওলো আমারি লাগিয়া কালো
বাঁশীতে কাঁদায় তার প্রাণ।

ওলো সখি খেয়ে মাথা আমারি মনের ব্যথা
তোরাই বলিস্ তার কাছে,
তারি লাগি দিন-নিশি আকুল বেদনে মিশি
পীরিতি-পিয়াসা হেথা আছে।

বলিস্ গোপনে ধীরে কালো যমুনার তীরে
"কলসী দিয়েছ তুলি যাহা,
এযে সে কলসী সুধু আমারি সখীর মধু
তোমারি লাগিয়া ভাসে তাহা।"

বলিস্ গোপনে কানে, আমারো সখীর প্রাণে
আকুল পীরিতি বহে বেগে—
নীলরূপে দিবা-নিশি কভু কাঁদি কভু হাসি
যমুনাতে তাহা রহে জেগে।

বলিস্ সজনি তারে দেখা নাহি দেই যারে
নয়ন ভরিয়া দেখি তাকে,
তারি মুখ-মধু হাসি হিয়ায় রয়েছে ভাসি
মম কামনার ফাঁকে ফাঁকে।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

পুরীর চিঠি

ভিক্টোরিয়া ক্লব,
পুরী,
শুক্রবার।

তোমার চিঠি পাইলাম। আজ এখানে বড় বাদ্‌লা। এ কয়দিনই অল্প স্বল্প ঝড়-বৃষ্টি চলিতেছে, আজ একেবারে চরম; আজ সূর্য্যদেবের মুখ মোটেই দেখা যায় নাই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আকাশ সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন।

কবিরা বলেন, আকাশে জলভরা মেঘ দেখিলে বিরহীদের বিরহব্যথা উথলিয়া উঠে। কথাটা বুঝি অনেকটা ঠিক। এই ক্লবে এখন হাইকোর্টের উকীল-প্রমুখ অনেক গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত যুবক আছেন; তাঁহারা রোজ তাশ, পাশা, দাবা ইত্যাদি খেলায় মত্ত থাকেন, ক্ষণে ক্ষণে হাসির রোল উঠিতে থাকে। আমি অবশ্য সকলের চেয়ে খাটো;—বিদ্যা বুদ্ধি মানে ধনে সকল রকমে খাটো; সুতরাং আমি দূরে একলা বসিয়া বা শুইয়া থাকি। আজ কিন্তু কাহারও কোন আমোদ-প্রমোদ নাই, সকলেই যেন আন্‌মনা, রুণুঝুণু-মুখে বসিয়া আছেন, যেন কাহার ভাবনা ভাবিয়া অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেছেন। এই বুড়ো বয়সে এই সুদূর প্রবাসে আমারও যে তোমার কথা মনে পরিতেছে না, তা' নয়; তাই আজ তোমাকে চিঠি লিখিতে বসি-লাম। এখানে আমার বন্ধুবান্ধবদের কথা ত কালকের চিঠিতে লিখিয়াছিলাম। আজ আমার কথা লিখি। এ কয়দিনে এখানে আমার স্বাস্থ্যের যথার্থ উপকার হইয়াছে। তুমি মনে করিও না যে, আমি একেবারে স্থূলকলেবর হইয়াছি। এ পোড়া চিম্‌ড়ে দেশে বুঝি সহজে মোটা হওয়াও যায় না। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের প্রকৃত উন্নতিসাধন হইয়াছে, ক্ষুধা ও হজমশক্তি বেশ বাড়িয়াছে। রং আমার কোন কালেই নিন্দনীয় নহে, এখানে আরও পাকা হইয়া দাঁড়া-ইয়াছে। সে দিন চিঠি লিখিবার সময় বাঁ হাতের কনুয়ের নীচে দু'ফোঁটা

কালি পড়িয়াছিল, এক মিনিট পরে ধুইতে গিয়া কালির দাগের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

পুরী, পুরী, পুরী, কতদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ছেলেবেলায় যখন স্বর্গীয়া পিতামহী ঠাকুরাণীর মুখে পুরীর গল্প শুনিতাম, কেমন করিয়া তিনি হাঁটাপথে গোযানে পুরীতে আসিয়াছিলেন, পান্থনিবাসে দস্যুভয়ে জাগিয়া রাত্রিযাপন করিতেন,"এসেছি সুদূর হ'তে, জগবন্ধু দেখা দাও আমারে" ইত্যাদি গায়িতে গায়িতে কেমন করিয়া বুচ্‌কি মাথায়, পায়ে ন্যাকড়া-বাঁধা ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী পদব্রজে পুরুষোত্তমের দুর্গমপথ অতিক্রম করিত,শুনিতাম। তখন মনে মনে পুরী সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম; বুঝিয়াছিলাম, পুরী আর যমের বাড়ী বড় তফাৎ নয়, প্রায় পাশাপাশি। পরে রেলওয়ে লাইন খোলার পর যখন দলে দলে বাবুদের পুরীতে শুভাগমন হইতে লাগিল, তখন মনে হইয়াছিল, বাবুদের ঐ এক ধরণ ঃ—আজ মধুপুর, কাল শিমুলতলা ঘাটশিলা, পরশু পুরী, তরশু রাঁচি ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর-পারের যাত্রী হইয়া জীবনের প্রান্তভাগে হঠাৎ পুরীতে আসিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, কেন পুরীর এত গৌরব, কেন লোকে পুরীধামের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, কেন পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এত দিন আসি নাই বলিয়া কতকটা অনুতাপও হইল।

পুরীর প্রধান ঐশ্বর্য্য, সমুদ্র ও শ্রীজগন্নাথের মন্দির। পঠদ্দশায় কেতাবে লবণাম্বুরাশির ফেনিল তরঙ্গমালার কথা পড়িয়াছিলাম, আব আজ সিন্ধুকূলে দাঁড়াইয়া বিমুগ্ধ-নেত্রে সেই উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিলাম। বিশাল দিগন্তব্যাপী অনন্ত আকাশ সুদূর দিগন্তে সুনীল অনন্ত বারিরাশির উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, সংক্ষুব্ধ-সাগরগর্ভোত্থিত পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, উন্মত্তের ন্যায় তীরাভিমুখে ছুটিতেছে, নাচিতেছে, প্রচণ্ডবেগে বেলাভূমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। কি ভীষণে সুন্দরে মিলন! "সাগর-সঙ্গীতে" পড়িয়াছ—

"আজিকে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমার গান;"

কবি সে গানে আত্মহারা। সত্য কথা বলিতে কি, আমি যখন পড়িয়া-ছিলাম, আমার মনে হইয়াছিল, ও সব কবিত্বের খেয়াল; সাগরের আবার

গান কি ? আজ বুঝিতে পারিতেছি, এই বিপুল জলধিবক্ষের অন্তরালে কি মহাপ্রাণ নিহিত, এই তরঙ্গলীলা কি ভাষাময়ী ; বুঝিতে পারিতেছি, এই তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এক দারুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস, এক প্রাণ-নিঙড়ান করুণগাথা বিজড়িত :—"ওগো, কোথায় তুমি, আমার চিরসুন্দর, আমার হৃদয়ের ধন ! আমি যে সারা জীবন ধরিয়া, সারা অনন্ত ধরিয়া, তোমার জন্য ছুটিতেছি, আছড়াইয়া মরিতেছি। আমার চিরবাঞ্ছিত ! আমায় কি দেখা দিবে না ?" নৈরাশ্যাহত বীচিমালা তীর হইতে আকুলপ্রাণে ফিরিয়া যাইতেছে ; আবার ছুটিয়া আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে ; আবার সেই করুণ গান।

চিঠি বড় হইয়া গেল। সাগরের কথা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের কথা—আমার মনের কথা—আরও অনেক বলিবার আছে। তোমাকে না জানাইলে আমার তৃপ্তি হয় না, আজ থাক, আবার লিখিব। আজ তবে আসি।

তোমারই
শ্রীহ——

প্রথম দর্শনে

প্রথম যখন দেখিনু তাহারে
কদম-তরুর মূলে,
কদম্বেরি সম শিহরি ফুটিল
পরাণ হৃদয়-কূলে !
যেন স্তিমিত জীবন পাইল চেতন
হ'ল তৃষায় আকুল প্রাণ,
সখি ! সারা দেহে আঁখি উঠিল ফুটিয়া
সে রূপ করিতে পান।

ডালে ডালে ডালে মুখর ঝঙ্কারে
সাড়া দিল প্রেমপিক,
যেন, শুখানো নিকুঞ্জে সহসা বসন্ত
আসিয়া মাতাল দিক্ ।
ওগো, চাহিল এ শির স্পর্শিবারে তার
রাতুল সে পা দুখানি,
সখি, চাহিল এ কর ধরিতে তাহার
শীতল কোমল পাণি ।
চাহিল এ বাহু বেড়িতে সে তনু
বনমালিকারি মত সখি !
চাহিল অধর—সে দুটি অধরে ;
আর আঁখির সে সুধা আঁখি ।
ওগো, সারা দেহ চাহে লুণ্ঠিতে সে দেহে
প্রাণের মাঝারে প্রাণ ;
সই ! আমার এ আমি আপনা হারায়ে
হ'তে তাহে সমাধান ।
ইথে কলঙ্কিনী হনু কি সজনি
বল্ তোরা দয়া করি,
ওরে, যাহার মুরতি মোরে, পূত প্রেমবীথী
দেখাইল সহচরী,—
তারে সঁপে প্রাণ রাধা হতমান
হয় ক্ষতি নাহি তায় ;
যদি জনমে জনমে সে শ্যামসুন্দরে
রাধা হৃদয়-নিভৃতে পায় ।
ওরে, ভরিবারে বারি শূন্য গাগরী
লইয়ে গেছিনু ঘাটে,
ভাসায়ে তাহারে ভরি আপনারে
এ কি লয়ে এনু বাটে !

উথলি উঠিছে অমিয়-লহরী
সারা সরমের কূলে,
অমিয়-প্রলেপ সারা দেহে মোর
অমিয়-লহরী তুলে।
ওগো, বাঁশীর সে স্বর শ্রবণ-অমিয়া
ভরিয়া রহেছে চিতে ;
সারা দেহ প্রাণে উছলে অমিয়া
চাহিছে বিলায়ে দিতে।
নয়ন অমিয়া সে নীল-বরণ
অমিয়া-অঞ্জন মাখি.
যে দিকেতে চাই শ্যামল নিরখি
শ্যামলে ভরেছে আঁখি।
হৃদয় অমিয়া কি জানি কি সই—
দানিল সে দূর হ'তে,
যার পানে চাই মুগ্ধ হয়ে যাই
ভাসিয়া অমিয়া-স্রোতে।
জগৎ অমিয়া অমিয়া-দরিয়া !
আজি লো কিশোরী রাধা,
কবি কহে হাসি আয় ব্রজবাসী
সবে বেঁটে নিই আধা আধা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নূতন বিজ্ঞান *

আমরা এত দিন ধরিয়া যে বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তাহা নিউটনের প্রতিষ্ঠিত। গতি-বিজ্ঞানের (Dynamics) সমস্তটাই Newtonএর আবিষ্কৃত কয়েকটা নিয়মকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহার উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। নিউটনের পর ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্নশাখায় অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু নিউটনের নিয়ম কয়টা, Newton's laws of Motion, Newton's law of Gravitation এগুলা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। কোনও বৈজ্ঞানিকেই এ পর্য্যন্ত ইহাদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটা পরীক্ষা Newtonএর এই নিয়মগুলার উপর বৈজ্ঞানিকদের মনে একটু সংশয় আনিয়াছে। আমরা সেই সম্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা করিব।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Science is measurement". বাস্তবিকই কোনও একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে হইলে measuerment ভিন্ন উপায় নাই। বিজ্ঞানে অবশ্য পরিমাণ করিবার বিষয় বা measurable quantity অনেক রকম আছে। মোটামুটি এইগুলাকে দুই রকম ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলা quantity invariant বা অপরিবর্ত্তনীয় আর কতকগুলা relative বা আপেক্ষিক invariant quantity, যেরূপ ভাবে যে অবস্থাতেই মাপা যাউক না কেন, তাহাদের কোনও কমবেশ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। যেমন ধরা যাক্ জড়দ্রব্যের mass বা inertia বা জড়ত্ব। জড়দ্রব্য স্থির থাকুক আর ছুটিয়া চলুক, উপরেই থাক আর নীচেই থাক, আমি যেরূপভাবেই পরীক্ষা করি না কেন, ইহার inertiaর কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। Newtonএর মতে বল বা forceএরও তাহাই। বল মাপিবার প্রণালী যেরূপই হউক না কেন, আমরা যেরূপ অবস্থাতে থাকিয়াই force মাপি না কেন, ফল সর্ব্বদা একই পাইব।

Relative বা আপেক্ষিকের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে গতির বেগ বা velocity। একটা চলন্ত জিনিষের গতির বেগ নির্ভর করে আমার নিজের অবস্থার উপর। যেমন ধরা যাক, আমি চলন্ত ট্রেণে বেঞ্চের উপর বসিয়া আছি—আর আমার সামনে একটা পিঁপড়া চলিয়াছে। আমি বলিব, পিঁপড়াটা চলিতেছে সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি—কিন্তু trainএর বাহিরে দাঁড়াইয়া কোন লোক যদি পিঁপড়াটাকে দেখি-

---

* দশম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনে বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

বার সুবিধা পায় ত সে বলিবে, পিঁপড়া চলিয়াছে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। আবার পৃথিবীর বাহিরে সূর্য্যের উপরে দাঁড়াইয়া কেহ যদি পিঁপড়াকে দেখে, সে বলিবে, পিঁপড়া আকাশের মধ্যে সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে পিঁপড়ার গতির বেগ বাস্তবিক কোনটা? আমার সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি, বাহিরের লোকের তুলনায় ঘণ্টায় ৪০ মাইল বা সেকেণ্ডে ১৮ ফুট আর সূর্য্যের সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে বিশ মাইল—কোন্‌টা ঠিক? আসলে দেখা যাইতেছে যে, যেটার সহিত তুলনা করিতেছি, সেইটাই যদি গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পিঁপড়ার গতির বেগ এ কথার কোনও অর্থই হয় না—আমার বলা উচিত, অমুক জিনিষের তুলনায় ইহার গতির বেগ এত। তবে এমন কোনও জিনিষ যদি পাই, যাহা একেবারে স্থির নিশ্চল,—তাহার সহিত তুলনায় বাস্তবিক গতিটা কি, বাহির করিতে পারি—কিন্তু স্থির কে? আমি ট্রেণে বসিয়া আছি, অতএব সচল—বাহিরে যে লোকটি আছে, সেও স্থির নহে, পৃথিবীর সহিত চলিয়াছে—এমন কি সূর্য্যও স্থির নহে—পৃথিবী সমেত সূর্য্য ছুটিয়া চলিয়াছে—তবে কাহার সহিত তুলনা করিব? হাঁ, একটা জিনিষ আছে, যাহা স্থির বটে। আমাদের চতুর্দ্দিকের আকাশটা একেবারে ফাঁকা শূন্য নহে—ইহা ইথর নামক একটা নিরেট দ্রব্যে পরিপূর্ণ। পদার্থবিদ্যা প্রায় দুই শতাব্দীর পরীক্ষা ও গবেষণায় স্থির করিয়াছিল যে, ইথর স্থির নিশ্চল। ইথরের মধ্যে নাড়া দিলে ঢেউ উঠিতে পারে অথবা ইথরে মোচড় দিলে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের লীলা প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু খানিকটা ইথরকে এক স্থল হইতে অন্য স্থলে বেগে চালনা করা যায় না। জড়দ্রব্য যথা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি ইথর-সমুদ্রে সন্তরণ দিতেছে; কিন্তু ইথর তথাপি স্থির-নিশ্চল হইয়া আছে। অতএব ইথরের সহিত তুলনায় যদি কোনও জিনিষের গতির বেগ বাহির করা যায়, তবে সেই হইল ঠিক গতির বেগ। তবে ইথরের সহিত তুলনা করিতে হইলে ইথরের উপরেই পরীক্ষা করা আবশ্যক—ইথরকে ধরা, ছোঁয়া, দেখা যায় না, ইথরের পরীক্ষা হইবে কিরূপে? উপায় আছে। আলোক ইথরে ঢেউ মাত্র—আলোক চলে ইথরের মধ্য দিয়া—সুতরাং আমি যদি চলন্ত জিনিষের উপর বসিয়া আলোর গতির বেগ বাহির করি,—তাহা হইলে আলোর গতির বেগ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকমের হইবে—এবং সেইগুলা তুলনা করিয়া আমি আমার ঠিক (absolute) গতির বেগ বুঝিতে পারিব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। স্থির জলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আঙুল নাড়িলে বা ঢিল ফেলিলে—আমার চারিদিকে গোল গোল ঢেউএর সারি ছুটিয়া চলিবে—ঢেউগুলা জলের উপর সেকেণ্ডে কয় ফুট বেগে ছুটিতেছে তাহা অনায়াসে বাহির করা যায়। এখন মনে করা যাক, জলের উপর আমি নৌকা করিয়া চলিয়াছি—আর ধরিয়া লউন, জলটা তবুও স্থির হইয়া

আছে। এখন যদি আমি নৌকার সামনের দিকে ঢিল ফেলিয়া জলে ঢেউ তুলি—তাহা হইলে কতকটা ঢেউ আমার দিকে ছুটিয়া আসিবে, কিন্তু আমার নৌকাও সেই দিকে যায় বলিয়া মনে হইবে যে, ঢেউগুলার গতির বেগ যেন বাড়িয়াছে—ঢেউএর গতির বেগ কতটা বাড়িল, তাহা হিসাব করিলে, নৌকা কি বেগে চলিতেছে, তাহা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রও মুখে মুখে হিসাব করিয়া বলিতে পারে। ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ এবং ইহা বুঝিবার জন্য লর্ড কেলভিন বা নিউটনের মাথার দরকার হয় না। ইথরেতেও ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটিতে পারে—স্থির জলের পরিবর্ত্তে আমাদের স্থির ইথর আছে—আর চলন্ত নৌকার পরিবর্ত্তে পৃথিবী আছে—ও ঢিল ফেলিয়া জলে ঢেউ তোলা অপেক্ষা দিয়াসালাইএর কাঠি জালিয়া ইথরে ঢেউ তোলা কিছুই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। সুতরাং যে মুখে পৃথিবী চলিতেছে, সে মুখে আলোর গতির বেগ পৃথিবীর তুলনায় যে একটু বাড়িবে, তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিলেই টের পাওয়া উচিত। অবশ্য, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ ইথর যদি পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলে, তবে আলোর গতির বেগের কোনও প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এই সম্বন্ধে, এই গতির বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরিবার জন্য অনেকে অনেক রকম পরীক্ষা করিয়াছিলেন—কিন্তু পরীক্ষার ফলগুলা উল্টাপাল্টা রকমের হইয়াছিল।

ঠিক বলিতে গেলে এ সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা হইয়াছিল Bradleyর দ্বারা। জ্যোতিষশাস্ত্রে aberration বলিয়া একটা কথা আছে। মনে করা যাক, আমি পৃথিবীতে বসিয়া দূরবীণ লাগাইয়া দূরবর্ত্তী একটা তারা লক্ষ্য করিতেছি। পৃথিবী দূরবীণ শুদ্ধ আমাকে লইয়া সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—উদ্দেশ্য, সূর্য্যের চারিদিকে এক বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসিবে। আমি যে লাইনে যাইতেছি, তারাটা সেই লাইনের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত। তারা হইতে আলো ছুটিয়া আসিতেছে, সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগে ও আমার টেলিস্কোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুতে পড়িতেছে—এদিকে টেলিস্কোপও ছুটিয়া চলিয়াছে পৃথিবীর সহিত ; সুতরাং দুইটা গতিতে মিলিয়া কি হইবে ? আলো আসিয়া টেলিস্কোপের ডগায় object glass বস্তু কাচে পড়িল—কিন্তু সেখান হইতে eye pieceএর ভিতর দিয়া আমার চক্ষুতে পঁহুছিতে পঁহুছিতে আমার telescopeটা পাশে একটু সরিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আলোটা যদি পড়ে object glassএর ঠিক মাঝখানে ত বাহির হইবার সময় eyepieceএর ঠিক মাঝখান দিয়া বাহির হইবে না, একটা পাশ দিয়া বাহির হইবে। কাজে কাজেই আমি তারাটাকে ঠিক তাহার স্বস্থানে দেখিব না—মনে হইবে, আলোটা যেন একটু সাম্নের দিক্ হইতে আসিতেছে—তারাটার একটু স্থানচ্যুতি ঘটিবে।

একটা পূরা বৎসর দিনের পরদিন তারাটার অবস্থিতি লক্ষ্য করিলে এই স্থানচ্যুতির পরিমাণ সহজেই ধরা পড়ে। এই যে স্থানচ্যুতি, ইহারই নাম Aberration. Bradley সাহেব বৎসরের পর বৎসর কয়েকটা তারার স্থানচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া পরে তাহার উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। স্থানচ্যুতি কতটা ঘটিবে, তাহা নির্ভর করে আলোর ও পৃথিবীর গতির বেগের উপর ও পৃথিবীর অবস্থানের উপর। আলোর বেগ বাড়িলে স্থানচ্যুতি কমিবে—পৃথিবীর বেগ বাড়িলে স্থানচ্যুতি বাড়িবে। পক্ষান্তরে আলোর বেগ যদি কোন উপায়ে কমান যায়, তাহা হইলে স্থানচ্যুতি বাড়িয়া যাইবে; আলোর বেগ কমাইবার একটা উপায় আছে—আলো জলের মধ্যে আস্তে চলে—সুতরাং সমস্ত দূরবীণটা যদি জলে ভর্ত্তি করা যায়,তাহা হইলে তারাটার স্থানচ্যুতি আরও বেশী বলিয়া বোধ হইবে। Englandএর Astronomer Royal রাজজ্যোতিষী Sir George Airy সাহেব এই পরীক্ষা করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরীক্ষায় তারকার স্থানচ্যুতির কোন পরিবর্ত্তনই ঘটিল না। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে একটা তুমুল কোলাহল পড়িয়া গেল—এ কি হইল? Bradly সাহেবের গণনায় ভুলচুক কিছুই নাই—তাঁহার গণনা পরীক্ষার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায় অর্থাৎ ইথর স্থির নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, পৃথিবী telescope শুদ্ধ ether ভেদ করিয়া চলিয়াছে—ইথরে নড়ন-চড়ন কিছুই হইতেছে না। কিন্তু তাহা হইলে Airy সাহেবের পরীক্ষায় স্থানচ্যুতি বাড়িল না কেন? এক দল বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন—তাঁহারা বলিলেন, তুমি telescope জলে ভর্ত্তি করিলে, এখন জলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অণু-পরমাণুর মাঝে মাঝে ইথর বিদ্যমান—জলটা কতকটা ইথরকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, কাজে কাজেই যখন telescope ছুটিতেছে, তখন জলের ভিতরকার ইথরটাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে। অবশ্য, টেলিস্কোপ যে বেগে ছুটিতেছে, জলের ভিতরকার ইথর ঠিক সেই বেগে ছুটিতেছে না। তাহা হইলে ত aberration মোটেই ঘটিত না। কারণ, আলো ইথরে ঢেউমাত্র—আর আলো টেলিস্কোপে প্রবেশ করার পর যদি ইহার ভিতরকার ইথরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, তবে আলোর গতিমুখের কোন পরিবর্ত্তনই বোধ হইবে না। সুতরাং উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে, জল কতকটা ইথরকে আটকাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়াছে বটে, তবে ইথর ঠিক পূর্ণবেগে চলে না, টেলিস্কোপের গতির বেগ হইতে কিছু কম বেগে। কাজে কাজেই জলের ভিতর আলোর গতির বেগ কমার দরুণ যেটুকু স্থানচ্যুতি বাড়া উচিত ছিল, জলের ভিতর ইথরটার গতি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ঠিক সেইটুকু কমিয়া গেল। সুতরাং মোটের উপর খালি টেলিস্কোপে যেটুকু স্থানচ্যুতি হয়, জলভরা টেলিস্কোপেও ঠিক সেইটুকু হয়, কোনও কমবেশ হয় না। উপরি-উক্ত দুইটা পরীক্ষায় তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইল যে, একটা বস্তু যদি etherএর মধ্য দিয়া

বেগে চলিতে থাকে, তাহা হইলে আশপাশের ইথরটা স্থির নিশ্চল থাকে—তবে বস্তুর ভিতরকার ইথরটা সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে পারে—ঠিক পূর্ণবেগে নহে—একটু কম বেগে। শেষোক্ত বিষয়টা Fizeau সাহেব পরীক্ষা করিয়াছিলেন—একটা বাঁকা নলের মধ্যে খানিকটা জলকে একদিকে বেগে চালাইয়া তিনি জলের মধ্যে আলোর গতির বেগ বাহির করিয়াছিলেন। দেখা গেল, যে মুখে জল চলে, সেই মুখে আলোর গতির বেগ বিপরীত মুখের চাইতে একটু বেশী—কারণ, আলোকবাহী ইথর জলের ভিতর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে।

এই সব পরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিক সমাজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—ইথরের সহিত জড়ের সম্বন্ধ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ইথরের প্রতিপত্তি যেটুকু ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এখন সেইটুকুর চাইতে প্রতিপত্তি দশ গুণ বাড়িয়া গেল।

কিন্তু কিছুদিন পরে আমেরিকায় এক অদ্ভুতকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক একটা পরীক্ষা করিয়া নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিলেন। তিনি বলিলেন, বেশ, মানিয়া লওয়া গেল, ইথর স্থির-নিশ্চল হইয়া আছে—আর পৃথিবী তাহার মধ্য দিয়া বেগে ছুটিতেছে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমমুখে সেকেণ্ডে কুড়ি মাইল বেগে—তাহা হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে আলোর গতির বেগ--পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমমুখে আলোর গতির বেগের চাইতে একটু বেশী হইবে। সাধারণতঃ আলোর গতির বেগ যদি হয় সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, পশ্চিমমুখে আলোর গতির বেগ সেকেণ্ডে ২ লক্ষ বিশ মাইল ও তাহার বিপরীত দিকে ১ শত ৯৯ হাজার ৯ শত ৮০ মাইল। ৪০ মাইলের তফাৎ। আমরা আগে জলের উপর নৌকার যে উদাহরণ দিয়াছি, তাহা হইতেই ব্যাপারটা বুঝা যাইবে। মোটের উপর আলোর পূর্ব্বপশ্চিমে যাতায়াতের সময়,উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াতের সময়ের চাইতে একটু বেশী লাগিবে। আর ইথরটা যদি নিশ্চল না হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলে, তা হইলে অবশ্য আলোর গতির বেগের কোনও কম-বেশ হইবে না। মাইকেলশন সাহেব বাস্তবিকই পরীক্ষা করিলেন—খুব সূক্ষ্মভাবে—এত সূক্ষ্ম যে,যদি দুই দিকে গতির বেগের তফাৎ ৪০ মাইল না হইয়া মাত্র ২ মাইল হয়, তা হইলেও ধরা পড়ার সম্ভাবনা। পরীক্ষার প্রতিপন্ন হইল যে, গতির বেগের কোনও তফাৎ নাই—অর্থাৎ মাইকেলশন সাহেবের পরীক্ষা বিশ্বাস করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, আলোকবাহী ইথর পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে রাখিবেন যে,আমাদের আগের পরীক্ষায় Bradley সাহেবের মতে পৃথিবীর চারিপার্শ্বস্থিত ইথর স্থির নিশ্চল, তাহা না হইলে aberration ব্যাপারের কোনও ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। কাজে কাজেই দুইটা পরীক্ষায় মিলিয়া একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হইল। এই সময়ে Birmingham বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের অধ্যক্ষ বিখ্যাত Sir Oliver Lodge বলিলেন, যাউক, অত গোলমালে আবশ্যক নাই—চলন্ত জড়দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ইথর চলে কি না, তাহা পৃথিবীর উপরেই একটা জড় দ্রব্যকে বেগে চালাইয়া তাহার কাছাকাছি আলোর গতির বেগ বাহির করিলেই গোল চুকিয়া যাইবে। একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণায়মান ষ্টীলের চাকৃতি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। মাইকেলশনের মতে ষ্টীলের কাছাকাছি ইথর চাকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে—অতএব যে মুখে চাকৃতি ঘুরিতেছে, সেই মুখে আলোর রশ্মি চালাইলে তাহার গতির বেগ তাহার বিপরীত দিক্‌ হইতে বেশী হইবে। পরীক্ষায় গতির বেগের কম-বেশীর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না—অর্থাৎ তাহা হইলে চাকৃতির কাছাকাছি ইথরটা স্থির রহিয়াছে! তিনটা পরীক্ষায় উল্টাপাল্টা রকমের ফল হইল। Bradley সাহেবের aberration পরীক্ষা বলে যে, ইথর স্থির-নিশ্চল—Michelson সাহেবের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, ইথর সচল, পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে—আবার Lodge সাহেবের পরীক্ষায় ঠিক হয় যে, ঘূর্ণায়মান ষ্টীলের চাকৃতির খুব কাছেরও ইথর স্থির নিথর হইয়া থাকে। একটা পরীক্ষা একটা জিনিষকে একবার সচল বলিতেছে—আবার তাহার পরবর্ত্তী পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, সে জিনিষটা অচল—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ রকম ব্যাপার ইতিপুর্ব্বে হইয়াছে কি না সন্দেহ। একটাকে সত্য বলিলে অপরটাকে মিথ্যা বলিতে হয়—অথচ পরীক্ষা দুইটা এমন সূক্ষ্মভাবে—এমন বড় বড় বৈজ্ঞানিকের দ্বারা হইয়াছিল যে, তাহার মধ্যে একটারও মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়। তবে সব পরীক্ষা কয়টা ভাল করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এক মাইকেলশন সাহেবের পরীক্ষা ছাড়া আর সকলেরই মতে ইথর স্থির। ইথরের মধ্য দিয়া যে কোন জিনিষই চলুক না কেন, ইথর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কেবল মাইকেলশন সাহেবের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পৃথিবীর কাছাকাছি ইথর পৃথিবীর সঙ্গে পূর্ণবেগে চলিয়াছে। সুতরাং মনে হয়, গণ্ডগোল যেটুকু আছে, তাহা ঐ পরীক্ষাটার মধ্যে অথবা যে সব যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে, (চিত্র) মাইকেলশন সাহেবের যন্ত্রের মধ্যে জটিলতা বিশেষ কিছুই নাই। একখানা পাথরের উপর চারমুখে চারখানা আয়না সাজাইয়া একটা আয়না হইতে আর একটা আয়নায় পূর্ব্বপশ্চিমমুখে আলো যাতায়াতের সময়ের সহিত উত্তর-দক্ষিণমুখে আলোর যাতায়াতের তুলনা করা হইয়াছিল। পৃথিবীর ইথর ভেদ করিয়া গতির দরুণ পূর্ব্বপশ্চিমে যাতায়াতের সময় উত্তরদক্ষিণে যাতায়াতের সময় হইতে একটু বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষায় সময়ের কমবেশ কিছুই হয় নাই।

ব্যাপারটা অনেকদিন বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা প্রহেলিকার মত ছিল। কিছুকাল পরে Lorentz ইহার একরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত কতকটা

এইরূপ। ইনি বলিলেন যে, তুমি আলোর যাতায়াতের সময় মাপিতেছ ঐ আয়না দু'খানার মধ্যে। কিন্তু ঐ আয়না দু'খানা যখন পূর্ব্বপশ্চিমমুখে রহিয়াছে ও পৃথিবীর সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবধান একটু কমিয়া গিয়াছে—তুমি যদি পাথরশুদ্ধ আয়না ঘুরাইয়া উত্তরদক্ষিণমুখে রাখ, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবধান একটু বাড়িয়া গিয়াছে—অর্থাৎ পূর্ব্বপশ্চিমে আয়না দু'খানার দূরত্ব যদি হয় এক ফুট, তাহা হইলে উত্তরদক্ষিণে রাখামাত্র উহাদের দূরত্ব এক ফুটের একটু কম হইয়া গেল। সুতরাং পূর্ব্বপশ্চিমে আলোর যাতায়াতের সময় যদিও একটু বেশী লাগার কথা, কিন্তু আয়না দু'খানা কাছাকাছি আসার দরুণ মোটের উপর উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব্বপশ্চিমে যাতায়াতের সময়ের কোনও তফাৎ হইতেছে না। শুধু পাথরশুদ্ধ আয়না কেন, যে কোন জিনিষই যদি ইথরের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলে, তা হইলে যে মুখে চলিবে, সেই মুখে সেটা একটু সঙ্কুচিত হইবে। এই সঙ্কোচন হওয়ার কারণ কতকটা এই রকম। দুইটা একই রকম বিদ্যুৎসংযুক্ত গোলক যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তা হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু ইহারা যদি পাশাপাশি ছুটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। আজকাল পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে পদার্থমাত্রেই বিদ্যুৎ-কণা দ্বারা গঠিত। সুতরাং পাথরশুদ্ধ আয়না যখন ছুটিতেছে, তখন বিদ্যুৎকণা-গুলা পরস্পরকে আকর্ষণ করার দরুণ পাথরটা সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

মাইকেলশন সাহেবের সহকারী মর্লে সাহেব এই ব্যাখ্যার কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বেশ, পাথরটা সঙ্কোচনের দরুণ আমি পরীক্ষায় কোনও ফলই পাইতেছি না—কিন্তু আমি যদি পাথরের পরিবর্ত্তে কাঠের উপর আয়না কয়টা রাখি, তাহা হইলে পরীক্ষার কিছু ফল আশা করা উচিত। কারণ, পাথরে যে পরিমাণে সঙ্কোচন হইবে, কাঠেতে ঠিক সেই পরিমাণে সঙ্কোচ না হওয়াই সম্ভব। আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা হইল—একদিকের আয়না দু'খানা এক টুক্‌রা পাইন কাঠের উপর রাখা হইল; কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়াও কোনও ফলই পাওয়া গেল না। আলোর যাতায়াতের সময় না বাড়িল, না কমিল। সম্প্রতি এই হ্রাসবৃদ্ধির সন্ধান না পাওয়ার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একেবারে কয়েকটা নূতন মতবাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মতবাদ যেমন কৌতূহলপ্রদ, তেমনই শিক্ষাজনক—এবং ইঁহারা এখন বিজ্ঞানকে এমন জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে, সেখানে ইহার সহিত দর্শন ও Metaphysicsএর সংঘর্ষ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। ইঁহাদের একজনের নাম Einstein ও অপরের নাম Minkowski।

Einsteinএর মতে চলন্ত বস্তুর যে শুধু সঙ্কোচন হয়, তাহা নহে। চলন্ত বস্তুর উপর

যদি কেহ বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সময়টাও বদলাইয়া যায়। অর্থাৎ আমি যে সময়টাকে এক সেকেণ্ড বলিব, তুমি যদি চলিষ্ণু হও ত, তুমি তাহাকে এক সেকেণ্ড বলিবে না। Einsteinএর মতবাদ বুঝিতে হইলে গোড়ায় Simultaneous বা দুইটা ঘটনা একসঙ্গে ঘটনার অর্থ আমরা কি বুঝি, তাহা দেখা যাক। এখানে একটা ঘটনা ঘটিল, আর একটা ঘটনা ওখানে একসঙ্গে ঘটিল, তাহা বুঝিবার কি উপায়? তুমি বলিবে, কেন, ঘড়ি দেখিয়া—আমার ঘড়িতে যদি ২-২৫ মিনিটে ঘটনাটা ঘটিয়া থাকে ও তোমার ঘড়িতেও যদি সেই সময়ই দেখ, তবে দুইটা ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিল বুঝিতে হইবে। তবে ঘড়ি দুইটা ঠিক মিল থাকা চাই। Einstienএর মতে ঘড়ি নিখুঁতরূপে মিলাইবার একমাত্র উপায় আলোর সঙ্কেত দ্বারা। যেমন মনে করুন, দূরে একজন লোক রহিয়াছেন—আমার ঘড়িতে যে মুহূর্ত্তে ১২টা বাজিল, সেই মুহূর্ত্তে একটা আয়নার সাহায্যে খানিকটা আলো প্রতিফলিত করিয়া আমার বন্ধুর কাছে ফেলিলাম। তিনি সেই মুহূর্ত্তে ঘড়ির কাঁটা ১২টার ঘরে সরাইয়া দিলেন—অবশ্য, আলো এখান হইতে ওখানে যাওয়ার সময়টুকু বাদ দিতে হইবে। Einstienএর মতে আমরা যেরূপেই ঘড়ি মিলাই না কেন, এই উপায়ের চাইতে ভাল উপায় বাহির করা অসম্ভব।

আর একটা উদাহরণ লইলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইবে। ধরুন, আমার বন্ধু সূর্য্যে রহিয়াছেন ও আমরা আমাদের ঘড়ি মিলাইতে ইচ্ছুক। পৃথিবী হইতে সূর্য্যে আলো পঁহুছিতে প্রায় ৮ মিনিট লাগে। আমার ঘড়িতে যাই ১২টা বাজিল, অমনি আমি আলোর সিগ্‌নল সূর্য্যে প্রেরণ করিলাম। আমার বন্ধু সিগ্‌নল যখন পাইলেন, তখন তাঁহার ঘড়িতে ১২-৮ মিঃ। তিনি আবার তখনই সিগ্‌নল করিলেন, আমার ঘড়িতে ১২-৮ মিঃ, আমি সেটা পাইলাম ১২-১৬ মিনিটে। আমি হিসাব করিয়া বুঝিলাম, হাঁ, আমাদের উভয়ের ঘড়ি দুইটা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়া আছে বটে—আমার সিগ্‌নল তিনি ১২-৮ মিঃ পাইয়াছেন, আবার তাঁহার সিগ্‌নল আমি ১২-১৬ মিঃ পাইলাম। আলোটা যাইতেও ঠিক ৮ মিনিট ও আসিতেও ঠিক ৮ মিনিট। ১৬ মিঃ —৮মিঃ=৮ মিনিট। তাঁহার ঘড়ি আমার ঘড়ির সহিত মিলিয়া না থাকিলে এইরূপ হইত না। ধর, বন্ধুর ঘড়ি ১ মিঃ ফাষ্ট যাইতেছে, তাহা হইলে আমার সিগ্‌নল, বন্ধু তাঁহার ঘড়ি অনুসারে পাইবেন ১২-৯ মিঃ। তিনি সিগ্‌নল করিলেন ১২-৯ মিঃ, আমি আমার ঘড়ি অনুসারে তাহা পাইলাম ১২-১৬ মিঃ অর্থাৎ তাহা হইলে আলোর যাইতে সময় লাগিল ৯ মিঃ ও আসিতে ৭ মিঃ—অসম্ভব। অতএব আমাদের ঘড়ি দুইটার ঠিক মিল নাই। Einsteinএর মতে ঘড়ি দুইটা মিলাইবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এখন হইতে তোমার কাছে আলো পঁহুছিতে তোমার ঘড়ি অনুসারে যে সময় লাগে—তোমার কাছ হইতে এখানে আলো আসিতে আমার ঘড়ি অনুসারে যদি ঠিক

সেই সময় লাগে, তবেই বলিব, আমাদের উভয়ের ঘড়ি মিলিয়া আছে বা Synchronous, Synchronismএর ইহাই সংজ্ঞা। অবশ্য ঘড়ি দুইটা যদি স্থির থাকে, তবে ইহাতে কোনও গোলই নাই। কিন্তু দুইটা ঘড়িই যদি ছুটিতে আরম্ভ করে, তবে ব্যাপারটাতে একটু গোলযোগ আসে ও Einsteinএর মতে মাইকেলশন সাহেবের পরীক্ষায় গোলযোগের সূত্রপাত এইখানেই।

আমাদের সৌরজগৎ বাস্তবিকই আকাশের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, Lyre নামক তারকাপুঞ্জের দিকে। মনে কর্‌য়া যাক, আমি ও আমার সূর্য্যস্থিত বন্ধু উভয়েই ছুটিয়াছি—পৃথিবী আগে আগে ও সূর্য্য তাহার পশ্চাতে। এখন যদি আমরা ঘড়ি মিলাইতে চেষ্টা করি, তা হইলে কি হইবে? আমি পৃথিবী হইতে সিগ্‌নল পাঠাইলাম —আলো সূর্য্যে পঁহুছিল ৮ মিনিটের একটু কমে—কারণ আলো সূর্য্যের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ধর, আলো পঁহুছিল ১২-৭ মিঃ—বন্ধু সিগ্‌নল করিলেন ১২-৭ মিনিটে। আলো আমার কাছে আসিতে ৮ মিনিটের একটু বেশী লাগিবে; কারণ আলো আমাকে ধরিতে আসিতেছে—আমি স্থির নহি, আমি পিছু হটিতেছি—ধর, লাগিল ৯ মিনিট। সুতরাং আমি সিগ্‌নল পাইলাম ৯ আর ৭তে ১৬ মিনিটে, কিন্তু ১৬ − ৭ = ৯ মিঃ, ৮ মিঃ নহে। অতএব আমি বলিলাম, বন্ধু, তোমার ঘড়ি ঠিক নয়, এক মিনিট শ্লো যাইতেছে। বন্ধু ঘড়ি এক মিনিট আগাইয়া দিলেন—এবার সিগ্‌নল পাঠাইতে যদিও সময় লাগিল ৭ মিনিট, কিন্তু বন্ধুর ঘড়ি এক মিনিট আগাইয়া আছে বলিয়া তিনি তাঁহার ঘড়ি অনুসারে পাইলেন ১২-৮ মিঃ। তিনি আমায় সিগ্‌নল করিলেন, আমি তাহা পাইলাম ১২-১৬ মিনিটে। এখন ১৬ − ৮ = ৮, অতএব আমরা ঠিক করিলাম, ঘড়ি দুইটা ঠিক মিলিয়া আছে। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের ঘড়িটা এক মিনিট ফাষ্ট যাইতেছে। কিন্তু এই যে-এক মিনিট ফাষ্ট যাওয়া, ইহা আমরা সূর্য্যে কিম্বা পৃথিবীতে বসিয়া কিছুতেই টের পাইব না। যদি সূর্য্য ও পৃথিবীর বাহিরে কোনও স্থির জায়গায় দাঁড়াইয়া উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাই, তাহা হইলেই বলিতে পারিব যে, সূর্য্যের ঘড়িটা পৃথিবীর ঘড়ি চাইতে এক মিনিট ফাষ্ট। অর্থাৎ ফলে দাঁড়াইতেছে যে, দুইটা ঘটনা একই সময়ে ঘটিল, এ কথার কোনও অর্থ হয় না। আমি চলন্ত জিনিষের উপর দাঁড়াইয়া আমার পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, এই দুইটি ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিল—আমার কাছে। কিন্তু তুমি যদি ঐ চলন্ত জিনিষের বাহিরে থাক, তুমি বলিবে, একটা আগে ঘটিল, একটা পরে ঘটিল, অর্থাৎ সময় জিনিষটা আমার পক্ষে যাহা, তোমার পক্ষে তাহা নহে—আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে, সময় absolute invariant, কিন্তু তাহা নহে, সময় relative আপেক্ষিক—ইহা নির্ভর করে পর্য্যবেক্ষকের গতির উপর।

Einsteinএর Simultaneity সম্বন্ধে এই কথাটা মানিয়া লইলে আমাদের অনেক

প্রচলিত ব্যাপারের ধারণা ওলট পালট হইয়া যায়। তাঁহার সব যুক্তিগুলা বলিবার সময় এখন নাই। কেবল তিনি ইহা হইতে যে মোটামুটি ফল পাইয়াছেন, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার মতে চলন্ত জিনিষের উপর যে কেবল সময়ের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নহে। দূরত্ব বা ব্যবধান, এরও পরিবর্ত্তন ঘটে। চলন্ত জিনিষের উপর unit of time বড় হইয়া যায়, unit of space ছোট হয়, আর আগে পিছে যদি ঘড়ি থাকে, তবে পিছের ঘড়িটা ফাষ্ট চলিতে আরম্ভ করে। ব্যাপারটা তাহা হইলে বুঝুন। আপনি যাই ট্রেণে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি আপনার ঘড়ি ভুল চলিতে আরম্ভ করিল। আগে টিক্ টিক্ করিয়া সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে যে শব্দ হইতেছিল, এখন সে শব্দ দুইটার অন্তর এক সেকেণ্ডের বেশী। যে মুখে ট্রেণ চলিতেছে, সেই মুখে আপনি যদি শুইয়া পড়েন, তাহা হইলে আপনি লম্বেও একটু ছোট হইয়া গেছেন। আর যদি engineচালকের কাছে ও guardএর কাছে ঘড়ি থাকে, তবে ট্রেণ চলিবামাত্র guardএর ঘড়ি engine-driverএর ঘড়ির চাইতে ফাষ্ট যাইতে আরম্ভ করিল। অবশ্য পরিবর্ত্তন যে হয়, তাহা অতি সামান্য, কোটি ভাগের এক ভাগও কিনা সন্দেহ। আর হইলেও তাহা ট্রেণে বসিয়া ধরিবার কোনও উপায় নাই। ট্রেণের আরোহীগণের পক্ষে ঐ সময়ই ঠিক। ট্রেণের বাহিরে দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে যদি বা ধরা পড়ে।

Enistein সাহেব আরও একটা অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। চলন্ত জিনিষের উপর সময়, space, mass সমস্তই বদলাইয়া যায় বটে, কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, যাহা invariant—গতি থাক আর নাই থাক, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সেটা হইতেছে, বিদ্যুৎ আর চুম্বকের লীলা Electromagnetic Phenomena। আমি স্থিরই থাকি, আর সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগেই ছুটিয়া চলি, আমার কাছে বিদ্যুৎ-চুম্বকঘটিত ব্যাপারগুলা একই ভাবে ঘটিবে, তাহাদের magnitudeএর কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। আলোক—ইথর, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের টানমাত্র। সুতরাং আমার কাছে আলোর গতির বেগের কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। আমি যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যন্ত্রসহযোগে আলোর গতির বেগ মাপি, তাহা হইলে দেখিব, আলো চলে সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল। আবার আমি নিজেই যদি সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে ছুটিতে আলোর বেগ নির্দ্ধারণ করি, তবে সেই একই ফল পাইব, সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল। সুতরাং মাইকেলশন সাহেব এত পরিশ্রম করিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নিরর্থক। পৃথিবীর গতির দরুণ আলোর গতির বেগের কোন দিকেই কোনও রকম ব্যতিক্রম হইবে না।

অবশ্য বিজ্ঞানবিভার পক্ষে Einstein সাহেবের এই মতবাদ মানিয়া লওয়া বাস্তবিকই

শক্ত। যদি ইথর বলিয়া বাস্তবিক একটা কিছু থাকে, আর আলোক যদি এই ইথরের ঢেউ হইতে প্রসূত হয়, তাহা হইলে আমার গতির দরুণ আলোর বেগের কম-বেশ টের পাওয়া নিশ্চয়ই উচিত। স্থির জলে ঢেউ তুলিয়া আমি যদি সেখান হইতে ছুটিয়া চলি, তাহা হইলে ঢেউটার আমার কাছে পঁহুছিতে একটু দেরী হইবে, এ ব্যাপারটা যেমন সত্য, আমার গতির জন্য অন্যের আমার কাছে পঁহুছিতে দেরী হওয়া সেটাও তেমনই সত্য। কিন্তু পরীক্ষায় এ সম্বন্ধে কোনও ফলই পাওয়া যায় না। হাঁ—তবে যদি বল যে, চলন্ত জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চারি পাশের ইথর ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহা হইলে পরীক্ষা কয়টার ব্যাখ্যা একরূপ হয় বটে; কিন্তু অপর দিকে আবার গোলমালের সূত্রপাত হয়। রাম উত্তর দিকে ছুটিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইথর উত্তর দিকে চলিয়াছে—শ্যাম দক্ষিণ দিকে যাইতেছে, তাহার সঙ্গের ইথর সেই দিকে চলিয়াছে। একই জিনিষ একই সময়ে দুইটি বিপরীত দিকে যাইতে পারে না। তবে কি রামের ইথর ও শ্যামের ইথর আলাদা? শুধু তাই কেন, তাহা হইলে বিশ্বের যাবতীয় অসংখ্য চলন্ত পদার্থের প্রত্যেকের এক একটা ইথর আছে। ইথর এক নহে—অসংখ্য? ইথর এক নহে, এ কথা বলাও যা, ইথর নাই, এ কথা বলাও তাহা। ইথর নাই। তাহা হইলে এত দিন ধরিয়া Young, Huygens, Fresnel ইত্যাদির অক্লান্ত চেষ্টায় আলোকের যে তরঙ্গমতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সমস্তই উল্টাইয়া যায়। Faraday, Maxwellএর চুম্বক ও বিদ্যুতের গবেষণা সমস্তই ভুল। আলোকের যে নূতন মতবাদ হইবে, তাহা কতকটা Newtonএর কণিকামতবাদ Corpuscular Theoryর মত। আলো ঢেউ নহে, ছোট ছোট 'quantum' বা শক্তির কণামাত্র—আর খুব সম্ভবতঃ, এই কণাগুলির mass ও inertia আছে। অর্থাৎ দীপ্তিমান্ বস্তু যখন রশ্মিরূপী শক্তি বিকীরণ করে, তখন তাহার ওজন কমিতেছে শক্তিরও ওজন আছে। রসায়ণ শাস্ত্রের গোড়াতেই শিক্ষা করি যে, Chemical action, রাসায়ণিক ক্রিয়ায় শক্তির যতই কেন আদান প্রদান হউক না, ওজনের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এখন মনে হয়, তা ঠিক নহে। শক্তির আদানপ্রদানে Massএর পরিবর্ত্তন হয়। এই পুরাণ পরীক্ষাটা আবার ভাল করিয়া করিবার সময় আসিয়াছে। এই সব নূতন মতবাদগুলা পুরাতনপন্থী বৈজ্ঞানিকের কাছে বাস্তবিকই ভয়াবহ—এত দিন ধরিয়া ঠেকিয়া ঠকিয়া বিজ্ঞান যাহা শিখিয়াছে, তাহার মধ্যে গোড়ায় গলদ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। মোট কথা, Newtonএর যে সব নিয়মগুলার উপর আধুনিক বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত—যাহার উপর নির্ভর করিয়া লাপ্লাস সমস্ত সৌরজগতের stability বা স্থায়ুতা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই Newtons laws of motion গুলারই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কে বলিল, "Mass is indepen-

dent of velocity ?" Inertia বা জড়ত্ব যে গতির বেগের উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যুৎসংযুক্ত কোনও বস্তু বেগে চলিলে দৃশ্যতঃ তাহার inertia বা জড়ত্ব বাড়িয়া যায়—আর জড়ের উপাদান যে বিদ্যুৎ নহে, তাহা আজকাল কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। জড় কি? এই প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হয় নাই, এমন মানুষ বোধ হয় সংসারে বিরল। বিজ্ঞান ও দর্শন দুই দিক হইতে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছে। দর্শনশাস্ত্র কি বলেন, জানি না; কিন্তু বিজ্ঞানের উত্তর শেষে এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায়। এই টেবিলটা কিসের তৈয়ারী? না, কাঠের। কাঠ কি দিয়া তৈয়ারী? খুব ছোট ছোট কাঠের কণা, অণু বা molecule দ্বারা। এই অণুগুলা পাশাপাশি সাজাইয়া প্রকাণ্ড কাঠ তৈয়ারী হইয়াছে। molecule বা অণুটা কিসের তৈয়ারী? কয়েকটা বিভিন্ন রকমের পরমাণু বা atom জড়াজড়ি করিয়া এক এক কণা কাঠ তৈয়ারী হইয়াছে। Atom কিসের তৈয়ারী? বাস্, আর উত্তর নাই। ঐ atomই হইল আসল জড়, মৌলিক পদার্থ বা Ultimate form of matter। ইহা আবার একটা নহে, প্রায় ৯২ রকম ultimate form আছে। ইহাদের পরস্পরের বিচিত্র সংমিশ্রণে, permutation combination এই জড় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। এত দিন রসায়ণ শাস্ত্র জড় কি, তাহার এই প্রকার উত্তর দিত। Atomএ আসিয়া ঠেকিয়া যাইয়া স্পষ্টই বলিত, atom কি, তাহা জানি না। সম্প্রতি পদার্থ-বিজ্ঞান আর একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। Atom কিসের তৈয়ারী, না বিদ্যুৎকণা বা electronএর দ্বারা। একটা atomএ কেবল কতকটা ধনাত্মক বা positive electricity মাঝে আছে ও তাহার চারি দিকে কয়েকটা ছোট ছোট ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা electron ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জড়ের আসল গুণ যে, জড়ত্ব বা inertia তাহা ঐ বিদ্যুৎকণাগুলায় আছে। বিদ্যুৎকণার যে জড়ত্ব, তাহা বিদ্যুৎকণা স্থির থাকিলে থাকে না; কিন্তু বিদ্যুৎকণা যাই ছুটিতে আরম্ভ করে, অমনি তাহার জড়ত্ব প্রকাশ পায়। বেগ যত বৃদ্ধি পায়, জড়ত্বও তত বাড়িতে থাকে, শেষে গতির বেগ যখন প্রায় আলোর গতির বেগের কাছাকাছি আসে, তখন ইহার জড়ত্ব inetria হঠাৎ অসীম infinite হইয়া যায়। অর্থাৎ কোনও বস্তুর গতির বেগ অলোর গতির বেগের চাইতে বেশী হইতে পারে না। এই সব ব্যাপারের কতকগুলা পরীক্ষিত সত্য। তাহা হইলে জড় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, জড় বেগে ভ্রাম্যমান্ বিদ্যুৎকণা মাত্র। Electron বা বিদ্যুৎকণা কি, তাহার উত্তর নাই। Electron যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাহার জড়ত্ব কিছুই অথবা প্রায় নাই। জড়ের যে আসল গুণ Resistance বা

Inetria, তাহা ঐ স্থির Electronএ পাইবে না। কিন্তু যাই Electron চলিতে আরম্ভ করিল, অমনি তাহাতে জড়ত্ব প্রকাশ পাইল। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইতেছে, গতি বা movementই জড়ের প্রাণ। আমার হাতের এই কাগজটা বেগে ঘূর্ণায়মান বিদ্যুৎকণাদ্বারা তৈয়ারী, কোনও উপায়ে উহাদের ঘূর্ণন বাড়াও, ইহার জড়ত্ব বাড়িবে, ঘূর্ণন কমাও, জড়ত্ব কমিবে। জড় অবিনশ্বর matter is indestructible এই কথা এখন খাটে না।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

অনাহূত

আমার বিজন কুটীর-দ্বারে
কে তুমি সহসা দীনের মতন
দাঁড়ালে এমন করে ?

তরুণ অরুণ উদয়ের সনে
সাজায়ে কুটীর পূজা আয়োজনে
ছিলাম বসিয়া চাহি পথপানে
কেহ ত' দেখেনি ফিরে,
কে তুমি সহসা দীনের মতন
দাঁড়ালে আমার দ্বারে ?

বেদনা-মথিত হৃদিখানি লয়ে ব্যর্থ দিবস শেষে
আনমনে আমি আছি যে বসিয়া মুক্ত দুয়ার পাশে।

নাহি এবে কোন পূজা-উপচার ;
সাঁজের প্রদীপ জ্বালি নাই আর,
নিরাশার গান শুধু বারে বার
বাজিছে হৃদয়-তারে,
হেনকালে আসি কে তুমি পথিক
দাঁড়ালে কুটীর ধারে ?

"কেন রে অবোধ এমন করিয়া
নিরাশার গান গেয়ে
অকূল সংসারে চলিয়াছ তব
জীবন-তরণী বেয়ে ?
রুদ্ধ রাখিয়া হৃদয়ের দ্বার
লভিবারে চাও প্রেম-উপহার
জিনিবারে চাও হৃদিখানি কার
বাহিরের পূজা দিয়ে !
বৃথায় কেন গো যাপিছ দিবস
নিরাশার গান গেয়ে ?

"আমি কি চাহি বাহিরের পূজা চন্দন-ফুলদল,
সন্ধ্যারতির আলোকমালা, পূত গঙ্গার জল ?
অনাহূত আমি প্রেম লভিবারে
আসিয়াছি তব বিজন কুটীরে
পূর্ণ করিয়া লব আজি ভ'রে
শূন্য বক্ষঃস্থল ;
আমি ত চাহি না বাহিরের পূজা
চন্দন-ফুলদল ।"

শ্রীবাণী দেবী ।

ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি ও ভারতীয় করুণরস

জিনিষ গড়িতে যেমন আনন্দ, ভাঙ্গিতেও ঠিক তেমনি আনন্দ। শুধু গড়ার জন্য যেমন গড়া, শুধু ভাঙ্গার জন্যই তেমনি ভাঙ্গা—ইহাতেই আনন্দ। কোন উদ্দেশ্য, কোন ফল বা অফল সম্মুখে রাখিয়া এ আনন্দ নহে, এ আনন্দ অহৈতুক নিরপেক্ষ। এই ভাঙ্গনের পদ্ধতিটি, তাহার মধ্যে যে রসটি, তাহা লইয়া হইতেছে ট্রাজেডি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে কিরূপ চুরমার হইয়া যাইতেছে, ঘটনা ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইয়া কিরূপে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিতেছে, জগতের মধ্যে, মানুষের মধ্যে রুদ্রের সে তাণ্ডব নৃত্য তাহাই চিত্রিত করিতেছে ট্রাজেডি। বস্তুর ভাঙ্গনের অন্তরালে একটা গড়নের দিক্ আছে কি না, সংঘর্ষের পশ্চাতে শান্তি, বিরহের পরে মিলন, দুঃখের অবসানে সুখ আছে কি না বা থাকা উচিত কি না—এ প্রশ্ন না তুলিয়া, তাহার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া শুধু ভাঙ্গন, শুধু সংঘর্ষ, শুধু বিরহ, শুধু দুঃখের খেলাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়া ট্রাজেডি অপরূপ রস সৃজন করিয়া চলে।

এই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি বলিয়া জিনিষটি যে ছিল, এমন বোধ হয় না। ভারতীয় কবিবৃন্দ এই বৈপরীত্যের, এই ভাঙ্গনের দিক্‌টা যে জানিতেন না, তাহা নয়। বিশেষরূপেই জানিতেন—ধ্বংসের মধ্যে, বিচ্ছেদের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত, তাহার মহনীয় চিত্র আমরা যথাতথা পাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছিল সর্ব্বদাই গড়নের, মিলনের, শান্তির রেখা টানিয়া ভাঙ্গনের খেলাকে সুবলয়িত করিয়া ধরা। দুঃখের কষ্টের চিত্র অঙ্কিত কর, যত মর্ম্মন্তুদ করিয়া চিত্রিত করিতে পার কর, কিন্তু সমাপ্তিতে চাই সুখ, স্বস্তি—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভারতীয় সাহিত্যে পাই করুণরস, কিন্তু তাহা ট্রাজেডিতে পরিণত হয় নাই। পাশ্চাত্যও যে কোন দিন ঐ ভারতীয় ভাবের ভাবুক হয় নাই, তাহা নয়। ঐ কথাটিই মনে রাখিয়া লাতিন আলঙ্কারিক কাব্যরচনার সূত্র দিয়াছেন, Tragicum principium et comicum finem, কিন্তু বস্তুতঃ ইউরোপের কবিপ্রাণে এ ভাবটি স্থান পায় নাই। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যের নাম দিয়াছেন Divine Comedy, ইহার শেষ মিলনাত্মক। প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু এ মহাকাব্য ট্রাজেডির রসেই ভরপূর। এ কমেডির অর্থ দুঃখেরই মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, জিহোবার ভ্রূকুটির মধ্যেই যে হাস্যরেখা লুক্কায়িত। দান্তের সমস্ত কাব্যটি জীবনের ট্রাজেডি প্রতিফলিত করিতেছে Inferno'র সেই বিখ্যাত ছত্রে—

Lasciate ogni speıranza voi ch'entrat•.

প্রথমে বিয়োগের দৃশ্য, কিন্তু অন্তিমে মিলনের দৃশ্য—ভারতীয় কবি-প্রেরণা ইহাই চাহিয়াছে। কারণ কি? মানুষ সাধারণতঃ ইহাই চাহে। দুঃখের মধ্যে আছে এক অস্বস্তি, এক অতৃপ্তি—তাহার মধ্যেই সব শেষ হইলে হৃদয়ে কেমন এক ফাঁক রহিয়া যায়, মনের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া যায়—ততঃ কিম্? এই প্রশ্নটুকু বুকে রাখিয়া অস্বস্তির ভারে পীড়িত হইয়া মানুষের পক্ষে থাকা দুরূহ। শেষ অর্থই ত মীমাংসা, তৃপ্তি—জিজ্ঞাসার মীমাংসা, প্রাণের তৃপ্তি। তাই কপালকুণ্ডলার পরিণাম জানিতে আমরা উৎসুক, পরিশিষ্ট লিখিয়া তাহার একটা পরিশেষ না পাইলে প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহাই হউক, কবিও যে প্রাণের এই অস্বস্তি, এই অতৃপ্তি, এই জিজ্ঞাসা-নিরসনের জন্যই যে অন্তিমে মিলনের, সুখের, হাস্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নয়। উহা অপেক্ষা গভীরতর কারণ আছে। কাব্যের লক্ষ্য ও কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত সে কারণ বিজড়িত।

ভারতীয় কবিগণ কাব্যসৃষ্টিকেও আধ্যাত্মিকতা অথবা মানুষের পক্ষে উচ্চতর কল্যাণকর একটা কিছুর সহিত মিলাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বলিয়াছেন—"সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্"। মানুষের মধ্যে মহত্তর বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ জীবনের খণ্ডতা, দ্বন্দ্ব, আবিলতার অতীতে আর একটা অলৌকিক প্রতিষ্ঠানের বিমলতা, শান্তি, পূর্ণতাকে গোচর করিতে হইবে.—ইহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য মানুষের অন্তরে একটা দিব্য চেতনা, একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, একটা শান্তির সুষমা উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবে। সাহিত্যও হইবে শিক্ষার ও সাধনার উপায়। মানুষের মন, মানুষের প্রাণ, মানুষের প্রবৃত্তিনিচয় এরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, এমন ছাঁচে ঢালিতে হইবে, এমন একটা সুরে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন মহৎ জীবনের উচ্চতর বৃত্তির একটা দিব্যালোকেরই ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবার অবাধ অবসর পায়। সেই জন্য ভারতীয় সাহিত্য জগৎকে কেবলই নিরানন্দে, দ্বন্দ্বে ভরিয়া, মানুষকে কেবলই অভিশাপ-গ্রস্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন নাই। জগতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, ক্লেদ অতিমাত্রই আছে—সাহিত্যের মধ্যেও তাহাকে আবার টানিয়া লইব কেন? সাহিত্য জগতের প্রতিকৃতিমাত্র হইবে কেন? জগতের যে অভাব, মানুষের যে দৈন্য, তাহাকে পূর্ণতা ও ঋদ্ধির মধ্যে ধরিয়া দেখাইয়াই সাহিত্যের সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন, "কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজৎ"। কবি দেখাইবে দিব্য রূপ। তাই ভারতীয় কবি স্থূল-জগতের দ্বন্দ্ব, নিরানন্দ, নশ্বরতাকে মিলনে, সুখে, স্থিতির মধ্যে সকল অভিশাপকে দিব্যবরে মণ্ডিত করিয়া পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। কটুর মধ্যে রস আছে, প্রবৃত্তির তৃপ্তিহীন সমাপ্তিহীন হাহাকারের মধ্যেও আনন্দ

আছে। কিন্তু তাহা বিপরীত রস, আসুরিক আনন্দ। ভারতীয় কবি এই যে বিকার, বিপর্য্যয়, তাহাকেই একান্ত করিয়া ধরেন নাই, তাহারই প্রভাব মানুষের মনে আঁকিয়া দিতে চাহেন নাই। জিনিষকে ঋজু করিয়া স্থাপন করিয়া মানুষের মনে একটা দিব্য আনন্দই ফুটাইতে চাহিয়াছেন। শকুন্তলা কেন 'ওথেলো'র আদর্শে, কাদম্বরী কেন Bride of Lammermoorএর আদর্শে রচিত হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ এইখানে।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, নীতিশিক্ষাদানই ভারতীয় কাব্যের লক্ষ্য ছিল। এমনও নয় যে, ভারতীয় কবিবৃন্দের সর্ব্বদা সজ্ঞান চেষ্টা ছিল, কি করিয়া মানুষের মধ্যে মার্জ্জিত রুচি, শোভনতর বৃত্তি, পরিশুদ্ধ অনুভূতি, মহনীয় কল্যাণকর কিছু প্রস্ফুটিত করা যায়। এই সকল ভাব বা আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা কাব্যরচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। কোন মহা কবিই এইরূপে কাব্য সৃষ্টি করেন না। কাব্য আত্মানুভূতির সহজ পরিস্ফূর্ত্তি। আমরা বলিতে চাই, ভারতীয় এই কবি-আত্মা একটি বিশেষ ধাতুতে গঠিত, একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া উহার নৈসর্গিক অভিব্যক্তি। এই ধাতু, এই প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের সে অতিপ্রাকৃতের সমুচ্চের প্রতি টান, বিশুদ্ধ বিরজ একেরই প্রতি অনুরাগ, তাহার সে নিঃশ্রেয়সমুখী প্রেরণার জোরে। এই প্রকৃতি হইতেছে দৈবীপ্রকৃতি, উহা সত্ত্বগুণপ্রধান। এই ভারতীয় কলাসৃষ্টি মূলতঃ হইতেছে শান্তরসাস্পদ, উহা সর্ব্বোপরি চায় ধ্যানের নিস্তব্ধতা, প্রসন্নতা। মিলনে হাস্যে উহার পর্য্যবসান। বুদ্ধমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখ, নটরাজ-রুদ্রের তাণ্ডব-নৃত্য--তাহার মধ্যে অপার্থিব শান্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতিপদবিক্ষেপে সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরালে নবসৃষ্টির শতদল যেন বিকশিত হইতেছে। অন্য পক্ষে ইউরোপীয় কবিপ্রকৃতি এক আসুরিক তীক্ষ্ণতায় ভরা, উহা প্রধানতঃ রজোগুণের খেলা। তাই গতি, সংঘর্ষ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার আনন্দ। ইউরোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততখানি চায় না, সামঞ্জস্যই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। নির্ব্বাণের শান্তি সে চায় না, সে চায় প্রকাশের বৈচিত্র্যের ছন্দোময় দ্বন্দ্ব। এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত জ্ঞানের প্রশান্ত কিরণলেখা, ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্ম্মের বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদাসীন, ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রতিভাত 'শান্তং শিবং' সৃষ্টির ভরাটের দিক্‌টি। ইউরোপীয় কবি কর্ম্মজগতে স্থাপিত কর্ম্মীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—সংঘর্ষের, ভাঙ্গনের ভঙ্গিমাটিই তাঁহার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাই মিলনের রসে ভারতীয় কবিপ্রাণ আপনাকে এমন মহনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমুদায়।

ভারতে বিরহী কবির সকল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নৈরাশ্যেরও অন্তরে রহিয়াছে কেমন একটি শান্তরসের ছায়া, একটি ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, নির্ভরতা, কেমন একটি দিব্য প্রসন্নতা, আমরা যেমন বলিয়াছি, একটা স্নিগ্ধ সাত্বিকতা। দুঃখ-দ্বন্দ্ব সেখানে দুঃখষে দ্বন্দ্বষে, আপন অবিমিশ্রিত স্বরূপসত্তায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। করুণরসের অবতার বাল্মীকি বলিতে পারিয়াছেন—

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেহস্তি করুণাময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥"

করুণরসের ইহা পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শেক্সপীয়রের সেই —

Absent the from felicity a while
And in this harsh world draw thy treath in pain—

ট্রাজেডির ইহা পূর্ণ প্রতিমা। সেক্সপীয়রের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটি আভাস পাই, সমস্ত জগৎখানি যেন খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মানুষের সমস্ত সত্তাটি শতধা বিদীর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। অরফিউ'র (orpheus) দেহের ন্যায় সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শুধু একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিক্‌প্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধার করিবার কোনই উপায় নাই, কোন প্রয়োজনও যেন নাই। একটা মহা অবসানের ঘনঘোরে নিরর্থক হইয়া পড়াই যেন সৃষ্টির সার্থকতা।

ভারতীয় নাট্যকার—কালিদাস বা ভবভূতি—কিরূপে করুণরসটি সৃজন করিয়া তুলিয়াছেন, কি প্রণালীতে বিরহের লীলাটি ক্রমপ্রকট করিয়া ধরিয়াছেন এবং সে প্রণালীর সহজ গতি অনুসরণ করিয়া বিরহকে মিলনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বাস্তিপূর্ণ করিয়াছেন; আর ইউরোপীয় নাট্যকার—সেক্সপীয়রের বা সোফোক্লি (sophocles) কিরূপে কোন্ প্রণালীতে বিরহের বিচ্ছেদের খেলাকেই পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন, পরিশেষে একটা বিরাট বিধ্বংসের মধ্যে সব নিঃশেষ করিয়াছেন, এই দুইটি চিত্র অতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রাচ্য কবি করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন, বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন, পরিণামের শান্তি ও মিলনকে গভীরতরভাবে অনুভব করাইবার জন্য। ঐক্যের প্রাণটি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই তাহার আগে ভেদের খেলাটি দেখাইয়া লইয়াছেন। সংসারের বিচিত্র বহুভঙ্গিম দ্বন্দ্বভোগ যে কতখানি করিয়াছে, অন্তিমে সন্ন্যাসের সমরস সে ততই তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আদিপর্ব্ব, যুদ্ধপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব—

ইহাই জীবনের ক্রম। শিল্পে রসসৃষ্টিরও এই একই ক্রম। ইউরোপ জীবনকে এ ভাবে দেখে নাই। দ্বন্দ্ব হইতে জীবনের উদ্ভব, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া দ্বন্দ্বেই উহার পর্য্যবসান। ভারতীয় প্রতিভা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া গড়ার দিক্‌টা দেখাইয়াছে, ইউরোপীয় প্রতিভা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভাঙ্গনের দিক্‌টাই দেখাইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ভারতের উপলব্ধিটিই বোধ হয় পূর্ণতর সত্য। কিন্তু কবির লক্ষ্য কেবল সেই সত্যটিই নহে—যাহা পূর্ণতম, ব্যাপকতম। সত্যের ব্যাপ্তি (comprehensiveness) তিনি ততখানি দেখাইতে চাহেন না, যতখানি তিনি দেখাইতে চাহেন, তাহার নিগূঢ় অন্তর্ভাবটি (intensiveness)। বস্তুতঃ দার্শনিকেরই চেষ্টা হইতেছে বাহির করা সেই এক সত্যটি, কবি কিন্তু দেখেন বহু সত্য, এক সত্যেরই যে নানা দিক্‌টি—নানা ভাব, নানা রস, নানা রূপ। কবি যখন দৃষ্টিপাত করেন দুঃখ দ্বন্দ্ব বিনাশের উপর—তখন তিনি যদি ইহাদের যে স্ব স্ব ধর্ম্ম, স্ব স্ব গুণ, কেবল তাহাই পরিলক্ষিত করেন, তাহারই সত্য আত্মা, নিভাঁজ সত্তাটি ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাহাতেই তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ সার্থকতা।

ইউরোপীয় কবি এই যে ভাঙ্গনের দিক্‌টি দেখাইয়াছেন, এই যে বিয়োগাত্মক রসসৃষ্টি করিয়াছেন,তাই তাহার মধ্যে আছে কেমন একটা তীব্রতা, একটা ঝাঁঝ, একটা ঝাল। ইউরোপীয় কাব্যজগৎ হইতে যাঁহারা হঠাৎ ভারতীয় কাব্য-জগতের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তাঁহারা বোধ করেন কেমন এক স্বাদের অভাব,—অতিমাত্র সুন্দর মনোহর হইয়াও অথবা সেই জন্যই কেমন একটা নীরসতায় মাখা। ভারতীয় কাব্য নাটকাদি কখন ইউরোপীয়দিগের নিকট যে artificial নাম পায়, তাহার কারণও ঐখানে। অন্য পক্ষে ভারতীয় কাব্যরসে যাঁহারা বর্দ্ধিত, তাঁহারা ইউরোপীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার দ্বন্দ্ব বিরোধ ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখিয়া সহজেই যে বলিয়া উঠিবেন—কি বর্ব্বরতা, কি প্রাকৃতজনসুলভ মাদকতা, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভারতীয় কবি artificial নহেন, ইউরোপীয় কবিও বর্ব্বর নহেন। দুইজনেই artistic। তবে দুই রকম আর্ট, দুই রকম রসসৃজন।

দ্বন্দ্বের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে, জীবনের বিষময় পরিণামের মধ্যে যে আনন্দ লুক্কায়িত, তাহা প্রাকৃতজনের উপলব্ধি নহে, তাহা কবিদৃষ্টিরই উপলব্ধি। হইতে পারে, এ দৃষ্টি ইহমুখী, কিন্তু তাই বলিয়া উহা কম সুন্দর—কম সত্য নহে। ইউরোপের এই প্রতীতিকে ভারতবর্ষ একান্ত করিয়া লয় নাই। সে চাহিয়াছে সমুদ্রের যে শান্তি, যে সামঞ্জস্য, যে মিলন, তাহাই সুষমায় ভরিয়া সকল গড়িতে, সাজাইতে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই যে কাব্যহিসাবে উহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহাও আবার নয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কবি দৈবীপ্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান, ইউরোপীয় কবি

আসুরীপ্রকৃতি রজঃপ্রধান। ইহাতে একটু ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সত্বপ্রধান হইলেই কবিত্ব হিসাবে তাহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, আর রজঃপ্রধান হইলেই যে তাহা হীনতর হইয়া পড়িবে, এ কথা সত্য নয়। কবির যে দৃষ্টি, তাহা ত্রিগুণাতীত। উহা ত্রিগুণাতীত, সেই জন্যই যে কোন গুণের প্রেরণা লইয়া সে সৃষ্টি করিতে পারে। কবি সিদ্ধপুরুষ, তাই তিনি দিব্যভাব বা আসুরীভাব উভয়ের মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করিতে পারেন। কবিত্বের দিক্ হইতে, রসসৃষ্টির দিক্ হইতে তাহাতে কোন অঙ্গহানি হইবে না।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

কমলের দুঃখ

(সুধীর—কমল)

ভায়া হে,

তোমার কবিতার মত মোহকরী ভাষাটা পড়ে আমি ত অনেকটা ধাত ছাড়্‌ব ছাড়্‌ব হয়ে এসেছিলাম—ভাগ্যিস্ আমার কাল-গিন্নীর রূপের সঙ্গে গলার ঝঙ্কার বেজে উঠেছিল, নইলে কি হ'ত, তা জানি নে। বা ভাই বেশ,—ওঃ ! রূপ কি মজার জিনিষ, দেখেছ কি অমনি পতঙ্গ হবার সাধ। অমরের চিঠিতে তোমার ওই রূপের মহিমে পড়ে মনে হল, ও কান্তি-পুষ্টির মুখে আগুন, আমি ওই আগুনেই ঝাঁপ দিই, আর যেই শুন্‌লাম, আমার কালশশী বাঁশী বাজিয়েছে—আর ঘরে রইতে নারি ! ভায়া হে ! বিরহের জ্বালায় বাঙ্‌লা দেশ যদি কবিতা লিখ্‌তে না পেত—তা হলে সব পেট ফুলে জয়ঢাক হত। আচ্ছা, তুমি ত ভাই আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে শ্রীচরণের নূপুর গুঞ্জন ভ্রমর-ঝঙ্কারামৃতের মত শুনতে পাও, কিন্তু মনু ওর কি ব্যবস্থা বলে গেছে তা জান—তুষানলে জীবন যৌবন সমর্পণ, ও পতঙ্গ যেমতি নয়—একেবারে গুমে গুমে ছেঁচ্‌কিপোড়া। বাবা, ভাগ্যিস্ আমাদের মন-প্রাণ-জীবন যৌবন সব খরচা করে ফেলা গেছে—নইলে আবার রূপের হাটে বেচা কেনার ফাঁপরে পড়ে হাটে হাটে ঘুরে বেড়াতে হতো। সে দায় হতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। মন বড় পাজি জাত, জুড়্‌লে ভাঙে না, ভাঙ্‌লে আর জোড়া লাগে না। ও মন না থাকাই ভাল।

গিন্নী সে দিন ওই চিঠি পড়ে রেগেই অস্থির—আমায় ত নথ নেড়ে একচোট মুখ-ঝামটা দিয়ে গেল—বলে, আমার গা নিস্‌পিস্ করছে, একবার তার সঙ্গে দেখা হলে হয়—আমি ত নিবাত, নিষ্কম্প প্রদীপের মত—একেবারে চুপ। শেষ বল্‌লাম, সাক্ষী নেই,—কে সনাক্ত করবে, তোমার এ মামলায় হার হবে, সে বলে—কিসের এ মামলা, এ আইন বাঙ্‌লার মেয়ের হাতে - এ তোমার বিলিতী আইন নয়,এ ঘরের কথা —এ রাজত্ব বাঙলার মেয়ের—তোমার কি চোক আছে, চশমা ভাল করে দাও—আমি বল্লাম ভাল—শাম্‌লা বদল কর,আমি আমলা হচ্ছি। সে বলে,সীতার কি বিরহ হয় নি — দময়ন্তীর কি বিরহ হয় নি —বেহুলার কি বিরহ হয় নি—সে কি ওই রকম—সে মানুষের মত। রামচন্দ্র বিরহে কবিতা লেখে নি—সতীর বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হয়েছিল—এখন

বিরহ হয় গাছের পাতায়, একগাছা ছেঁড়া চুলে,পাছাপাড়ের আঁচলার কোণের ছেঁড়ায়, বাঙ্‌লার সে বিরহের ভাব আর নেই—এখন মিলনে বাঙ্‌লা ভোর হয়েছে—সে ত্রিভুবন বিরহে তন্ময় হলে বিরহ-কবিতার এমন জাত-মারা যেত না। দেখ্‌লাম, কথাটা ঠিক,—রণে ভঙ্গ দিলাম, কাল মুখের বিরহই সার কর্‌লাম। দেশশুদ্ধই যখন বিরহে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে, তখন আমি ত কা কথা! যাক্ তোমার আসাটা কবে হচ্চে—তোমার জন্যে হাজার চাঁদ নিঙড়ে জ্যোছনার সরবৎ পান করিয়ে পদ্মের পাপ্‌ড়ি পেতে একটি পরী—ডানা নেই, উড়্‌বে না—এনেছি—কবে হবে?

নগেন যে রকম চালিয়েছে, তাতে আর আমার বড় বেশী এগিয়ে দেখ্‌তে হবে না—হারু মাষ্টারের কৃপায় 'পরিণতফলশ্যামজম্বুবনান্তে' আমার সে দিন নেমন্তন্ন ছিল—গিন্নী বলে, যাও, আর আমি পিছোই—কি জান, গাছে তুলে দিয়ে শেষ গাছের গোড়া কাট্‌লেই গেছি—তারপর অনেক ভেবে চিন্তে—গিন্নীর নাম স্মরণ করেই বেরিয়ে পড়া গেল—গিয়ে দেখি, গুল্‌জার, অনেক শামলা এখানে গামলা ভাঙ্‌বার চেষ্টায় আছেন। আর বল্‌ব কি হে, ঠিক যেন একটা রাক্ষসী—যেন খেতে আস্‌ছে। ঠাকুরমার গল্পে শুনেছি, রাক্ষসীরা মায়া বিদ্যে জান্‌ত, এ দেখ্‌লাম চাক্ষুষ—গান যখন ধরে তখন যেন ঝিঁঝিঁপোকার মত মন্ত্র পড়ছে, সব যেন ঘুমে জড়িয়ে আসে; তারপর আর কি আড়ে গেলে। আমি ত মনে মনে গিন্নীর কাছে জবাব দেবার ভয়ে একটু বরফ হয়ে যাচ্ছিলুম, এমন সময় ওহো সে ফুটন্ত সফেন দ্রাক্ষারসের পানপাত্র হাতে ঢল ঢল বিলোল কটাক্ষ, যৌবন যেন মদনভস্মের আগে এসে দাঁড়াল, আমি অনেকটা ভৃঙ্গীর জাত—বললাম—বাবা ওই বোম ভোলানাথ বাবাজান বুড়ো শিব আছেন—ওই দিকে এগোয় না বাপ্! আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—চাচা আপনা বাঁচা, শেষ কি গিন্নীর গলার চোটে কণ্ঠরোধ হয়ে যাবে। কাজ নেই বাবা! রক্ষে কর! হ্যাঁ দেখ, এ জাতটা কিন্তু বেশ—এরা বেশ খেয়ে মেখে, আছে এক রকম। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে অবধি আজও গা ছম্‌ছমানি যায় নি। রূপের চম্‌কানি প্রাণ নিয়ে টানাটানি; দুনিয়া কি সাধে অমনি। গিন্নীর দিকে তাকাই আর প্রাণটা যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। রূপের বিরহ অসহনীয় বটে! বিরহের ঠেলায় কবিরা নাকি—ঘরের কোণে বসে চুম্বনের সঙ্গে—থুড়ি—চুম্বনটা বাতাসে—এই বিশ্বটাকে চুমুক দেয়, তখন এক রকম বটে। আকাশে পাতালে বিরহ বেশ বৈকি। কি জান ভাই, এই এ রকম রূপের জন্যে এত বড় বিরাট বিরহ যদি না হয়—তবে কবিদের ডানা গজায় কিসে বল।

শুন্‌লাম,মকদ্দমার খরচার টাকাগুলো নগেনের নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে—তা ভালই হল,—হ্যামিল্‌টনের সুবিধে হবে। আমার সঙ্গে জাহাজের সম্পর্ক ত নয়,তা হলে একবার বেয়ে চেয়ে দেখা যেত। ছুটো বন্দকীর মামলাও হয় না যে, তাকে এক তরফা সাম্‌নে

গাপ করব। যাক্, যারা ধার দিয়েছে, থাক্। আর জন্মে অনেক খেয়েছে বাবা এ জন্মে দিয়ে যাক্।

আর কার' খবর যদি চাও, আমি দিতে পারি, কিন্তু গিন্নীর মানা—কাযেই বেদবাক্য 'আম্নায়ন্ত' বুঝেছ ত। তবে আছে যেমন শীতের পদ্ম শুখিয়ে পাতা উল্টে ডাঁটা থেকে মচ্‌কে থাকে। আর কি বল্‌ব। গিন্নী—বলে ফেলেছি শুন্‌লে হয় ত এক ঠোনাই কসাবে। ইতি—

তোমার স্নেহের

সুধীর।

(হেনা—যুঁই)

ভাই যুঁই !

সেদিনকার বাগানের ব্যাপারটা কি শেষ দাঁড়াল, তা তুই কিছুই জানিস্ নি। তুই ত সকাল সকাল চলে গেলি, ওদিকে বাবু ত একেবারে মদে অজ্ঞান বল্‌লেই হয়—আর যারা ছিল, সবাই সেই অবস্থা—আমার কথা ছেড়ে দে—সমুদ্রে শয্যা যার, ও দু' ফোঁটা শিশিরে কি হবে বল্। বাবুর সঙ্গে সে দিন খুব ঝগড়া হ'য়ে গেছে, কারণ কিছুই নয়, শুধু শুধু—আমি ইচ্ছে করেই করেছি,আমার আর ভাল লাগছে না ভাই—আর এ দিকে শুন্‌ছি, সবই বাঁধা পড়েছে—ওর সেই ভাই কমল মামলা জিতেও শুন্‌লাম সব খর্‌চার টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে—হাজার পঁচিশ হবে—তা আর ক'দিন চল্‌বে—এই রকম পার্টির খরচা—আমার—আমি হাতী ত আছিই—কাযেই আমায় একবার আবার শীকার খুঁজতে হবে। তবে বোধ হয় শীকার মিলেছে—এক ঢিলে দু' পাখী মার্‌তে হবে। ওকে ছাড়বই—আর সেই সঙ্গে ওর মাগের সেই ঝাঁটার শোধ আমি নেব। সে এখন ওই উকীল সুধীর বাবুর কাছে থাকে, যদি সুধীর বাবুকে হাত কর্‌তে পারি—আমি রোজগারের ভাবনা ভাবিনে। সে মাগীর তেজ আমি ভাঙ্‌ব, তবে আমার নাম হেনা। দেখি না, কি হয়। এ বাগানটায় মদ খায় নি, আচ্ছা আর একটা বাগানে দেখ্‌ব, কত দিন তার ধর্ম্মের কারদানি থাকে। আমি হেনা, আমার কারসাজিতে স্বয়ং কন্দর্প টলমল করে, তা সুধীর; যেখানে আগুন জাল্‌ব, সেখানে ও পতঙ্গ পড়তেই হবে। কেবল এক জ্বালা—সেই মুখখানা কেবলই মনে পড়ে। এই রূপের জোরে কি না করেছি, এই রূপের জোরে তাকে জড়াতে পার্‌ব না! আমি আর্‌সিতে যখন নিজের ছায়া দেখি, তখন সে রূপ দেখে সেই ছায়াকে আমার জড়িয়ে ধর্‌তে ইচ্ছে করে—নিজেই হেসে ফেলি। ওঃ, সে রূপ—সে রূপকে আমি সুখের পাখী করব না। দেখ্ যুঁই, এত সুখ, এত টাকা, এত সবাই পায়ের তলায় পড়ে, তবু মাঝে মাঝে কি যেন মনে হয়—সব ঠিক

মনে কর্‌তে পারি নে—সব যেন কেমন করে ওঠে,আবার ভুলে যাই। কিন্তু যাই হ'ক—আমি ঝাঁটার শোধ তুলবই—দেখি সে কেমন, যেমন করে হ'ক···নগেনকে বলেছি, তুমি আর এস না, তবে এ কদিন আসুক—এদিকে বাঁধন দিই, তারপর দেখ্‌ব। হারুমাষ্টার পাজী বটে, তবে ওই মুখপোড়াকে দিয়েই অনেক কাজ হয়; তাই ত উনুনমুখোকে জুতো-ঝাঁটা মারি, আর টাকাটা-সিকেটা দিই। সেদিন বল্‌ছে, 'এমন চার করব বন্ধু যে, টোপ গেঁথে সুতো ফেলে ছিপ ধর্‌তে হবে না—অমন ঢের বড় বড় রুই কাতলা হাঁ করে চোখ উল্টে এই দোরে এসে খাবি খাবে। তা তুমি তখন তাদের মুড়োই খাও, ল্যাজাই খাও—আমায় বন্ধু শুধু কান্‌কো দুখানা দিলেই ছ্যাঁচড়া রেঁধে খাব বস্।" ঝাঁটাখেকোর কথা দেখেছিস্—আঁটা ভার। নগেন থাক্‌তে থাক্‌তে তার মাগের ওপর শোধ নিতে হবে—নইলে আমার রাগ যাবে না· দেখিস্,তোকে মনের কথা খুলে বল্লুম বলে তুই যেন বলে ফেলিসনি কাউকে, তা হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে, মাঝে থেকে আমার আর অপমানের বাকী থাকবে না। আমাকে বাড়ীতে পেয়ে অপমান করেছে, আমি এবার তাকে বাড়ী গিয়ে তার শোধ দিয়ে আস্‌বো। দেখি সেই বা কেমন, আমিই বা কেমন! কিন্তু ভাই দেখ্, যখনই কমলের মুখ মনে পড়ে, সব কেমন গুলিয়ে যায়,ও সব ভুল হয়ে যায়, তখন আর কিছু ভাল লাগে না—কেবল চোক বুজে তার কথা, তার সেই মুখ ভাবি—হায়, দুনিয়াটা কেন আমার কাছে এমন হয়ে এল। মার উপর ভয়ানক রাগ হয়—আমার এখন মনে হয়, সেই ত আমার এ সর্ব্বনাশ করেছে, নইলে রূপ ছিল, গুণ ছিল, গান গেয়ে ত খেতে পেতাম, এখন আর ফের্‌বার উপায় নেই—ইচ্ছে করে সব ফেলে কোথাও চলে যাই; আবার ভাবি,দূর—এ সব পাগলামী—আমাদের ও ছাড়া আর উপায় কি আছে। এই তেইশ বছর বয়সের মধ্যে কত দেখ্‌লাম, কত সখ মেটালাম, কত কত অমন পায়ে মাথা খুঁড়তে দেখ্‌লাম, কিন্তু কেউ কখন আমার হয়েছে বলতে পারিস্। ওই সব দুদিনের হাসি—তার পরই মুখ শুকিয়ে—আড় আড়ে তাকিয়ে—মুখ লুকিয়ে যায়। যখন দুদিন পরে জুড়ি খোঁড়া হয়ে যায়, তখন বর্ষার কাদায় ভাঙ্গা ছাতি মাথায় দিয়ে ভিজতে ভিজতে মুখে চাদরঢাকা, ছাতা আড়াল দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়, অনেক দূরে গিয়ে একবার পিছন ফিরে হাঁ করে তাকায়। এই ত তারা—এই ত তাদের শেষ। আমরা দিবারাত্রি ভাণ করি, কত প্রেমের লতার মত নুইয়ে পড়ি, ঢলে পড়ি, তারা কাঁপতে কাঁপতে বুকে তুলে নেয়—নিজেরাও ভাণ করি; তখন মনে করি, তাদেরও সব ওই ভাণ বলে মনে হয়। এতে কার লাভ, তা খতিয়ে দেখি কি? একেবারে চুপ্। সেদিকে কখন তাকিয়েছি—কখন না। এক এক সময় ভাবি, কি কর্‌ছি। এর চেয়ে যদি গেরস্তর ঘরে বউ হতাম—স্বামী ভিক্ষে করে আন্‌ত, ঘাসের কুঁড়েয় গাছের তলায় থাক্‌তাম—সে এর চেয়ে কত ভাল ছিল।

আবার ভাবি, বাবা, ওই অমনি ক'রে ছেঁড়া কাপড় প'রে ঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াতে হবে—মা গো! সে আমার দ্বারা হবে না। ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন উঠে দাঁড়াই, ঘরজোড়া আরসিতে নিজের ছায়া পড়ে, গোড়ালি অবধি লুটিয়েপড়া এলোচুলে ঢেউয়ের মত দুলে ওঠে—ভাবি, ম'রে স্বর্গে ইন্দ্রের নর্ত্তকী হব, রম্ভা-তিলোত্তমার মত একটা কিছু হব—কি হয়েছি, কি হয়ে আছি, তা ভাবি নে, ভাবি কেবল এ হব, তা হব, কেবল হব, তার পর যখন মনে হয়, স্বর্গেও প্রাণ নেই, সেখানেও এমনি ভোগের জন্য যাব, সেখানেও কেউ আমার হবে না, তখন আর কোন ভরসা থাকে না। মাটীর কথাই মনে হয়, সব আশা ভেঙে—কাচের বাসনের মত ভেঙে—কাচের বাসনের মত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বুকটা যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগ্‌ল।

অনেক রাত্রি অবধি ছাদে বসেছিলাম, বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছিলাম, এ জীবনটা ত একেবারে একলা, সবটা যেন খালি বলে মনে হ'তে লাগ্‌ল। ঘরে খানিকটা ছিল—খুব ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেল্‌লুম—ভাব্‌লুম,ভাবনার হাত হতে এড়াব। পোড়া চোখে ঘুম আর এল না, আরো যেন বুক খালি ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল—আগুন নিবুতে গেলাম, আগুন আরও জ্বলে উঠ্‌ল। এক এক করে কত কথাই মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেবেলার অস্পষ্ট ছবির পর, এই পথের মাঝে একটা যেন প্রকাণ্ড ফাঁক—জীবনটার কিছুই বুঝবার নেই। পাহাড়ে-দেশে দেখেছিলাম, দুটো পাহাড়ের মাঝে একটা মস্ত ফাঁক, অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না—শুধু পড়ে যাবার ভয় জাগিয়ে দেয়। এ যেন ঠিক তেমনি। তার পর সেই বিয়ে—হা হা! বিয়ে হ'ল ছোরার সঙ্গে। এখন বুঝ্‌ছি, যে তার মানে কি, হৃদয় বলে যে জিনিষটা, তাকে ছিঁড়ে তবে এ কাজে এসেছি—তাই বুঝি ছোরার সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়। তারপর কতই সব মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, সেই একদিনের কথা, সুন্দর, অতি সুন্দর। ওঃ কি জ্বালা! আবার ঢাল্‌লুম—ডুবিয়ে দেবার জন্যে—সমস্ত স্মৃতিকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে—নূতন স্মৃতি গর্জ্জে উঠ্‌ল। কি করে তাকে পাব, কি করে তাকে পাব—তাই আমাকে আকুল করে তুল্‌লে। প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—সামনের বাড়ীতে কে গাইছিল;—

কাঁদায়ে কেঁদে সে কত,
হাতে ধ'রে ব'লে গেল,
তুমি লো জীবন-লতা,
হৃদি-ব্যথা সার হ'ল।

তবু ত ভোলে না মন,
ভুলিতে করি যতন,
ত্যজিয়ে হৃদি-রতন আঁধারে প্রাণ ডুবে গেল,
ভাবিনু কেমনে সই,
ভুলিতে সে পারি কই,
ভুলিতে আঁখি যে ভাসে কার আশে ফেলে গেল।
কুড়ায়ে আঁচলে সুখ—
ভরা হৃদি ভারি বুক
সুখ সে নিলে না সই, জীবন বিফল হ'ল—
জানে ত সে ভালবাসি, তবু কেন চলে গেল।

তখন কেবলই মণির কথা মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল—সেই আমার প্রথম কৈশোর ও যৌবন-সন্ধিক্ষণের প্রথম জীবনের স্পন্দন। আবার ঢাল্‌লুম, ডুবাও,—স্মৃতি ডুবাও··· না, সে একালে কেন, সে সব সেকালের কথা—তবু···কুড়ায়ে আঁচলে সুখ যদি ঢেলে দিতে পার্‌তাম।

গান শুনে প্রাণ যেন কোথায় উধাও হয়ে যেতে লাগ্‌ল, ভাব্‌লুম কেউ যদি এমন আপনা'র হ'ত, যাকে একবার এক নিমিষের জন্যে বল্‌তে পাই—আমার সব সুখ তুমি নাও—আমার দুঃখ শুধু আমারি থাক্, শুধু এই দুটো কথা বলায় নারী হয়ে সে কি সুখ! হায়! হায়! কি হয়ে আছি, কি হয়ে আছি! তুই হয় ত ভাব্‌ছিস্, এ নেশার ঝোঁক—তা নয় লো তা নয়·আর ভাল লাগে না—গান শুন্‌ছি আর যেন কবেকার কথা মনে পড়ছে।

যাক্ মরুক্‌গে, মনে কর্‌ছি, তোর ওখানে কাল যাব। সমস্ত রাত ঘুমুই নি, চোখটা এখন যেন কেমন কর্‌ছে, সকাল বেলা যখন উঠে যাচ্ছি, মা বল্‌লে—"হ্যাঁ লা, মুখখানা তোর অমন হয়ে গেছে কেন? কালি ঢেলে দিয়েছে—কাল নগেন আসেনি।" আমি উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলাম—দেখ্‌লাম, সত্যিই মুখখানা কালিতে ভরে গেছে—চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকেছে। ভাব্‌লুম, না, আর ভাব্‌ব না—এর ত এই ফল, রূপ চলে যায়—যাক্, আমার সুখই ভাল। কিন্তু তাই বা সত্যি সুখ কোথা পাই। হায়! সুখ! সুখ! তোমায় কত রকমে আপনার কর্‌তে চাই—কই,—পাই কই! না যুঁই ফুল! আর আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। একদিকে প্রতিশোধ, একদিকে তাকে পাবার আশা—এ দুয়ে যেন থেকে থেকে ঝগড়া তুল্‌ছে। একবার ভাবি থাক্‌গে মরুগ্‌গে একবার ভাবি দুই চাই' কমলকেও চাই, সঙ্গে সঙ্গে

প্রতিশোধও চাই। মাগী ঝাঁটা মেরে চলে গেল—আমি সেই ঝাঁটা খেয়ে রইলুম—আমি হেনা! এক একবার ভাবি, নেমকহারাম হব না—নগেন অনেক দিয়েছে, অনেক দিচ্ছে,—অনেক করেছে—আমার মুখ চেয়েই সে আছে—আবার দেখি, দুর, ভাল লাগে না—যাকে ভাল লাগে না—তাকে নিয়ে কি ক'রে থাকব। শীকার ঢের জুটবে—টাকাও ঢের করেছি, সে জন্যে ভাবি নি—ভাবি, তবে যে সুখের জন্যে এত করলুম—সে সুখ হ'ল কই। সে ত হ'ল না। তাই ভাবি, কি হবে! প্রতিশোধ নিলেই ত প্রাণ বুঝবে না—তবে তারই জন্যে কেন ভাবি। যদি তাকে না পাই, তবে আর কি হ'ল—কি হবে। ইতি

তোরই

হেনা।

(মায়া—কমল)

প্রাণের কমল,

কোথা তুমি! এখানে আমার আশায় লোকে কলঙ্ক গাইছে। আমি কি করেছি নাথ যে আমার কলঙ্ক। আমার কলঙ্কের পশরা আমি মাথায় তুলে নিয়েছি—এ পশরা আমায় মুকুটের শোভায় সাজিয়েছে। এস প্রাণ, এস প্রিয়তম, তুমি এসে আমার কলঙ্কিনী নাম সার্থক কর। তোমার মিলনগৌরবে আমি গরবিনী হই—আমার সে কলঙ্ক দূরে যাবে। যে তোমার মুখ একবার দেখেছে, সে কি কলঙ্কে ডরায়—কলঙ্ক ত' তার অঙ্গের শোভা। হাজার হাজার বছরের আঁধার যেমন একটা প্রদীপের আলোয় এক মুহূর্ত্তে চলে যায়—আমার সকল অন্ধকার এ কলঙ্কের দীপে চলে গেল। কত সাধের কলঙ্ক আমার কেউ ত জানে না। এস এস নাথ, ফিরে এস, হৃদয়-মঞ্জরী ফুটে পাপড়ি খুলে সাজায়ে আছে,—এস এস আমার কমল-বনে লুব্ধ মুগ্ধ ভ্রমর তোমার মায়াকমলে এস নাথ, কত দিন কত দিন—আর বিরহের দারুণ ব্যথা বয়ে বেড়াব—পাব পাব মনে আশা—কই সে ত পাই না—শুধু কলঙ্কই বোঝা হ'ল—

ঘরে পরে রটল কথা
ভয় বা কিসের, কলঙ্কিনী!
কলঙ্ক যার পায়ের নূপুর
মাথার মুকুট গলার মণি!

আমার, তাই, ভয় কি? শুধু লোকে কলঙ্ক রটালে, লোকের গঞ্জনায় আর লাজ আসে না—আমি ত ডুবেছি—লোকে যদি আমার কলঙ্ক রটালে, তবে আর সে আমার মনে মনে থাকে কেন—সে জগতের পথে, বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে গেয়ে যাক্—কলঙ্কিনী মায়া, কমলের জন্যে মায়া—কি মধুর—আমার দিবারাত ওই কথা শুনতে ইচ্ছা করে। "জগভরি বিপুল কলঙ্ক" কি মধুর কথা নাথ—সকল দুঃখের মাঝে এ কলঙ্কের দুঃখ বড় মিষ্টি। আমার তনু মন বিভোর, এ সুখকে আমি আর বাঁধ দিতে পারি নে। সীমাহীন অনন্ত দুঃখ এখন কলঙ্কে ডুবে সুখ হয়ে ভেসে উঠেছে। ওই আকাশে চাঁদ কলঙ্কী, তারা কলঙ্কিনী—আমি যে চাঁদের জন্যে কলঙ্কের কাঁটার মুকুট পরেছি, সে যে জগতে আলো ও প্রেম ঢেলে বিলিয়ে যাচ্ছে। আমি যে রূপসাগরে ডুব দিয়েছি—কলঙ্ক তার পঙ্ক-লেপ নিয়ে এখানে রূপে মিশে গেছে।

কমল, এখানে তুমি যে ঘরে ছিলে, সে ঘরের বাতাস যেন কমল গন্ধে ভোর হয়ে আছে—এখানে সেখানে শুখনো ফুল, শুখনো পাতা, আমায় কত পুরাণ স্মৃতির মাঝে নিয়ে যায়—তোমার এই বকুলভরা শিথানের স্পর্শ আমাকে যেন কোন অজ্ঞাত সুখের আবেশে জাগিয়ে দেয়—সেই ছায়ায় তোমার মুখের লালিত্য অনুভব করি, কিন্তু তুমি নাই। দীর্ঘশ্বাস পড়ে আকুল হয়ে চারিদিকে খুঁজে মরি। ফিরে চাই—দেখি, নিবন্ত বাতির আলোয় দেয়ালে আমার ছায়াটা কাঁপ্‌ছে। শরীর মন যেন অবশ হয়ে আসে। আর কতকাল—হে আমার অন্তরের প্রদীপ, এ অন্ধকারে থাকব! আর প্রাণকে এমন ক'রে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে পারিনে। হৃদয়েশ! লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত, তবু ফেলে দিয়ে কোথা চলে গেলে! তুমি সকলের উপর এত স্নেহময়, সকলে তোমার স্নেহ পায় নাথ, আমি অভাগিনী কেন সে দয়া থেকে বঞ্চিত হলাম বল। একদিন যার আঁখি পাল্‌টাতে যুগ বলে মনে হ'ত—আজ এতদিন অদর্শন কি সহা যায় নাথ! বল নাথ, কি দোষে দোষী? লোকের কথায় কাজ কি—তারা ত বাতাসে ফাঁদ পেতে কথা বেচে—তাদের দশাই ওই—আমি আমার কথাই বল্‌ছি—লোকে যে কলঙ্ক গায়—তায় কিবা আসে যায়, এ কলঙ্কে যা সুখ, তা শতেকবার গঙ্গাজলে ধোয়া মনে সে সুখ নেই।

হায় জীবন যেন ভার হয়ে উঠেছে, আর একে বইতে পারি না—সকাল হয়, তোমার কথা ভাবি—দিন চলে—প্রতি মুহূর্ত্ত গণি, তোমার হৃদয়ের—বুকের স্পন্দন অনুভব করি—কিন্তু তুমি নেই, বাতাসে চুম্বন দিই। এ প্রাণময় বায়ু কি তরঙ্গে তরঙ্গে তোমার কাছে আমার সেই চুম্বন বয়ে নিয়ে যায় না? তুমি আমার সকল কথা, সকল ভাব, সকল সুর, সমস্ত নিশ্বাস, সমস্ত গন্ধ কি এই বাতাসে পাও না?—বল নাথ, এ হারাণ ভাসান—বায়ুতে মেশান প্রাণের যে প্রাণ তা মধুর কি না।

ইচ্ছা হয় তোমার কাছে ছুটে যাই—পাখীর মত উড়ে উড়ে তোমার ওই বক্ষ-নীড়ে আশ্রয় নিই, প্রাণ-মন জুড়াই ; কিন্তু বাধা লজ্জা—লোকের কাছে তোমার কথা বলতে লজ্জা করি না—কিন্তু তোমার কাছে যেতে কেমন কেমন করে—লজ্জা করে—তোমার দুর্লভ প্রেম - তাই বুঝি আমার সে মিলল না ! গাছের মাথা থেকে পাখী উড়ল ; কিন্তু হায়,—

বারি বারি করি চাতক উড়লুঁ
না বরখ বারি বজর পড়লুঁ ।
প্রেম নাহি মিলল শুখলুঁ ধারা
হাহা পিয়ারা ! ঘোর আঁধিয়ারা !

কোথায় যাব, কাকেও যদি না বলি, প্রাণ যেন ফেটে ওঠে । হা সখা - হা বন্ধু—হা প্রিয়তম—এ বুকে যে দারুণ ব্যথা, তুমি বিনা কে আর জুড়াবে বল । পাখীরাও তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে পাতার নীড়ে কাটায়—আমার সব পেয়েও সুখের বাসা ভেঙেই গেল—কিছুই হ'ল না—মৃত্যুতে কি এর শেষ হবে, লোকান্তরেও কি তোমায় পাব না—কিন্তু যদি লোকান্তর না থাকে—তা হতেই পারে না—লোকান্তর আছে—নইলে প্রাণের এমন প্রেম কি সব বিফল ও অনিশ্চিত । কখন নয়—আছে—লোকান্তর আছে, সেখানে লোকের গঞ্জনা নেই—সেইখানে আমাদের মিলন—না না—এ প্রাণ আর ধৈর্য্য ধরতে পারে না—তুমি এস, এস,—আকাশের মত নির্ম্মল তোমার প্রাণ, সে আকাশে কিসের ছায়া পড়েছে নাথ ? সে সব ভুলে আমায় ফেলে দিয়ে বেশ চলে গেলে ।

সে দিন তোমার চিঠি দেখলাম—দিদির ঘরে পড়েছিল—অক্ষরগুলো প্রথমে যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহের মত আমার চোখের উপর বয়ে গেল—তারপর যা পড়লাম, সে কি নাথ—এ অন্তরের পূজার আবার বুঝি কে বাদী হ'ল—কি জানি - যে নিষ্ঠুর হয়, সে সকল রকমেই নিষ্ঠুরতা দেখায় । না—না নাথ—এস এস—মলয়ের বাতাস রূপে মায়াফুলে সেই ফুলরেণু বয়ে নিয়ে এস,—প্রেমে বিশ্বের জন্ম—তোমার সরল প্রেম আমার এ প্রাণভরা আশার প্রেমে মিশে জগতে নূতন গ্রহ রচনা হবে—সেখানে সব নিস্তব্ধ গহিন রাত্রির মত নিঝুম—নীরব—শুধু এক বাঁশীর গান মোহন সুরে দূরে দূরে বাজবে—দূরে দূরে সে গ্রহ হতে দেখব—স্বপন রাশির মত তারকার শ্রেণী ডুবছে, উঠছে,—দেখব—মন্দাকিনী কুলু কুলু ধীরে ধীরে বয়ে যাবে—তার মাঝে তোমার আমার জাগরণ—সেও অস্ফুট—বুঝতে পারব না কোথায়,বুঝবার আশাও থাকবে না,—শুধু একটি স্নিগ্ধ, নীরব, রূপোর তারের

মত আলো তোমার হৃদয় হতে আমার হৃদয়ে মিশে যাবে। নীরবে সেই মিলনের মুহূর্ত্তে বিশ্ব ধন্য হবে। কবে—কবে—আমার সে দিন হবে নাথ! এস—এস সুন্দর,—এস বিধাতা,—এস অরূপের রূপ—আমার সেই আলোকে পূর্ণ কর নাথ!

ইতি—তোমারই মায়া।

(কমল—মায়া)

হায়! নারী, ধন্য তোমার মায়ার ডোর—ধন্য তোমার নিজের ফাঁদ! এ কি,—এ কি, আবার সেই কথা। এতদিন পরে আবার সেই কথা। তুমি কি বুঝ্‌তে পারছ না যে, সেই সমুদ্র-তীরের এক প্রান্তে তোমার বাস, সেও যেমন ক্ষণিকের মত, তেমনি তার আর এক প্রান্ত কোথায় মিশিয়ে গেছে—সেও ক্ষণিক স্বপ্নের মত। জলস্থল পরিমাণ হয় না, এ অনন্ত সমুদ্র। তোমার আমার মাঝে সেই অনন্ত সাগরের ব্যবধান—বাতাসও এখানে তোমার কথা কানাকানি করে না, শুধু এক হো হো অবিরাম ধ্বনি উঠ্‌ছে। সে সব কথার উপর ঢেউ চলে গেছে, কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—সে কথা খুঁজেই মেলে না।

অতীত আমার কাছে কি রকম জান, সমুদ্রতীরে বালীর চরের উপর পায়ের দাগের মত। একটা ঢেউ এল, সব মুছে গেল, যেখানে যেখানে দাগ খুব গভীর, কোথাও বা একটু চিহ্ন রেখেছে—জল ধুয়ে মুছে নিতে পারে নি—সেখানে বাতাস এসে তপ্ত বালু উড়িয়ে সে গভীর দাগের উপর সমভাবে তার হাত বুলিয়ে সমান ক'রে দিয়েছে। দেখ,যাকে বেশী ভুল্‌তে যাওয়া যায়,সেইটে বেশী মনে পড়ে। ক্ষত যদি তুমি অবিরাম খোঁচাও,কেবল ধোও—ক্ষত কিছুতেই সারবে না। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে,—চেষ্টা করে—তাকে ভুল্‌তে যাওয়া মস্ত ভুল। ভুলই তোমায় ঠিক পথে নিয়ে যাবে—যদি ভুলকে ভুলে এগিয়ে যাও। দেখ, ওই উইয়ের ঢিপিটা ভুল করে না—ওই পাহাড়, গাছপালা, লতা, এরা কেউ ভুল করে না—ওরা প্রকৃতির আইনের মধ্যে দিয়েই যায়। মানুষ ভুল করে, ভুল ধরে, তার পর তার যা ঠিক চরম, তাই পাবার উপায় ক'রে নেয়। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে—বর্ত্তমানে শুধু এমন ভাবে চল্‌তে হবে যে, কেবল ভবিষ্যৎ আস্‌ছে—সব ভুলে সেই দিকই ধেয়ে যেতে হবে। অতীতের দিকেই বা কেন তাকাই—সে কি ফিরবে—যা যায়, তা কি ফেরে—যে দিন চলে গেছে—যে ফেরে না,—যে মৃত, আর ফিরে জাগে না—যা একবার শুখিয়ে হেজে যায়—তা আর নধর কিশলয়ের লালিত্যে ফিরে আসে না, প্রাণের যে উচ্ছ্বাস একবার দেখা দেয়, সে চলে গেলে আর ফিরে দেখা দেয় না—মনে বোঝ, আশ্বস্ত হও—এ তরঙ্গে আর আপনাকে ভাসিয়ে

দিয়ো না।…ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী চলেছে একরকমে এক পথে, গ্রহেরাও তেমনি নিজেদের পথে নিজেরা চলেছে—কেউ কার পথরোধ করে না, কেউ কার সংঘর্ষণে আসে না—যদি আসে,ভেঙে চুরমার হয়ে দুটো থেকে আগুন বেরিয়ে ছিটকে চলে যায়—মানুষও ওই গ্রহের মত, যে যার নিজের পথে চলেছে—তার অধিকারে তার মাঝে যদি তুমি অমনি ভাবে এস—তবে এ তুমুল সংঘর্ষণে একটা অগ্ন্যুৎপাতের মতই হবে—সংসার জলে যাবে। আকাশে নক্ষত্র দেখ—যত দূর আকাশের রেখা তোমার কাছে পড়ে আছে, ওই তত দূর, কিন্তু তারপর কি আছে তুমিও বলতে পারবে না—আমিও বলতে পারব না। তুমি যত দূর গণ্ডী দিয়ে রেখা টেনে দেখেছ—সে পরিধি ছাড়িয়ে শেষ আরো মহাশূন্যে চলে গেছি—যেখানে আকাশ ও বাতাস ও জল সব মিশে গেছে, তাও ছাড়িয়ে চলে গেছি—বলেছি ত বাতাসও এখানে কানাকানি করে না।

আর কেন, আমি এখন এ সমস্তের পার, জীবন মরণ দুই সমান—এখানে তোমার মায়াজালে নিশার আঁধারে বিদ্যুতের মত শুধু তড়িত-প্রবাহ বইয়ে আর কেন সে চেতনা আন—যে প্রস্তর—সে বিদ্যুতের প্রভাবে সুখদুঃখের অতীত কি না—এ জেনে তোমার কি লাভ—আমি পাথরের পরিণতিতে এসেছি। তোমার ও ক্ষণিক বিদ্যুতের আলোয় তুমিই দেখতে পাবে না, চোখ ঝোলসে যাবে। দৃষ্টিস্থির ক'রে দেখ—শুধু মেঘ, হঠাৎ সেই বিদ্যুৎ চমকাল, তারপর আরো ঘোর করে আঁধার। মনের এ অবস্থায় কি ফল। ছাইয়ের ভিতর চাপা আগুন ধীরে ধীরে আপনি নিবে যায়, দূরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না; তাকে যদি নাড়া দাও, প্রথমে ছাইটা তোমার চোখে মুখে উড়ে পড়বে,তারপর এ বাতাসের স্তরে একটু নীলাভ আভা কাঁপতে কাঁপতে বাতাসকে তপ্ত ক'রে আগুন জলে উঠবে। তাতে শুধু দাহের যাতনা- তাতে আর কোন কায হয় না। সেই যাতনায় যদি, মায়া, তার উপরে ইন্ধন যোগাও, তবে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না আরও ধিকি ধিকি জলে উঠবে। নিজেও যাবে—এমন কি,পাশের গেরস্তরাও পুড়বে। তবে তুমি আবার কেন স্মৃতির কঠিন দণ্ডে নাড়া দিয়ে তুললে! ছিঃ লক্ষ্মি, আমার কথা কি আর ভাবতে আছে। মনে কর, তুমি একটা ফুল, আমি একটা ফুল, ফুল ফোটে কার জন্য—সুন্দর সুন্দরের জন্যই ফোটে—তুমিও ফুটেছ যার জন্যে—সেই সুন্দরের পূজাতেই তোমার চরম সুখ—আর আমি ফুটেছি কোন অজ্ঞাত কারণের জন্য ·যেখানে সমস্ত বিশ্ব এক নিশ্বাসে এক তৃপ্তির আস্বাদনে সেই এক মুক্তির অনুসন্ধানে ছুটেছে—যে দিন ঝরব, সেই দিন বুঝি মুক্তি। মায়া, ভুলে যাও, ভোলবার জন্যে চেষ্টা করলে হয় না। যেমন একটা শুখনো পাতা ঝরে পথের ধারে পড়ে থাকে, তুমি চোখ দিয়ে তাকিয়ে স্থির হয়ে দেখছ পাছে বাতাসে পাতাটা উড়িয়ে নিয়ে যায়--যতক্ষণ তাকিয়ে রইলে, ততক্ষণ নিলে না, যেই অন্যমনা হয়েছ, অমনি বাতাস

তাকে নিয়ে গেছে ; তোমার জান্তেও দিলে না—আর তুমি তাকে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে খুঁজে বেড়াও, তবু পাবে না—এই নিয়ম। তাই বলছি, ওই ঝরা পাতা হয়ে পড়ে থাক, তোমায় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তখন আর কার কথা মনে থাক্‌বে না। সব ভুল—আপনিই ভুল হয়ে যাবে। অয়ি মুগ্ধে! নিজেকে আর কেন নিজের মায়াজালে জড়াও ; লূতাতন্তু মায়াজালে লূতা নিজেও মরে—এই প্রকৃতির নিয়ম—যে অন্তকে জালে আবদ্ধ কর্‌তে যায়, সে নিজেই তার নিজের জালে নিবদ্ধ হয়। হায়! প্রকৃতি আপন বাঁধনে আপনি বাঁধা। তোমার নিজের বাঁধনে তুমিই বাঁধা—বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার সোজা উপায় বাঁধন কাটা। ভগবান্‌, অগ্নি সাক্ষী সে বাঁধন পুরোহিত হয়ে তোমার হিতের জন্যে দিয়েছেন—সেই তোমার শ্রেষ্ঠ বাঁধন। সে বাঁধনে ডুবে থাক, আপনিই তা হতে মুক্ত হবে, তৃপ্ত হবে, বাঁধনের জ্বালা তখন শান্তিতে মাখা হয়ে যাবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটার উদ্ধার হয়। সংসারে নিজেকে মিশিয়ে দিলে তবে সংসারের বাঁধন কাটে।

আর আমাকে চিঠি লিখো না। কায়, মন ও বাক্যে—তা ছাড়া যদি বাক্যাতীত ভাব যদি কিছু থাকে—তাই দিয়ে তোমার সর্ব্বথা মঙ্গল কামনা করি। তোমার সংসারে অচিরে সাফল্য লাভ কর। ব্যাকুল বাসনা ও মত্ত আবেগ লয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ধূম-কেতুর মত ঘুরে বেড়ান'য় আকাশও ধূমকেতুই বল্‌তে পারে, তাদের কি লাভ—তুমি আমি আর কেন সে পথে,—আমাদের ত সে পথ নয়। প্রার্থনা করি, যে সুন্দর তোমায় এত সুন্দর ক'রে গোড়েছে, সে সুন্দর তোমায় যেন আরও সুন্দরতম করে—তোমার সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ চরম সার্থকতা লাভ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

কমল।

(মায়া—কমল)

এ কি, এ কি, তুমি, তুমি কমল, তুমি আমায় ভুল্‌তে বলেছ, জগৎ ভুলিয়ে আজ আমায় ভুল্‌তে শেখাচ্ছ। বাঃ! ভোলা তত সহজ নয়—মুখে ছলে বলা যত সহজ। তুমি নিজে ভুলেছ—কখন না, এখন' যে তোমার 'মায়া' কানের ভিতর দিয়ে আমার বুকের কোনখানে গিয়ে লুকোতে চাইছে, তা আমি যেমন ভুল্‌তে পারিনি, তুমিও তেমনি ভুল্‌তে পারনি। কখন নয়—আমার এ দেহ যে দিন রেণু হতে অণু হয়ে বাতাসে বাতাসে ফিরে অদৃশ্য জগতে বিলীন হয়ে যাবে, তখনও আমার ভাব—আমার স্মৃতিকে তোমার বুকের কাছে জাগিয়ে রাখ্‌বে—তুমি আমায় ভুল্‌তে বলেছ !!!

হে ঈপ্সিত, আমার এই হৃদয়-সরোবরে যে আলোক এসে পড়েছে, তার রশ্মিতে একটা পদ্ম ফুটে উঠেছে—আমার জীবনে এটুকু এক আনন্দের স্বপ্নের মত—এ স্বপ্ন আমার ভেঙে দিও না। কে তুমি পুরুষ, নারীর মূহ্যমান শিরায় শিরায় প্রেমের স্রোত বইয়ে—আজ তার সেই স্রোতকে রোধ করতে চাও—কে তুমি পুরুষ, নারীকে সম্মোহনে মোহিত ক'রে কাঁটার তীব্র জ্বালা অনুভব করাও—কে তুমি সুন্দর, যে নারীকে উষার আলোক দেখিয়ে পর্ব্বতশৃঙ্গ হ'তে অন্ধকার গুহায় ঠেলে ফেলে দিতে চাও। চিঠিখানা পড়ে ভারি হাসি এল—যখন প্রাণের সমস্ত ব্যর্থতা একসঙ্গে জড় হয়ে আসে, তখন বড় মজার হাসি আসে—ঝর্ ঝর্ করে যখন ভাঙা বাড়ীটা পড়ে—তখন আমার ভারি হাসি আসে—আমার এতদিনের মমতা দিয়ে গাঁথা প্রাসাদ বালির গড়া ঘরের মত হাওয়ায় ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়ে গেল—আমার হাসি এল। এত দিনের গাঁথুনি যদি এক কথায় চুরমার হয়ে যায়, তবে নূতন ক'রে কার আর গাঁথবার সাধ হবে। আমি আমার নিশ্বাস দিয়ে,—আমি আমার চোখের জল দিয়ে—আমি আমার কেশ দিয়ে মুছিয়ে যে মন্দিরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকে ভেঙে নূতন কি করব। আমি ভগবান্ ফেলে দিয়ে তোমার সাধনাই করেছি—আমি ভগবান্ চাইনে—তোমায় চাই।

হায়! বিধি কেন আমায় নারী ক'রে সৃষ্টি করলে। নারী হওয়া বড় জ্বালা! বলবার নেই—কইবার নেই—শুধু পোড়্বার আছে। শুধু জ্বলেই মর'। শুনেছি, হৈমবতীর তপে বিশ্ব টলমল করেছিল—আমিও পঞ্চতপা হব। পর্ব্বতে পর্ব্বতে চিরতুষার হিমানীর দেশে—ওই এক তপে দেহপাত করব তবুও তোমায় পাব না কি? আমি জীবনে-জাগরণে, ঘুমে-স্বপনে তোমার তপেই আছি, সে তপ কি আমার নিষ্ফল হবে? দুঃখ ত দিয়েছ নাথ—কত দুঃখ আর দিবে—ভেঙে চুরে এ এক অপূর্ব্ব গড়ন গড়েও তোমার তৃপ্তি নেই—এখন আবার নূতন গড়তে চাও। আবার কি হব—বল, আর কি ত্যাগ করতে হবে? বল, কোন খুঁত রইল। মন-মুখ এক ক'রে ফুলের মত সমস্ত আত্মনিবেদন গন্ধ ঢেলে দেবার মত হয়ে সেই অদৃশ্য অদৃষ্টের মত মুখ পানে চেয়ে আছি—আর কি ত্যাগ করব,—আর কি ভুলব,—আর কি নূতন করে নিজেকে গড়্ব। নিজেই মরে গেছি, গড়্ব আবার কি? আর আমার কিছুই নেই, সব তোমার, যে দিকে চাই দেখি তুমি,—আর আমার দিক নেই। কোথা যাব......

কমল, তোমার মনে পড়ে, সেই কাঁটাভরা গাছে ফুল তুলতে গিয়ে আমার হাতে কাঁটা ফুটে গেল, আমি এক হাত দিয়ে সেই কাঁটা তুলতে গিয়ে সেই কাঁটাগাছের ঝাড়ে পড়ে গেলাম, তুমি তখন সমুদ্রতীরে কাল পাহাড়টার পাশে বসে

আড়াল থেকে ঢেউয়ের উপর পা দোলাচ্ছিলে, আমি পড়ে যেতেই তুমি ছুটে এলে— আমার সমস্ত শরীর রক্তমুখ হয়েছিল, তুমি যখন:বুকে ক'রে তুল্‌লে, আমার যেন কাঁটার সমস্ত জ্বালা নিভে গেল। তোমার মনে আছে, আমি কি রকম ক'রে তোমার বুকের মাঝে জড়িয়ে উঠেছিলাম, সে কথা কি আমি ভুল্‌তে পারি—ভোল্‌বার কথা ব'ল না। আমার কেবল মনে হয়, আবার সেই দিন ফিরে আসুক, আবার আমি তেমনি তেকাঁটার গাছে ফুল তুল্‌তে গিয়ে সমস্ত দেহ কাঁটায় ছিঁড়ে যাক, আর তুমি এসে বুকে করে নাও, আমার সকল ব্যথা তোমার বুকের খাসে মিলিয়ে যাবে। কমল, আমি সে ছবি চোখের উপর ভেসে রয়েছে—দেখ্‌ছি। আমি সেই তেকাঁটার গাছ এখানে এনে পুঁতেছি—কই তাতে ত ফুল ফুটল না। কেবল কাঁটাতেই ভরে আছে। হায়! সাধের কাঁটা—

কত কাল আর হে বন্ধু, শুধু এ কাঁটারই যাতনার মাঝে ডুবে রব। কে আমায় বুক দিয়ে ব্যথার কাঁটা তুলে দেবে। আজ মনে পড়্‌ছে, সেই কমলানেবু গাছের তলায় দুজনে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হাতে হাত দিয়ে কি বলেছিলে,—'মায়া! ওই সূর্য্যি ডুবে যাচ্ছে, যদি তুমি আমায় ফেলে দাও, ঐ অন্ধকারের মত কোন অন্ধকারে যে আমি থাক্‌ব তা জানিনে"—আমি কোন কথার উত্তর দিতে পারিনি—শুধু সূর্য্যের শেষ রক্তরাগমাখা তোমার ওই অনুরাগভরা মুখের পানে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম—সে সব দিন কি ভুলেছ, না ভুল্‌তে পেরেছ—তুমিই আমায় ফেলে দিয়ে গেছ,—আমি নারী, আমি কি কর্‌তে পারি। তুমি কাপুরুষ, তাই এমন ক'রে ফেলে দিয়ে গেছ। আমিত' কিছুই চাইনি। তবে-–তবে—তবে কেন আমায় অ.বার এ সব কথা শোনান।

ঐ বর্ষার নূতন মেঘ এসেছে, ঘোর কালো নীলের ছায়ায় মেঘে ডমরু বেজে উঠেছে, রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝর্ ঝর্ ধারা আরম্ভ হয়েছে, এ আষাঢ়ের নূতন মেঘের গানের দিনে কোথায় তুমি প্রিয়তম! বৃষ্টির জলে ধোয়া সবুজ গাছের পাতায় ফাঁকে ফাঁকে কেমন পাখীরা ভিজ্‌ছে। ও কি, বাইরে এ বৃষ্টির ধারায় মাঝে কে গাইছে – নূতন বর্ষার চঞ্চল ধারার মাঝে আমার এ চঞ্চল মন,—

"বাদল ধারা পড়ছে ঝরে
রইতে নারি ঘরে
(ওগো) রইতে নারি ঘরে।
মনে পড়ে গো তারে আমার
ওই যমুনার তীরে—
পাতা ভিজে আঁখি-নীরে।

ঘর যে হ'ল বার, ও সই
মন যে হ'ল ভোর
আমি কেমনে ছিঁড়ি ডোর,

ওই আষাঢ় বেলা জুড়িয়ে এল
ভিজে পাখী ফিরে -
ডুব্‌ব কি না ভাবছি লো সই
সেই যমুনার নীরে।

হায়। শেষ কি যমুনার জলে জীবনের শেষ—কে জানে? আজ ঐ দূরে বাঁশ-বনের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে—ঐ ও পাশে কেয়াবনের ঝাড়, কেয়ার গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে—তার মাঝে ঐ গান! ও ভিখিরি কি আমার মনের কথা জানে, তাই অমন গান গাইলে। ঐ দূরে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, ডুব্‌লে কি সব জুড়ায় কিন্তু যে তোমায় পাব না, ঐ ভয়—নইলে মরণ ত বরণ করলেই হয়। কে জানে, আমার মনটা আজ যেন কেমন কেমন ক'রে উঠ্‌ছে, কি যে ভাবি, কি যে করি, সব ভুল হয়ে যায়।

চিঠি লিখ্‌তে বারণ কর, আর লিখ্‌ব না--তবে থাকৃতে পারব কি না জানি না। কি জানি—জানি নি, পুরোহিত জানি নি—তুমিই আমার অগ্নি, তুমিই আমার পুরোহিত—তুমি আমার হিতের জন্ত যদি ফেলে দিয়ে থাক, তবে সেই আমার হিত—সেই আমার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল—নইলে আজ এ মনের মাঝে কেবল সব জায়গা থেকে তোমায় দেখ্‌বার আকুলতা জেগেও কেবল মনে হচ্ছে, তুমি কাপুরুষ, তাই আমায় ফেলে দিয়েছ—অথবা আজ পুষ্পকুমারী নূতন গন্ধে তোমার হৃদয় অধিকার করেছে—হয় ত ফুল বদলে সে ফুল পেয়ে আজ তোমার সবই ভুল হয়েছে। নিজে নূতন হয়েছ, তাই আমাকেও নূতন হতে বলেচ। হায় প্রিয়তম, যে ভালবাসে, সে সর্ব্বস্ব দিয়েই ভালবাসে—সে কি ত্যাগের ভয় রাখে। তবে মন মানা মানে না, তাই কেঁদে জানাতে চাই—তাই কাঁদি। এ জীবনে আমার কোন সুখই হ'ল না, একটা শুধু সুদূর দীর্ঘনিশ্বাস—এই নিয়ে হাওয়ার ওপরে ভাস্‌ছি। দয়া হয়, একবার দেখা দিয়ো—দয়া না হয়,—তোমায় ত দিবারাত্রই মনের মাঝে দেখ্‌ছি, তাই আমার মত দুঃখীর পক্ষে ঢের। দেখ্‌ছি দিন ত কেটে যায়—কেটে যাবে। তারপর এক দিন ভোর হবে। কবে হবে, তাই ভাব্‌ছি। ভুলে যদি যাও—পার, ভোল……

ভুলে যদি যাও হে সখা ভুলে যেয়ো একেবারে।
মুখ ফুটে আর বলব নাক, বলতে ভাসি নয়ন-ধারে॥
বুক-ভরা এ ভালবাসা
ভুলে যেয়ো প্রেমপিয়াসা,
এ বাসা যে ভেঙে গেলে শুধু মনে রেখ তারে॥

এমনি ভোরে গাবে পাখী, আমি থাকব মেলে আঁখি,
তেমনি হাসি হাসবে সবাই, বাজবে আমার ছেঁড়া তারে—
ভুলব ভেবে মনে করি,
কান্না ভুলে ছায়া ধরি,
প্রাণে প্রাণে রাখব ভরি গাঁথি মালা প্রাণের তারে॥

(শৈল—ইন্দু)

চিরায়ুষ্মতীষু,

সু-বউ! আমি আর কি বলব। আমি তোদের মত অত লেখাপড়ার ধার ধারিনি—অত দেশও বেড়াই নি। ঘরের কোণে একবার ছাড়া এই যে ঠাকুর নিয়ে, এই আমার দেশ; এই আমার বিদেশ, এখন এই আমার সুখ দুঃখ; এই আমার মরণের নাট-মন্দির। আর এখান থেকে কোথাও নড়ব না। যাদের হাতে তুলে মানুষ করেছিলুম, ঠাকুর তাদের পর ক'রে দেখিয়ে দিলে 'কেরে তোর আপনার'। যাদের মুখ চেয়ে সব ভুলতে গিয়েছিলুম, সে স্নেহের মিষ্টি মুখ আর দেখতে পাইনি। যাদের কথা শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হ'ত—যাদের ঘর-সংসারের ভাবনায় কত রকম ভাবতাম, আজ তারা আমায় তাদের সংসার থেকে একেবারে দূরে রেখে দিলে—আমি আর কি করব। আমার কি হাত—ওই পাথরের ঠাকুর ওইখানে থেকে বসে আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে, তুই একটা গুঁড়ো ও নয় তোর আবার কি?"

অনেক দিন হ'ল এ সংসারে এসেছি—কতদিন তা মনেই পড়ে না। এই সংসারকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে নিলুম—তারপর দেখলুম, কোথায় সংসার, সমস্ত বুকটাই খালি। যখন মনটা কেমন করে, ওই পাথরের কাছে জানাই, মানুষে সে ব্যথা বোঝে না, ওই পাথর আমায় সেই ব্যথা বোঝে, তাই বলে…'ভয় কি, কাঁদিস্ কেন, এই দেখ্ সবাই ত আমি।' বুঝতে পারিনি, চুপ ক'রে থাকি, ভাবি—তাইত।—থেকে থেকে মনে হয়, ওই বুঝি তিনি আঙুল বাড়িয়ে ডেকে বলছেন 'সংসারে যারা ভেঙে গড়তে চায়, তাদের ভাঙা গড়া নিয়ে তারাই থাক্—তুমি চলে এস; চলে এস;

কেন আর মমতা দিয়ে ওর পানে চাও'—যাই, নাথ যাই, সত্যি কতদিন একলা রয়েছ। মন হুহু করে আর ওই পাথরের পানে চাই, সব পাথরের মত শীতল হয়ে আসে। আবার মনে হয়—ওই তিনি ডেকে বল্‌ছেন,—'এত দিন ত সংসার কর্‌লে, কি পেলে বল্‌তে পার, তবে কেন—আমার পিছু পিছু চলে এস—এখানে কার জন্যে ভাব্‌তে হয় না।' যাই নাথ, যাই,—সব ভাবনা ওই পাথরের কাছে ফেলে দিয়েছি, আর ভাবনা কিসের, চল যাই। আমার মন কেমন করে, পাথরের কাছে যাই, বলি কেন আমায় এমন কর—দেখি পাথর হাসে কিছু বলে না।

আমার ওপর রাগ করিস্ কর্, আমার কিছু বল্‌বার নেই, আমার কথা কে শোনে,—তুই শুনিস্, না মায়া শোনে, না কমল শোনে, না সেই হতভাগা নগেনই শোনে। আগে কমলকে যখনই যা বলেছি, সে তাই করেছে, এখন চিঠি দিলে তার জবাব দেয় না। আমার আর ক'দিন, দিন হয়ে আস্‌ছে, তিনি ডাকৃছেন, আর কি থাকৃতে পারি।

সংসার সাজাবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম্। কমলের সঙ্গে যাতে মায়ার বিয়ে হয়,—তার জন্যে ঠাকুরের কাছে মানত কর্‌তুম। কিন্তু হ'ল কি? আমার নগেন ও কমল দুই-ই সমান, কখন তফাৎ কর্‌তে পারিনি, তবে যে আপনার হয়ে খারাপ হয়, তার জন্যে সকল দিক্ হতে বেশী টান আসে। যে ভাল তাকে ভাল বলে আদর করি, যে খারাপ তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখ্‌তে চাই, এমনই হয়। নগেনের একবার বড় ব্যাম হয়, কমল শির কেটে রক্ত দিয়ে তারে বাঁচায়। কমল এখন' নগেনের জন্যে কি করে, সবই ত জানিস্। যখন মায়ার সঙ্গে নগেনের বিয়ে হয়—তখন ত সবাই জান্‌ত মায়ার সঙ্গে কমলের কত ভাব, তবু—তুই ঘট্‌কী হয়ে কেন সে কাজ কর্‌তে দিলি। কমল একটা কথাও কয়নি। আমি নিজে দেখেছি, সেই অতবড় সমারোহ ব্যাপার সব একলা দাঁড়িয়ে করেছে, আর তার তাতে কত যেন আহ্লাদ। যখন বর-কনে এ'ল, আমি বল্লুম কমল, এইবার তোর ফুল ফুটলেই হয়—কমল উত্তর করেছিল, 'ফুল ফুটলেই ঝরে বৌদি—তার আর কি—হবে।' বলে হেসে চলে গেল, তখন আমি বুঝিনি যে, সে নিজেকে কি করে বলি দিচ্ছে। তার পর থেকে আর সে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে চাইত না—লোকের সঙ্গে এক ওই তোর অমর ছাড়া আর কার সঙ্গে মিশ্‌ত না।—আজ ত সব ছেড়ে দেশত্যাগী হয়ে গেল—দাওয়ানকে ত বলেছে—দেখ যেন বৌদির কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়। আমার আবার ত্রুটী—হায় রে।

মায়াকে কত বুঝিয়েছি, আমি বিয়ের পরই বুঝেছিলাম, কি সর্বনাশ হ'ল—

তখন অনেক কেঁদেছি—আর ওই পাথর হেসেছে। ছুঁড়ি কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। কত ভাল কথা বলেছি, কত মান-সম্ভ্রমের কথা কয়েছি—কিছুতেই কিছু হয় নি—সে ত হাবা নয়, যদি হাবা হ'ত, তা হলে হয় ত অন্ত রকমে ভুলে যেত। এ দারুণ যাতনার কি ওষুধ বল।

"যার এ দায় সেই ত জানে
পর কি জানে পরের দায়"

মেয়ে মানুষের যদি স্বামী পেয়ে না ভুল হয়, তবে কি পথের লোকে তার দুঃখ বোঝাবে। যা হবার তাই হয়, যা হবার নয় তা হয় না। নগেন যদি ভাল হ'ত, যদি আদর পেত, হয় ত বা কোন দিনে সব বদল হয়ে যেত। তার চোখের সামনে, তার ঘরে বেশ্যা আস্‌বে, সেখানে বসে ওই নরকের আমোদ হবে—তার প্রাণের ভেতর কেটে কেটে নুন ঢেলে দেবে—একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ—তবে আর কি হবে। আমার আর কাউকে কিছু বল্‌বার নেই—যা ওই পাথর করে, তাই হবে। আমার আর সোনার সংসারের সাধ নেই। এ সংসারের কোন্ খানটায় যে আমি আছি, তাই আমি খুঁজে পাইনি। আমি আর বাঁধন দেব কি? সোনার সংসার সাজিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু যাদের নিয়ে সংসার, তারা কি সোনার যে হার গাঁথব। আমায় ছেড়ে দে বোন্—আর আমায় ধরিস্ নি।

সুধীরকে আমার আশীর্ব্বাদ দিস—খোকা ভাল আছে ত? মায়াকে আর কি বল্‌ব, ঠাকুর তাকে শান্তি দিন্। নগেন এখানে এমন আরম্ভ করেছে যে, চীৎকারের চোটে পাখীগুলো সব রা ভুলে গেছে। একটা দাড়িওয়ালা নেড়ে—সেটা এমন চেঁচায় যে, ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যাই। যদি কের্ত্তনওলারা গান গাইতে আসে, তাদের তাড়া করে—মার্‌তে যায়—আর নিজেরা ওই চেঁচায়—আর মনে করে—বেশ হচ্ছে বাঃ। বাড়ী আলাদা হয়েও—আওয়াজত আর বন্ধ হয় না। মায়া তোর কাছেই থাক্, এখানে এলে আরো এই সব দেখ্‌বে আর জ্বলে মর্‌বে। আমায় তোরা আর ডাকিস্ নি। আমি কিছুর ভেতর নেই। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদিকা
ঠাকুরঝি।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

পাগল রাতে

আঁধার পানে বিজলী হানে
বক্র কশাঘাত।
গোপন রথে গহন পথে
আস্‌চ তুমি কোথা হ'তে
নিবিড় কালো রাত!

তোমার জোড়া কালো ঘোড়া
কোথায় চলে আজ।
তাদের খুরে আগুন উড়ে—
পাগল বায়ে গগন জুড়ে
উঠ্‌ছে ডাকি বাজ!

এ উড়্‌ছে ঝড়ে আঁধারপরে
কালো উত্তরীয়!
রথের চূড়ে নিশান উড়ে
ঈশান কোণে উচ্চস্বরে
বিষাণ বাজে কি ও!

নাহি গো জানি বজ্র হানি
আস্‌চ কোথা হ'তে।
অশ্ব দুটি বল্‌গা টুটি
পাগল হয়ে ধাইছে ছুটি
আগল-ভাঙা পথে!

ভাব্‌চি আমি—ক্ষণেক থামি
যদি রথের ‘পরে,
লইতে মোরে সঙ্গী ক’রে
আঁধার-মাঝে আমায় হরে
হঠাৎ খেয়াল-ভরে !

ক্ষ্যাপার বেশে আগম দেশে
যেতাম তোমার সাথ !
বজ্র আঁকা রথের চাকা
বিশ্বে দিত প্রবল ঝাঁকা
পাগল কালো রাত !

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।

যাহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতিগমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর; তিনি ব্রহ্ম।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিগমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

রসো বৈসঃ। রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

উপনিষদের ইহাই বাণী। এখন, একবার নিজের বুদ্ধি জ্ঞানে বিবেকের সহিত সংযুক্তপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ব্রহ্মের যখন সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ না হয়, ব্রহ্ম তখনই নির্গুণ। কিন্তু নাস্তিকের 'নাস্তি'র মত এই নির্গুণ যে কিছুই নহে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না। মাকড়সা যেমন বিস্তৃত জাল গুটাইয়া উদরস্থ করে, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মও তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ড-জাল গুটাইয়া আপনাতে লিপ্ত করেন। নিরাকার-সাকার, ভৌতিক-সাকার, সূক্ষ্ম-স্থূল,

যে কোন মহিমা বা গুণ ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তৎসমুদয়ই ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। কেবল ব্রহ্মের ইচ্ছা প্রকাশ থাকে না; এই কারণে তৎসমুদয়ের প্রকাশ ও বিস্তৃতি হয় না। অতএব, ব্রহ্মের ইচ্ছা যখন অপ্রকাশ থাকে, তখনই তিনি নির্গুণ।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ তিনি আপনার ইচ্ছা আপনিই প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশের অন্য কারণ নাই। যে মায়ার নিমিত্ত জগৎ-ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন বোধ হয়, সেই মায়া যদি না থাকে, তাহা হইলে এখনও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, পরেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালক্রীড়া শেষ হইলে, সে যেমন তেমনই থাকে, কেবল ক্রীড়াই থাকে না; সেইরূপ পরেও ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না।

এই নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আপনাকে বিস্তৃত করিতে, অর্থাৎ তিনি এক ছিলেন, আপনাকে অসীম অনন্তরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণেরও প্রকাশ হয়। অতএব, ইচ্ছা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নির্গুণ সগুণ হইয়া থাকে। যখন তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ হয় না, তখন তিনি নির্গুণ; যখন ইচ্ছার প্রকাশ হয়, তখনই তিনি সগুণ।

এই সগুণ দুই প্রকার,—নিরাকার ও সাকার। যখন কেবল ভাবময়, নিরাকার জ্যোতির্ম্মাত্র, তখনই নিরাকার। যখন সেই নিরাকার জ্যোতিঃ কোন অবয়ব-বিশিষ্ট হয়, তখনই নিরাকার-সাকার। সাধন-সিদ্ধির সময় সাধনের ধন ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার—সাকাররূপেই সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। যাঁহারা ঐ প্রকারে ভগবানের দর্শন-লাভ করেন, কেবল তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,'প্রাপ্তির ঘরে জ্যোতির্ম্ময়, মারা যায় রে এ নিরাকার।' ইহা গ্রন্থলিখিত কথা নহে, সাধকের আত্মপ্রত্যক্ষ সত্য।

অতএব, সাকার আবার দুই প্রকার,—নিরাকার-সাকার ও ভৌতিক-সাকার। নিরাকার-সাকার যেমন অবয়ব-বিশিষ্ট, তেমনই মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময়, অসীম ও অনন্ত;—কেবল আত্মপ্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা দেখা যায় না, কেবল আত্মাতেই তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে।

ভৌতিক-সাকারও অবয়ব-বিশিষ্ট; কিন্তু নিরাকার-সাকারের ন্যায় মুক্ত নহে, আবদ্ধ। শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি জন্তু যেমন একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপরের ঘরস্বরূপ আবরণ চলে, সেই প্রকার ভৌতিক-সাকারের অবয়ব-রূপ ঘর অর্থাৎ শরীরও চলিয়া থাকে এবং সে ইচ্ছা করিলে আপনাকে প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিতে পারে না। প্রকাশ হইতে হইলে যোনি এবং অপ্রকাশ হইতে হইলে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নিরাকার-সাকার ও

ভৌতিক-সাকারে এইরূপ অনেক পার্থক্য আছে। নিরাকার-সাকারও অবয়ববিশিষ্ট, ভৌতিক-সাকারও অবয়ববিশিষ্ট। নির্গুণেই কেবল অবয়ব নাই; নতুবা সগুণ মাত্রেই কোন না কোন অবয়ব আছে।

এই অবয়ব দুই প্রকার,—মুক্ত ও অমুক্ত; নিরাকার অবয়ব মুক্ত; ভৌতিক অবয়ব অমুক্ত অর্থাৎ বদ্ধ। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইবামাত্র অগ্রে নিরাকার-সাকারে আপনাকে বিস্তার করিয়া পরে ভৌতিক-সাকারে বিস্তৃত হইয়াছেন।

অতএব, এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই প্রকার জগৎ বিদ্যমান আছে;—আধ্যাত্মিক জগৎ ও ভৌতিক জগৎ; আধ্যাত্মিক জগৎ, অর্থাৎ যে জগৎ কেবল আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। ভৌতিক জগৎ, অর্থাৎ যে জগৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়।

এই আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক জগৎ কেবল নির্গুণ ব্রহ্মের বিস্তৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং কি আধ্যাত্মিক, কি ভৌতিক জগৎ, সকলই ব্রহ্মময়। এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্মময়, এইরূপ জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।

অতি সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে নির্গুণ ও সগুণের কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম। যাঁহাকে আমি আমার উপদেষ্টা ও গুরু বলিয়া মানি, সেই কাঙ্গাল হরিনাথ যে কথা, যে তত্ত্ব, যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, আমি তাহারই আবৃত্তি করিলাম মাত্র। তত্ত্বোপদেশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কাঙ্গাল হরিনাথের মত প্রচারের জন্যই তাঁহারই উক্তি আমি যথাসাধ্য বিবৃত করিলাম। সময়ান্তরে এই তত্ত্বগুলির স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রয়াস করা যাইবে।

শ্রীজলধর সেন।

মায়া

কেন এ ক্রন্দন !
কুসুমিত লতিকার নেহারি' মরণ
বৃথা হায় কেন এ ক্রন্দন !
ফুল-পাতা সব যাবে
শুধু তার স্মৃতি রবে
তাও কাল ধীরে ধীরে করিবে হরণ—
তবু কেন বৃথা এ ক্রন্দন !

কাল আসে পুনঃ চ'লে যায়
কোটী আঁখি তার নাহি চাহে করুণায়
শুধু আসে আর চ'লে যায়।
জীবনের শত কথা
মরমের শত ব্যথা
উঠে আর নিভে শুধু জলবিম্ব প্রায়—
কাল—সে যে শুধু আসে আর চ'লে যায়।

তবু হায় কেন এ ক্রন্দন !
প্রতি পলে তিলে তিলে কেন এ মরণ
কেন হায় এ মায়া-বন্ধন !
খদ্যোতের অগ্নি সম
জ্বলি' শুধু নিভে পুনঃ
তবে কেন অশ্রু-জলে ভিজাবি নয়ন—
কার তরে এ মায়া বাঁধন !

ক্ষণিকের তরে সবই হায়!
বৃথা সাধ ধ'রে রাখা অন্তঃপুরিকায়—
যাক তবে যদি চ'লে যায়!
ক্ষণিকের সঙ্গে সঙ্গে
খেল প্রাণ-প্রাণ-রঙ্গে
পূর্ণ করি নাও ওগো যত ক্ষণিকায়—
খেলা সবই ক্ষণিকের হায়!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শৌর্য্য

১

রতনগড়, সেকেলে ধরণে তৈয়ারী এক অতি প্রাচীন দুর্গ। যমুনা হইতে খাল কাটিয়া তাহার খাত পূর্ণ করা হইত। বহুদিন সংস্কারের অভাবে বর্ষা ভিন্ন, খাতে আর এখন যমুনার জল আসে না।

অরুণসিংহ এই দুর্গের বর্ত্তমান অধিকারী। বয়স আশী বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। হাতে আর সে বল নাই, মনে আর সে উৎসাহ নাই—কাজেই রতনগড়ের অবস্থাও বৃদ্ধেরই অনুরূপ।

প্রাচীরের উপর বড় বড় অশ্বত্থ বট মাথা তুলিয়া দুর্গটাকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতি যেন বৃদ্ধের লজ্জা-নিবারণের জন্য একটা সবুজ পর্দ্দার আবরণে সমস্ত জিনিষটা ঢাকিয়া দিতে চায়।

দুর্গের পিলখানায় হাতী নাই—আছে কেবল কয়েকটা ভারী ভারী মর্চ্চেধরা প্রকাণ্ড লোহার শিকল। আস্তাবলে গোটা দুই কঙ্কালসার ঘোড়া ক্ষুধার জ্বালায় অনবরত হ্রেষারব করিয়া খুরের ঘর্ষণে পাকা মেজেতে গভীর গর্ত্ত করিয়াছে।

চাকর-বাকরের মধ্যে আছে কেবল নিমকহালাল ভিখু। বাকী সকলে যথাসময়ে বিদায়গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে।

অরুণসিংহের একমাত্র পুত্র অজিতসিংহের এই প্রাচীন গড়ের প্রতি কোন মমতাই ছিল না। অল্পবয়সে মাতার মৃত্যুর পর সে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হয়। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সে মীরপুরের তালুকদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেইখানেই সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে থাকে। বংশের অতীত গৌরবরক্ষার ভার বৃদ্ধের ক্ষীণহস্তে তখনও ছিল এবং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার দৃঢ়সংকল্প সেই প্রাচীন-অন্তরে চিরদিন নবীনই ছিল;— পুত্রের যেন তাহাতে কোন দাবী বা অধিকার আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই।

সকালে স্বহস্তে অর্ঘ রচনা করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা শেষ করিতে প্রায় দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইত। আহার ও বিশ্রামের পর দুর্গের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পায়চারী করিতে করিতে যখন সূর্য্য পাটে বসিতেন, তখন অরুণসিংহ দরবার-ঘরের একপ্রান্তে বিস্তৃত একখানি জীর্ণ গালিচার উপর বসিয়া ওস্তাদজীর শেখান পূরবী রাগ সেতারে আলাপ করিতেন। সেতারের ঝঙ্কার ধূপের ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যখন ঘরের ঝাড়ে লণ্ঠনে ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি তুলিত, তখন অরুণ-সিংহের চোখে অকারণে জল আসিয়া পড়িত। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেই গালিচায় শুইয়া পড়িয়া এক একদিন সেইখানেই রাত্রি কাটাইতেন।

২

তখনও জবার অর্ঘ বৃদ্ধের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে—অরুণসিংহ আসনের উপর সোজা হইয়া বসিয়া। চক্ষু দুইটি নিমীলিত, মুখ উদ্বেগে জবার চেয়ে অধিক রাঙা!

দিক্‌চক্রের উপর সূর্য্য যেন সেই অর্ঘের অপেক্ষাতেই স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

পিছন হইতে ভিখু ডাকিল, "মহারাজ—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া—অরুণসিংহ সূর্য্যদেবকে অর্ঘ নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"কি!"

"ফটকে কয়েকজন ঘোড়-সওয়ার অপেক্ষা করচে—তারা দেখা করতে চায়।"

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আস্‌তে দে তাদের।"

তিন জন অশ্বারোহী সৈনিক প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

"কে তোমরা,—কি চাও ?"

"হুজুর, আমরা রাণা বিক্রমসিংহের নিমক খাই, তাঁর চিঠি তামিল করতে এসেছি।"

বৃদ্ধ অধর দংশন করিয়া বলিলেন,—"দেখি।"

পত্রে কয়েক ছত্র লেখা ছিল ঃ—

"আপনার বীর পুত্র অজিতসিংহ আপনার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া গত কল্য রাত্রে বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রা করিয়াছে। তাহা আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। তাহার অসামান্য বীরত্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়-জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।"

বৃদ্ধ অবজ্ঞাভরে পত্রখানা বামদিকে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাক্‌ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ কথা কহিতে সাহস করিল না।

খানিক পরে অরুণসিংহ বলিলেন,—"যেতে পার তোমরা এখন।"

সৈনিকদের মধ্যে একজন একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"রাণার হুকুম-মত আমি কয়েকটি কথা বল্‌তে চাই।"

"বেশ, বল।"

"অজিতসিং যে দলে ছিল, আমি তার অধ্যক্ষ। বীরত্বের সে কোন ধার ধার্‌ত না, অজিত প্রেমিক ছিল। আমি তাকে কাপুরুষ বলেই জান্‌তাম। এমন কি, এই কথা বলে অনেক দিন আমি তার নামে শেকায়েত পাঠিয়েছি। তার পর, যে রাত্রে শত্রু আমাদের আক্রমণ করলে, হঠাৎ তার হৃদয় যেন বীরত্বে নেচে উঠ্‌ল! সে মাত্র দশ জনকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়ে আপনার প্রাণ দিল। আমি তার বীরত্বের কথা বিশ্বাসই করতে পারতুম না, যদি তার ভাঙ্গা তরোয়ালখানা না পাওয়া যেত ;—কিন্তু তার শবের কোন সন্ধানই হয় নি। তার বীরত্বে আমি সন্দেহ করেছিলাম,

তারই শাস্তির স্বরূপ রাণা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে। আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন।”

অরুণসিংহ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—“আচ্ছা, সে পরে বিবেচনা করব,—তোমরা এখন যেতে পার।”

সৈনিকেরা সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

অর্দ্ধরাত্রি। অরুণসিংহ অস্ত্রাগার হইতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল বাহির করিয়া আনিয়া রাখিলেন। পার্শ্বে রাণার পত্রখানা পড়িয়া আছে।

একটা দুর্দ্দমনীয় চিন্তা যেন তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পায়চারী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মাথার চুলগুলা যেন খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। কি বলিতেছেন—শুনা যায় না।

অরুণসিংহ সিংহ-গর্জ্জনে ডাকিলেন,—“অজিত, অজিত—বেরিয়ে এস।”

পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল। গুড়ি মারিয়া একটি যুবক বাহিরে আসিল।

অরুণসিংহ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—“কাপুরুষ!”

যুবক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিল।

“বংশের মুখ হাসালি!”

যুবক নীরবে রহিল।

“এ গ্লানি আমি সহ্য করতে পারব না! তোমাকে হত্যা করবার জোর আর এ হাতে নেই,—যদি থাকৃত, তা' হলে কালই তোমাকে দেখ্‌বামাত্র শেষ ক'রে দিতুম। তাই ভাবছি, কি করি। সমস্ত দিন ভাব্‌ছি—তার পর কাটার উপর নূনের ছিটে—ঐ চিঠিখানা! উঃ, ভগবান্!—কি তীব্র পরিহাস; অজিত, অজিত, তুমি কি আমার—” বৃদ্ধের আর কথা বাহির হইল না।

যুবক তীরবেগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—“কি চিঠি বাবা—কার চিঠি?”

অরুণসিংহ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে পত্রখানি দেখাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণা অষ্টমীর মলিন চাঁদ, কালো আকাশকে আগুনের রঙ্গে রাঙ্গিয়া সবে দেখা দিতেছে। বটের ডালে পেঁচা বসিয়া ডাকিতেছে।

দমকা বাতাস বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গে নিঃশ্বাস হানিয়া গেল—এ যেন পূর্ব্ব-পুরুষের ক্ষোভের দীর্ঘশ্বাস!

দীপের ম্লান আলোতে যুবক পত্র পাঠ করিয়া তরবারিখানা তুলিয়া লইল। তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মর্চ্চেধরা খাপ হইতে অসিখানাকে মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে সশব্দে ভূমিতে ফেলিয়া দিল। সেই শব্দে সেতারের তারগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল—ঝাড়ের মধ্যে তাহার প্রতিধ্বনি গুমরিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অজিত কোষ হইতে আপনার তরবারি বাহির করিয়া আপনার বক্ষে বসাইয়া দিতেছে। অরুণ-সিংহ এক লম্ফে গিয়া সেই তরবারি ধরিয়া বলিলেন,—"আত্মহত্যা করিস্‌নে। কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবার ঐটেই সব চেয়ে অপকৃষ্ট পথ।—এ কি! রক্তপাত করেছ?—এ বংশের রক্তপাত কখনও ব্যর্থ হয়নি বাপ! যদি প্রাণই দেবে, তবে ফিরে যাও যুদ্ধক্ষেত্রে—শত্রুর রক্তে তোমার সকল কলঙ্ক ধুয়ে এস।"

অজিত মস্তক অবনত করিয়া কোষের মধ্যে তরবারিখানা পূরিয়া দিল।
"তবে তাই হোক্, বাবা।"

অবিলম্বে অশ্বের পদশব্দে রতনগড় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অরুণসিংহ প্রসন্নমুখে পুত্রকে বিদায় দিয়া শান্তচিত্তে শয্যা গ্রহণ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

প্রভাতে অরুণসিংহ স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি একান্ত তৃষিত হইয়া মরুভূমিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন—কোথায় জল! কোথায় জল! এমন সময়ে একটা পান্থ-পাদপের সন্ধান মিলিল। তরবারি আঘাত করিয়া রস পান করিতে করিতে মনে হইল, অজিতের বক্ষের ক্ষতনিঃসৃত রক্তধারায় তাঁহার তৃষ্ণা দূর হইয়াছে।

শ্রীঃ............

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার

এই মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের একটি প্রধান ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করেন, তখন সংস্কার-যুগের এই প্রতিবাদকে বাঙ্গালী সমাজ একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছিল; বাঙ্গালী সমাজ ইহাদ্বারা বিশেষ বিচলিত হয় নাই। কেন না—দেবেন্দ্রনাথের বা তদীয় ব্রাহ্মসমাজের এই মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারে, কি তত্ত্ববিচারের দিক্ দিয়া,—বা কি ধর্ম্মসংস্কারের দ্বারা, নূতন কিছুই দিবার ছিল না।

রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীরও কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৭৯০ খৃঃ "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া মূর্ত্তিপূজার প্রতিবাদ করেন। তাহার পর ১৮১৪ খৃঃ হইতে রাজা রামমোহন—হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে নিম্ন অধিকারীর উপযোগী ও বেদবিরোধী, কাজেই অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃত পক্ষে তত্ত্ববিচার ও ধর্ম্মান্দোলনের দিক্ হইতে রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচারই মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে বাঙ্গালী সমাজকে তৎকালে উদ্বুদ্ধ ও সম্যক্ বিচলিত করিয়াছিল, এবং মূর্ত্তিপূজার সমর্থনকারী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচার দ্বারাই রামমোহনকে পরাভূত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন্ পক্ষ হারিয়াছিল এবং কোন্ পক্ষ জিতিয়াছিল—এইক্ষণে তাহার মীমাংসা হওয়া একাধিক কারণে অসম্ভব ও অসমীচীন। রাজা রামমোহন যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া, যে সমস্ত কারণে মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার বিপক্ষের পণ্ডিতগণ হয় ত সে ভূমিতে না দাঁড়াইয়া, সেই সমস্ত কারণগুলির কতক না বুঝিয়া এবং কতক অকারণ মনে করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষ সমভূমিতে দাঁড়াইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আমি মনে করি না। কাজেই এই অসমান বিচার-ফলের তুলনা খুব কষ্টসাধ্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু বিচারফল যাহাই হউক, এখানে বলিবার কথা এই যে, রামমোহনের আহ্বানে, তাঁহার শাস্ত্রের দোহাই ও যুক্তির বড়াইয়ের

উত্তরে যে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শাস্ত্র ও যুক্তি লইয়াই আসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ইহা সত্য, এবং সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, রামমোহন যে সমাজকে, এবং সমাজ অঙ্গের যে স্থানটিতে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালী সমাজ সে দিন মরে নাই, বাঁচিয়াই ছিল, এবং সমাজের সেই অঙ্গটিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল না—কেন না, আঘাতের উত্তরে প্রতিঘাতই ফিরাইয়া দিয়াছিল। যে মৃত, সে আঘাতে সাড়া দেয় না। রামমোহনের মূর্ত্তি-পূজার অস্বীকারে,- সেই সংস্কারের আঘাতে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ নিস্পন্দ ও অসাড় পড়িয়া থাকে নাই। সে আহত হইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়াছিল। জীবনের পরিচয়ই সে দিয়াছিল,—মৃত্যুর নহে। যাঁহারা সংস্কারযুগের রক্ষণশীল সমাজকে মৃত বলিয়া ধারণা করেন—আমরা তাঁহাদিগের মতকে প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য মনে করি।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, রাজা রামমোহনের সময়েই মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার লইয়া বাঙ্গালী সমাজে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পরে এই আন্দোলনের নূতনত্ব, গুরুত্ব ও এমন কি, আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতাও যথেষ্ট কমিয়া আসিয়াছিল। কেন না—যদি রামমোহনের বিরোধী হিন্দু পণ্ডিতগণ, রামমোহন যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করিয়াছিলেন, বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে রামমোহনের অনুকারী দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও যে তাহা বুঝিতে পরিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না. এবং দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মূর্ত্তিপূজা অস্বীকারের আভ্যন্তরিক যুক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন দিক্ বুঝিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া দেবেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার বাঙ্গালীর সংস্কারযুগে বিশেষ কোন আন্দোলন জাগাইতে পারে নাই।

রাজা রামমোহন এক নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান, ধারণা ও উপাসনাকে সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মূর্ত্তিপূজাকে বেদবিরোধী, সুতরাং অশাস্ত্রীয়, এবং নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যানে অসমর্থ নিতান্ত অজ্ঞ নিম্নাধিকারীর যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ অশাস্ত্রীয় মূর্ত্তিপূজা যে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হইয়া একরূপ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ রাজা রামমোহন বলেন যে, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের স্বার্থপরতা। মূর্ত্তিপূজায় ব্রাহ্মণদের ঐহিক স্বার্থ বিদ্যমান। সুতরাং বাঙ্গালা দেশ হইতে ইহার উচ্ছেদ নিতান্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূর্ত্তিপূজা যে এ দেশে টিকিয়া আছে, তাহা শাস্ত্রের জোরেও নয়, যুক্তির জোরেও নয়, তাহা শুধু ব্রাহ্মণদের নিতান্ত স্বার্থপরতার জোরে। তদ্ব্যতীত রাজা রামমোহন এই মূর্ত্তিপূজাকে পৌরোহিত্যের ও জাতিভেদের

সহিত এবং জাতিভেদকে রাজনৈতিক একতার অভাবের সহিত এবং রাজনৈতিক একতার অভাবকে ঐহিক 'লোক-শ্রেয়ঃ'—ব্যাঘাতের সহিত অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত করিয়া যে সমস্ত কারণে এবং যে দিক্ হইতে ইহার উচ্ছেদকল্পে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন,—সেই সমস্ত কারণে এবং সেই সমস্ত দিক্ দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া কোন প্রমাণ আমরা পাই না।

রাজা রামমোহন হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ক্রম-বিকাশের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় হইলেও একেবারে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য, এমন কথা বলা যায় না। রাজা রামমোহন বেদ বলিতেই বেদের অন্ত বা উপনিষদ বুঝিতেন। বেদের আদিযুগ তাঁহার দৃষ্টিকে সম্যক্ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। তা ছাড়া পৌরাণিক যুগের উপর তাঁহার বিচারকে কোন ক্রমেই সুবিচার বলা যায় না। এই পৌরাণিক যুগে আবার তন্ত্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ আকর্ষণ ছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভাগবতের উপর তেমনি তিনি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। পৌরাণিক যুগকে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া দেখিতে গিয়া রাজা রামমোহন দূরদর্শিতার পরিচয় সামান্যই দিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগের কতকগুলি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও মূর্ত্তিপূজা এই যুগের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবিকাশ হইতে তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পৌরাণিক যুগের মূর্ত্তিপূজার সহিত এই যুগের অত্যুন্নত ধর্ম্মবিকাশের কোন সামঞ্জস্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে শুধু মূর্ত্তিপূজায় ব্যর্থ পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিয়া যে তিনি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাই নহে। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এ দেশে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের বঙ্গসাহিত্যেও তাহার প্রমাণের অভাব হয় না। রাজা রামমোহন শুধু তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে তান্ত্রিকের রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বারাই দেখিয়াছেন, এবং তাহা দেখিয়াছেন বলিয়াই তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র সুবিচার ত করিতে পারেনই নাই, পরন্তু সমধিক অবিচার করিয়াছেন, এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাধনাঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তাহার তত্ত্ববিচারের সম্পর্কেও তিনি পাণ্ডিত্যের অভাবই দেখাইয়াছেন। অথচ এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-পূজা, চিন্ময় বিগ্রহের মৃন্ময় মূর্ত্তিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ ও দার্শনিকগণ যে গভীর ধর্ম্মানুভূতি ও গবেষণা উত্তরাধিকারিসূত্রে বাঙ্গালী জাতির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আমাদের আত্মার কল্যাণকামী এদেশের খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের অথবা দেবেন্দ্রনাথ বা তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিবাদ নিতান্তই অজ্ঞ অনধিকারীর প্রতিবাদ। কেন না, ইহা যাহাকে প্রতিবাদ করা হইতেছে,

তাহাকে কিছুমাত্র না জানিয়া প্রতিবাদ। দেবেন্দ্রনাথ বা খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ আমাদের দেশের মূর্ত্তিপূজাকে, কি তত্ত্বের দিক্ দিয়া, কি সাধনাঙ্গের দিক্ দিয়া, কি ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিক্ দিয়া কোন দিক্ দিয়াই জানিতেন না। জানিবার চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ত দূরের কথা, রাজা রামমোহনের প্রতিবাদও তর্কের দিক্ দিয়া ঝাঁঝালো হইলেও শাস্ত্রবিচারের দিক্ দিয়া খুব উচ্চ শ্রেণীর নহে। 'গোস্বামীর সহিত' বিচারে, মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারে, রামমোহন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ববিচারে—যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা খণ্ডন করিতে পারি না—অথবা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারি—এমন নয়।

রামমোহন সম্বন্ধে যাহা এইরূপ, দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহা আরও কত বেশী প্রযুজ্য। রামমোহন গোস্বামীর সহিত বিচারে ভাগবতকে বেদান্ত-ভাষ্য বলিয়া অস্বীকার, গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া অস্বীকার, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অস্তিত্বের অস্বীকার প্রভৃতি করিতে যাইয়া—বৈষ্ণব শাস্ত্রে যতটুকু প্রবেশ ও অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ কি তাহাও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন? তন্ত্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত অজ্ঞান। শাক্ত, বৈষ্ণব, বাঙ্গালা দেশের এই দুই প্রধান ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনার সহিত কিছুমাত্র সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ না করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনার মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিলেন। বাঙ্গালী হিন্দুর মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিবার কি অধিকার দেবেন্দ্রনাথের ছিল, তাহা আমরা জানি না।

রাজা রামমোহন প্রধানতঃ ধর্ম্মের তত্ত্ববিচার করিয়াছেন। আমাদের দেশে ধর্ম্মের তত্ত্বের সহিত সাধনা অচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাধন ছাড়িয়া তত্ত্ববিচার আমাদের দেশের রীতি ছিল না। ইহা রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে বেশী করিয়া সংস্কারযুগের নূতন আমদানী। সাধনার দিক্ দিয়া রাজা রামমোহনের একটা নিজস্ব ধর্ম্মসাধনার পদ্ধতি ছিল,—যাহা হয় ত ধর্ম্মজগতে এক নূতন আবিষ্কার। এ বিষয়েও আবার সকলে যে একমত নহেন, তাহাও জানি। তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, রামমোহন আমাদের দেশের ও জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের তত্ত্বালোচনা যত গভীরভাবেই করিয়া থাকুন, এবং ধর্ম্মের তত্ত্বালোচনার স্রষ্টা বলিয়াই জগতে পূজ্য হউন, তিনি আমাদের দেশের ধর্ম্মের সাধনাঙ্গের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন না। তন্ত্রের সাধনা তাঁহার পরিচিত ছিল, এমন প্রমাণ আমরা পাই। কিন্তু এমন প্রমাণ আমরা কিছুই পাই না যে, বৈষ্ণব সাধনায় তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার ছিল। ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব, সাধনপথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের

নিকট প্রকাশিত হয়। যে সাধনপথে অগ্রসর হয় না, তাহার নিকট ঐ সমস্ত তত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকে। সুতরাং সে সাধক ত নয়ই, সে তত্ত্ববিচারেরও সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারে না। ✓ আশ্চর্য্য নয় যে, এই জন্যই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ প্রভৃতির অস্তিত্বে ও মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারে,—তত্ত্ববিচারের দিক্ দিয়াও রামমোহনের প্রতিভা তেমন বিকাশ লাভ করে নাই। কেন না, রামমোহন বৈষ্ণব-সাধনার অনধিকারী ছিলেন। মূর্ত্তিপূজা বাঙ্গালী হিন্দুর একটা ধর্ম্মসাধনা। যাহা সাধনার বস্তু, রাজা রামমোহন তাহা লইয়া করিয়াছেন শুধু তর্ক ও বিচার। কাজেই দেশের সাধন-পদ্ধতি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর দিয়াছে—ইহ বাহ্য। রাজা রামমোহনের মত ধর্ম্মের অতবড় তত্ত্ববিচারকের আঘাতকেও উপেক্ষা করিয়া মূর্ত্তিপূজা বাঙ্গালাদেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে না কেন—তাহা আজ সংস্কারযুগের অন্তে আমাদের কি স্থির-ভাবে, ধৈর্য্যের সহিত ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয়? মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সংস্কারযুগের শতাব্দীব্যাপী আন্দোলন ব্যর্থ হইল কেন? দোষ কি শুধু মূর্ত্তিপূজারই?—কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? যদি রামমোহনের সাধনা না থাকায় শুধু তত্ত্ববিচারের দিক্ দিয়া মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার ফলদায়ক না হইয়া থাকে, তবে দেবেন্দ্রনাথ কোন্ গুণে রাম-মোহনের পরে মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়া সংস্কারযুগকে ফলদায়ক করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন? দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত ধর্ম্মসাধনায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডফ্ প্রভৃতি খৃষ্টান পাদ্রীদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর ছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার ও খৃষ্টান পাদ্রী-দের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার—বাঙ্গালী হিন্দু সংস্কারযুগে ঠিক সমানভাবেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, এবং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ধর্ম্মজগতে নিগ্রো-জাতির সহিত সমভূমিতে দণ্ডায়মান, এমন কথা নিতান্ত অর্ব্বাচীন ব্যতীত কেহই বলিবে না। অথচ নিগ্রোজাতির কাল পাথরপূজার সহিত, বাঙ্গালীর নারায়ণশিলামূর্ত্তির পূজা—শুধু এদেশে আগত পাদ্রীরাই তুলনা করেন নাই, ব্রাহ্মরাও কেহ কেহ করিয়াছেন। নিগ্রোজাতির কাল-পাথরপূজার পশ্চাতে ঐ জাতির ধর্ম্মচিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সহিত—বাঙ্গালীর নারায়ণ-শিলা-পূজার পশ্চাতে বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মসাধনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তুলনা করিয়া ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচার কেহ এ যুগে—নিতান্ত পাদ্রী কিংবা-ব্রাহ্ম ভিন্ন নিগ্রোর ফেটিস্ পূজা আর বাঙ্গালী হিন্দুর শালগ্রামশিলাপূজা এক বস্তু বলিয়া বলিবে না।

সংস্কারযুগ যে বাঙ্গালীর মূর্ত্তিপূজার প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাহার মূলেও বহুপরিমাণে ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচার সম্বন্ধে ভীষণ অজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল। রামমোহনে

এই অজ্ঞতা অধিক ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনুবর্ত্তীদের মধ্যে পাদ্রীগণের দেখাদেখি এই অজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে ছিল।

রাজা রামমোহন প্রথম বয়সে আরব ও পারস্যভাষা শিক্ষা করেন। এই ভাষার সাহায্যে মুসলমানধর্ম্মে প্রবেশ তিনি সহজেই লাভ করেন। মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বালক রামমোহন মূর্ত্তিপূজার উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। মূর্ত্তিপূজার উপর বিদ্বেষভাব লইয়াই তিনি হিন্দু-শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং ইহাকে বেদবিরোধী ও নিম্নাধিকারীর যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন। পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টানধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি খৃষ্টানদের ভজনালয়ে গিয়া উপাসনা করিতেন—ইহাও আমরা দেখিয়াছি, এবং স্বাজাত্যবোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কিরূপে তিনি খৃষ্টান ভজনালয় পরিত্যাগ করিয়া,ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন—তাহাও দেখিয়াছি। এই ব্রহ্মসভাকে কোন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে হিন্দু আকার দেওয়া হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্য সভা করিয়া সকলে মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনা করার মূলে খৃষ্টানধর্ম্মের প্রেরণা বহুপরিমাণে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং সংস্কারযুগে রামমোহনের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারের মূলে মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মের প্রেরণা আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পাবে না। রামমোহনের ব্রহ্মসভা যে সার্ব্বভৌমিকতার উপর স্থাপিত, তাহা প্রধানতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান এই দুই বিশেষ ধর্ম্মের সংঘাত জনিত। রামমোহনের এবংবিধ ব্রহ্মসভা মূর্ত্তিপূজাকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে অস্বীকার করে। এই ব্রহ্মসভা কালে দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মূর্ত্তিপূজার অস্বীকারের ইহাই ইতিহাস।

অনেকে বলেন যে, অদ্বৈতবাদ মূর্ত্তিপূজাকে প্রশ্রয় দেয়। রামমোহন হুবহু শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন কি না বলা যথেষ্ট শক্ত হইলেও রামমোহন যেমন ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তা ও সংশয়বাদ প্রচার করিয়া, তটস্থ-লক্ষণের প্রতি জোর দিয়া উপাসনাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, - এমন কি, জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন,—অথচ তৎসঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্য করিয়াই মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়াছেন, যাহা আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার যুগধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে পারিয়া উঠেন নাই। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথ বৈদান্তিক অদ্বৈতমতকে দূর করিয়া নিরাকার সগুণব্রহ্মের উপাসনা ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজ অথবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সাধনাঙ্গের সচ্চিদানন্দবিগ্রহাদির ও তাহার মৃন্ময় মূর্ত্তিপূজার নিরসনকল্পে, তেমন কোন সঙ্গত মীমাংসা দিতে পারেন নাই।

যদি রামমোহনের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার সকলদিক্ হইতে সমালোচনার উর্দ্ধে নহে, তথাপি চ রামমোহনের সহিত তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার কি মৌলি-

কতার দিক্ হইতে, কি তত্ত্ববিচারের দিক্ হইতে, কি সাধনাঙ্গের দিক্ হইতে, কি ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচারের দিক্ হইতে, কি যুগপ্রয়োজনের দিক্ হইতে, সমস্ত বিষয়েই নিকৃষ্ট বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রামমোহন যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়াছেন,—দেবেন্দ্রনাথ সে ভূমির অতি নিম্নস্থানে গিয়াও পৌঁছিতে পারেন নাই। কাজেই তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের মূর্ত্তিপূজার অস্বীকার সমস্ত দিক্ হইতেই দুর্ব্বল, নিষ্প্রভ ও অক্ষম এবং অক্ষম বলিয়াই সমস্ত সংস্কারযুগ ভরিয়া ইহা এমন ব্যর্থ হইয়াছে।

ডফ্ প্রভৃতি পাদ্রীগণ

রাজা রামমোহন যে বৎসর বিলাত গমন করেন, সেই বৎসরই পাদ্রী আলেক্জাণ্ডার ডফ্ কলিকাতায় আসেন। রামমোহন ডফ্কে উৎসাহ দিয়া, তাঁহার স্কুলের বাড়ী ঠিক করিয়া দিয়া বিলাত যান। ইহার ১৪ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের সহিত পাদ্রী ডফের বেদান্ত লইয়া যুদ্ধ হয়। ডফ্ বেদান্ত-মতকে আক্রমণ করেন,—তত্ত্ববোধিনী বেদান্তমত সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁহার স্ত্রীকে জোর করিয়া খৃষ্টান করা ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্যোগী হইয়া খৃষ্টান হওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। সুতরাং আমাদের সংস্কারযুগে খৃষ্টান পাদ্রীদের সহিত এই বিরোধ বিশেষরূপে স্মরণীয় ঘটনা। ডফ্ এবং তাঁহার স্কচ্ মিশন এ দেশে শুধু শিক্ষা-বিস্তার করিবার জন্য আসে নাই; শিক্ষা বিস্তারকে উপায়স্বরূপমাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার করা; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু ডফ্ দেখিলেন যে, অন্ততঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে খৃষ্টান করার পথে ব্রাহ্মসমাজ এক প্রবল বিঘ্নস্বরূপ। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমত অনেকটা রাজা রামমোহনের বেদান্তমতেরই অনুরূপ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের হস্তে তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং ডফ্ ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতে যাইয়া অদ্বৈত বেদান্তমতকেই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। তা ছাড়া ডফ্ প্রভৃতি বুঝিয়াছিলেন যে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাজাত্যবোধ জাগিবেই জাগিবে, এবং যখন বেদান্তমত ইহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটা প্রবল মত বর্ত্তমান এবং পৌত্তলিকতা যতই অসভ্য মনুষ্যের ধর্ম্ম হউক, তাহার সঙ্গে এই বেদান্তমত যখন সংশ্লিষ্ট এবং এই বেদান্তমত যখন নিতান্ত বর্ব্বরদের মতবাদ নহে, তখন শিক্ষিত এবং স্বাজাত্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ বাঙ্গালী একদিন নিশ্চয়ই বেদান্তমতের দিকে আকৃষ্ট হইবে। সুতরাং যাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া,

অন্যের দেশে আসিয়া, তাহাদের ধর্ম্মকে গালি দিয়া নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রয়াসী,—তাঁহারা যে এই সমস্ত বিষয় ভাবেন নাই, তাহা সম্ভব নয়।

যাহা হউক, ডফ্ বলিলেন যে, বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম নিজের চৈতন্য সম্বন্ধে নিজে অজ্ঞান। আর এই নির্গুণ ব্রহ্মের কোনরূপ ধারণা আমাদের মনে হইতে পারে না। কেন না, বস্তুতঃ এই নির্গুণ ব্রহ্মের কোন অস্তিত্বই নাই। নির্গুণ ব্রহ্ম ত এইরূপে মারা গেলেন! তার পর ব্রহ্ম মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ সেই মায়া প্রপঞ্চময় মিথ্যা। সুতরাং এই জগতের কোন অস্তিত্বই নাই। জগৎও গেল! আবার তার পর বেদান্তমতে কোন নীতির স্থান নাই। সুতরাং এই মতের পরিপোষকগণ কোন উন্নত নীতির অভাবে কোনরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবনযাপনে নিতান্তই অসমর্থ। সুতরাং নীতিও গেল!

ডফের এই সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী কতকগুলি ইংরাজী প্রবন্ধে বেদান্তমত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলেন। ১৮৪৪—৪৫ খৃঃ তত্ত্ব-বোধিনীতে এইরূপে বেদান্ত-সমর্থনের পক্ষপাতী যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ ছাপা হইল—Vedantic Doctrines Vindicated" ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনীর এই বেদান্ত-যুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কারযুগের ইতিহাসে বিস্মৃত হইবার ঘটনা নহে। তথাপি ইহার মৌলিকত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কেন না, ইহা সর্ব্বাংশেই ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের সহিত শ্রীরামপুরের ক্যারী, মার্শম্যান প্রভৃতি পাদ্রীদের বেদান্ত-যুদ্ধের হুবহু দ্বিতীয় সংস্করণ বা অন্ধ অনুকরণমাত্র।

যাহা হউক, সকলের আগে বিবেচ্য এই যে, "Vedantic Doctrines Vindicated" কাহার রচনা? ঘোরালো-প্যাঁচালোরকমের ছেঁদো-কথায় এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার কোন সুসঙ্গত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ বিষয়ে একটি মত আছে। তিনি বলেন যে, ইহা দেবেন্দ্রনাথ ও রাজ-নারায়ণ বসু এই উভয়ের রচনা। কিন্তু এই মতের প্রতিবাদ হইয়াছে। প্রতি-বাদকারীর উত্তর হইতেছে যে, "তানসেন তখন জন্মায়িক মোটে!" অর্থাৎ রাজনারায়ণ বসু তখন ব্রাহ্মসমাজে আসেনই নাই। ১৮৪৫ খৃঃ রাজ-নারায়ণ বসু ব্রাহ্মসমাজে আসেন, এবং ১৮৪৬ খৃঃ তিনি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। কাজেই Vedantic Doctrines Vindicated রাজনারায়ণ বসুর লেখা হইতে পারে না। সংস্কারযুগের ইতিহাসলেখকদের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মহাশয়ের মত দায়িত্ববোধহীন লেখক আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কি না, তাহা আমি জানি না। কিন্তু তথাপি প্রতিবাদকারীর সমস্ত যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করাও একটু দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়াই আমি মনে করি।

এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসলেখক লিওনার্ড সাহেবের আবার একটি মত আছে। লিওনার্ড সাহেব বলেন যে, Vedantic Doct riues Vindicated চন্দ্রশেখর দেবের রচনা। প্রতিবাদকারী বলেন যে, চন্দ্রশেখর দেবের রচনাই ঠিক। তবে লিওনার্ড সাহেব যে বলিয়াছেন শুধু একা চন্দ্রশেখর দেবের রচনা, তাহা ঠিক নয়। দেবেন্দ্রনাথেরও ইহাতে হস্ত আছে। দেবেন্দ্রনাথই চন্দ্রশেখর দেবের দ্বারা ইহা লেখাইয়া তত্ত্ববোধিনীতে ছাপাইয়াছেন। কারণ? এই যে এই সমস্ত প্রবন্ধে উপনিষদের শ্লোকের এত বেশী বাহুল্য দেখা যায় যে, এক দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন ঐ সমস্ত শ্লোকাদি আর কেহ বাছিয়া দিতে সমর্থ ছিলেন না। প্রতিবাদকারীর ইহাই যুক্তি। অবশ্য, এ বিষয়ে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণই নাই। যাহা আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

লিওনার্ড সাহেব যে ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলেই যে কেহ জানিতে পারেন যে, ইহার মালমসলা সমস্তই রাজনারায়ণ বাবু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথই রাজনারায়ণ বাবুকে দিয়াই এই সমস্ত মালা-মসলা লিওনার্ড সাহেবকে সংগ্রহ করিয়া দিয়া এই ইতিহাসগ্রন্থ লেখাইবার "অদৃশ্য কারণ" হইয়াছিলেন। "দৃশ্য কারণ" হইতে দেবেন্দ্রনাথের কি অন্তরায় ছিল, তাহা আমরা জানি না। অনেকে বলেন, নিজের নাম জাহির না করিবার একটা ইচ্ছা বরাবরই তাঁহার মধ্যে ছিল। হইতে পারে। লিওনার্ড সাহেবের এই ইতিহাসগ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ,—কুচবিহার-বিবাহ প্রভৃতিতে কৈশবদিগকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছে—তাহা লিওনার্ড সাহেব সম্ভবতঃ নিজের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকিলেও এই গ্রন্থ লেখায় যে দেবেন্দ্রনাথের কোন যোগ আছে,—নানাদিক্ বুঝিয়া সুজিয়া, হয় ত ইচ্ছা করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে নিজের নাম জাহির করিতে চান নাই।—এখন প্রশ্ন এই যে—যদি Vedantic Doctrines Vindicated প্রবন্ধগুলিতে দেবেন্দ্রনাথের কোন হস্ত থাকিত, তবে লিওনার্ড সাহেব তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইবেন, ইহা কি সম্ভব? এবং ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও কি লিওনার্ড সাহেবকে সতর্ক ও স্মরণ করাইয়া দিবার লোকের অভাব হইত? স্বয়ং রাজনারায়ণ বাবু যে এই গ্রন্থের মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের মীমাংসা এই যে, Vedantic Doctrines Vindicated প্রবন্ধাদিতে দেবেন্দ্রনাথের কোন হস্ত ছিল না। যদি থাকিত,

তবে লিওনার্ড সাহেব তাহা উল্লেখ করিতে বিরত থাকিতেন না। কিন্তু লিওনার্ড সাহেব একা চন্দ্রশেখর দেবকেই Vedantic Doctrines Vindicated গ্রন্থের রচয়িতা বলিলে কি হইবে? প্রতিবাদকারী বলেন যে, চন্দ্রশেখর দেবই ঐ সমস্ত প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন—তবে কথা এই, দেবেন্দ্রনাথই চন্দ্রশেখর বাবুকে দিয়া উহা লেখাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে কোন রকমে জুড়িয়া দিতেই হইবে। কেন না, 'গরজ বড় বালাই'। প্রতিবাদকারীর যুক্তি এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন ঐ সকল প্রবন্ধে উপনিষদ হইতে এত শ্লোক উদ্ধার করা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না।

আমরা এই যুক্তির অসারতা এখনি দেখাইতেছি। ডফ্ যে ১৮৪৪—৪৫ খৃঃ বেদান্তকে আক্রমণ করেন, তাহা ১৮২০ খৃঃ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের অনুকরণ করিয়া, এবং তত্ত্ববোধিনী যে বেদান্তকে সমর্থন করেন, তাহাও ১৮২০ খৃঃ রাজা রামমোহন রায়ের Brahmanical Magazine অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিয়া, এবং রাজা রামমোহন যে দিন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের আক্রমণ হইতে বেদান্তকে সমর্থন করিয়াছিলেন, সে দিন চন্দ্রশেখর দেব, দেবেন্দ্রনাথের মত মাতৃক্রোড়শায়ী ৩ বৎসরের শিশু ছিলেন না। পাদ্রীদের সহিত রামমোহনের সেই ভীষণ প্রথম বেদান্ত-যুদ্ধে চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ Brahmanical Magazine NoIIIর যখন তৃতীয় সংস্করণ হয়, তখন চন্দ্রশেখর দেব তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। রামমোহনের বেদান্ত-যুদ্ধের ২৫ বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী যখন ডফের আক্রমণের বিরুদ্ধে Brahmanical Magazineকে হুবহু তুলিয়া ধরিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলন,তখন সেই সমস্ত লেখা ও সমর্থন দেবেন্দ্রনাথের আবিষ্কার না ভাবিয়া, চন্দ্রশেখর দেব দ্বারা রামমোহনের যুক্তির অনুসরণ মনে করিবার কারণই অধিকতর প্রবল বলিয়া আমাদের ধারণা। প্রতিবাদকারী বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই তখন ঐরূপ উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করিতে পারিত না। কাজেই লিওনার্ড সাহেব একা চন্দ্রশেখর দেবকেই রচয়িতা বলিলে কি হয়, দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন ইহা সম্ভব হইত না। অর্থাৎ একা চন্দ্রশেখর দেবের ইহা সাধ্য ছিল না। এখানে চন্দ্রশেখর বাবুর অক্ষমতার সহিত দেবেন্দ্রনাথের যোগ্যতার এমন এক তুলনামূলক বিচার প্রতিবাদকারী পরোক্ষে করিয়াছেন যে, যাঁহারা গত শতাব্দীর খ্রীষ্টান সংঘর্ষণজনিত সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারাই নিঃসন্দেহে বলিতে সক্ষম হইবেন যে, বেদান্তমত লইয়া উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চন্দ্রশেখর দেব এবং দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে কে অধিকতর যোগ্য।

কি ঐতিহাসিক প্রমাণের দিক্ দিয়া, কি যুক্তির:দিক দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে আনিয়া চন্দ্রশেখর দেবের সহিত জুড়িয়া দিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না,

এবং প্রতিবাদকারীও দেখাইতে পারেন না, অথচ এ বিষয়ে তাঁহার ব্যর্থ প্রয়াসকে একাধিক কারণে আমরা প্রতিবাদ করা সঙ্গত বিবেচনা করি। কেন না, অধুনাতন এক শ্রেণীর লেখকদিগের এইরূপ প্রয়াস হইতেই সংস্কারযুগের প্রায় প্রত্যেক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা--নিজের সত্যরূপ বদলাইয়া সংশয়-কুহেলিকা বা মিথ্যার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সাহিত্যের আসরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এইরূপ নীচজনোচিত হীন প্রয়াসে সাহিত্যের কোন কোন অংশ যে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুতরাং আমরা প্রমাণ করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, দেবেন্দ্রনাথ Veda tic Doctrines Vindicated গ্রন্থে তাঁহার নিজের কোন আবিষ্কার, যুক্তি বা শ্লোকোদ্ধার পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া যে মতবাদ, তাহার মূলে কোন সত্য নাই; কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; কোন যুক্তি নাই। স্বকপোলকল্পিত খেয়াল থাকিতে পারে। এইরূপ খেয়ালে হেঁয়ালী কবিতার মেয়েলী সমালোচনা যত সহজে চলে,—ইতিহাস লেখা তত সহজে চলে না। অন্ততঃ সেরূপ চলিতে দিতে আমাদিগের কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে।

তবে Vedantic Doctrines Vindicated এর সহিত দেবেন্দ্রনাথের আন্তরিক সহানুভূতি থাকিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

কিন্তু ১৮৪৪—৪৫ খৃঃ ডফের সহিত তত্ত্ববোধিনীর বেদান্ত-যুদ্ধে নূতনত্ব কিছুই নাই। ১৮২০-২১ খৃঃ শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের সহিত রাজা রামমোহনের বেদান্ত-যুদ্ধের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। অথচ রাজা রামমোহন যে উন্নত উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এবং খ্রীষ্টানধর্ম্মকে সমালোচনা করিয়াছিলেন, রামমোহনের পরে—২৫ বৎসর পরে,—দেবেন্দ্রনাথ নিজে বা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ বা তত্ত্ববোধিনী সেই উন্নত ভূমির কোন খবরই রাখিতেন না। রামমোহন যেমন শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের প্রস্তাবিত খৃষ্টান-ধর্ম্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—তেমনি আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে The Precepts of Jesus Guide to peace and happiness'ও লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনীর সেরূপ কিছু করিবার ক্ষমতা বা স্পৃহা ছিল না। যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনকে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে খৃষ্টান বা পাদ্রী-বিদ্বেষ, তাহা সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতা দ্বারকানাথের নিকট হইতে বংশানুক্রমে লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার কোন সাদৃশ্যই ছিল না, এবং ছিল না

বলিয়াই উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথের এই খৃষ্ট-বিদ্বেষ ক্রমে খৃষ্ট-বিভীষিকায় পরিণত হয়, এবং এই খৃষ্ট-বিভীষিকার জনাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিরোধ এত গুরুতর হয়, এবং কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি সমস্ত সংস্কারযুগ ভরিয়া এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত 'অচলায়তনের' মত পড়িয়া থাকেন। ইতিহাস এই অপ্রিয় সত্য মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

যাহারা উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁহার বালিকা স্ত্রীর খৃষ্টান হওয়া ব্যাপারে, তদ্বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম দেখিয়া তাঁহার স্বাজাত্যবোধের শ্লাঘা করেন এবং সংস্কারযুগে ইহার অতি বড় প্রয়োজনীয়তার উপর আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন এবং রামমোহন-প্রতিদ্বন্দ্বী মূর্ত্তিপূজার সমর্থনকারী স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহার সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হন যে, ইহা রামমোহনকে অনুসরণ নহে, রামমোহন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিপরীত পথে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপ মাত্র। এই ব্যাপারে রামমোহনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বাহ্য সাদৃশ্য যত না চক্ষে পড়ে, আভ্যন্তরিক আদর্শের মারাত্মক বিরোধ তত বেশী আমাদের দৃষ্টিকে ক্ষুব্ধ করে। রামমোহনের অনুবর্ত্তী দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ২৫ বৎসর পরে, দ্বিতীয় 'খৃষ্টান-সংঘাতের' দিনে নিশ্চিতই রামমোহনের মর্য্যাদাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের মর্য্যাদার লাঘব করিয়াছেন। কেন? স্যার রাজা রাধাকান্তের আনুগত্যস্বীকার তাহার কারণ নয়। তাহার কারণ রামমোহনের ধর্ম্মানুভূতির সার্ব্বভৌমিকতা না বুঝিবার অপরাধ। তাহার কারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এ যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী খৃষ্টানধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিতান্ত সাম্প্রদায়িক ও অনুদার ভাবপ্রকাশ।

যদি এ কথা সত্যই হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের 'গদীই' পাইয়াছিলেন,—তবে এ কথাও মিথ্যা নয় যে, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সংস্কার-কার্য্যের প্রত্যেক ঘটনায় রামমোহন-প্রবর্ত্তিত সংস্কারকে না বুঝিতে পারিয়া, তাহা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্টতর সংস্কারের পথে,—রামমোহনের আরব্ধ সংস্কারকে টানিয়া আনিয়া রামমোহনের গদীকে অপমান করিয়াছেন। রামমোহনের গদীর অপমানের অপরাধে বাঙ্গালীর বিগত শতাব্দীর সংস্কারযুগ কি পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে,— কে বলিতে পারে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

মহিসুর-ভ্রমণ

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা টাটা-ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে মঠের দিকে যাত্রা করিলাম; মঠে আসিলে সমস্ত শুনিয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং মহিসুর যাত্রা করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। ইতোমধ্যে বাঙ্গালোরস্থ প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে মঠের নিকটেই একটি মন্দির অবস্থিত। পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; মন্দিরটি ৩।৪ শত বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন হইবে না। পর্ব্বতটি কাটিবার ও গর্ভগৃহের নির্ম্মাণ-কৌশল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদক্ষিণা বা circumnabulatory passage দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা তত প্রাচীন নহে। ইহার চারিদিক্ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ; দ্বারদেশ অতিক্রম করিলে তিনটি বিশাল স্তম্ভ নয়নগোচর হয়; এক একটি প্রস্তর কাটিয়া ইহাদিগকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; ইংরাজী ভাষায় ইহাকে monoleth বলে; স্তম্ভগুলির উপরাংশে যথাক্রমে চক্র, ডমরু ও ত্রিশূল খোদিত করা হইয়াছে। চক্রের নির্ম্মাণে বেশ শিল্প-কৌশল আছে; ইহাকে যেন দুইটি বৃক্ষের উপর সুন্দরভাবে স্থাপিত করা হইয়াছে।

এ দেশে শৈব ও বৈষ্ণবে বিশেষ মনোমালিন্য; কিন্তু এ মন্দিরে শৈব ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এমন বিচিত্র সংমিশ্রণের কারণ একটু চিন্তা করিবার বিষয়। আমার বোধ হয়, মহিসুরে যখন মারাঠা-অভ্যুদয় হয়, তখনই এ মিলন সংঘটিত হইয়াছিল; মারাঠারা শৈব এবং এ দেশ বৈষ্ণবপ্রধান; সুতরাং এ প্রকার মিলন না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

মন্দিরের গর্ভ-গৃহের বামদিকে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ রহিয়াছে; ইহা অন্ধকার-ময় ও দূষিত-বাষ্পপূর্ণ; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ইহার মধ্যে শৃঙ্গী ঋষির প্রতিমা রহিয়াছে; ইহাতে কৌতূহলের উদ্রেক হইল। স্বামীজীর উপদেশানুসারে সঙ্গে মোমবাতি আনিয়াছিলাম; তাহা জ্বালিয়া আমরা দুই জনে প্রথমে কুঁজা হইয়া পরে প্রায় হাঁটু গাড়িয়া প্রবেশ করিলাম। সুড়ঙ্গের ধার দিয়া জল ঝির ঝির করিয়া বহিতেছে; ইহার ভিত্তিতে আরসুলা যথেষ্ট রহিয়াছে দেখা গেল; মূষিক ও ছুঁচা আলোকের জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া বাহির হইয়া

পড়িল; শৃঙ্গী ঋষির মূর্ত্তি দেখিলাম। ইহা এক বিচিত্র মূর্ত্তি; আমি ত ভারতের কোথাও এরূপ মূর্ত্তি দেখি নাই; মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান; ইহার পদ তিনটি; দক্ষিণ দিকে চারিটি হস্ত এবং বামে তিনটি; ইহার দুইটি মস্তক এবং প্রত্যেক মস্তকে দুটি করিয়া শৃঙ্গ বর্ত্তমান। দক্ষিণ হস্তে দর্পণ, কুমুদকোরক, অক্ষমালা এবং পদ্ম রহিয়াছে; বামদিকস্থ হস্তে চক্র, গদা এবং জ্বালাদ্যোতক গোলাকার পদার্থ রহিয়াছে; গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা দোদুল্যমান, পদে নূপুর, হস্তে বলয়। আমার বোধ হয়, ইহা শিবের অনুচর ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি। দাক্ষিণাত্যে শিবভৃত্য ভৃঙ্গীর আর এক নাম শৃঙ্গী এবং সচরাচর ইহার শৃঙ্গ দৃষ্ট হয়।

এ মূর্ত্তিটির পূজা হয়; ইহার মস্তকের উপরে কীর্ত্তিমুখ মূর্ত্তি খোদিত; আমার সঙ্গে সর্ব্বদা গজকাঠী বা Footrule থাকে। মূর্ত্তিটির অঙ্গ-পরিমাণ মাপিয়া দেখিলাম যে, উহার মস্তকের সহিত সমস্ত দেহের অনুপাত ১:৭, অর্থাৎ ইহা একটি সপ্ততাল মূর্ত্তি। স্থূলতঃ বলিতে গেলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্রমতে দেবদেবীর সপ্ততাল মূর্ত্তি প্রশস্ত। শুক্রাচার্য্যও শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, কলিযুগে সপ্ততাল মূর্ত্তিই প্রশস্ত। * এই মূর্ত্তির স্তনান্তরের ব্যবধান সমস্তদেহের $\frac{১}{৭}$ অংশ। ইহাও শুক্রাচার্য্য-সম্মত। শুক্রনীতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে যে—"তালমানং স্তনান্তরম্।"

যাহা হউক, মূর্ত্তিটি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম; আরও অগ্রসর হইয়া কতকগুলি মূর্ত্তির শ্রেণী দেখিলাম; স্বামীজী ত মূর্ত্তিগুলি চিনিতে পারিলেন না। আমি বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে, সপ্তমাতৃকা ভিন্ন ইহারা আর কিছুই নহে; কিন্তু যাজপুরের মূর্ত্তিগুলির যে ক্রম ও নির্ম্মাণ-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি, ইহাতে সেরূপ দেখিলাম না; শিল্প হিসাবে এগুলি অতিশয় মনোজ্ঞ। পুরাণে এ মূর্ত্তিগুলির যে বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, ইহাদের সহিত কয়েকটির বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই। আয়ুধগুলি এবং এমন কি, কোন কোন মূর্ত্তির বাহনগুলি ভিন্ন প্রকারের। এ সম্বন্ধে আমার একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। বারাহীমূর্ত্তিটি উপলক্ষ করিয়া আমার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটি বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মূর্ত্তিটি এখানে বরাহবক্ত্রা, আসীনা, চতুর্হস্তা; দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের একটিতে পরশু, আর একটি অভয়মুদ্রাব্যঞ্জক; বাম হস্তদ্বয়ের একটিতে গদা, আর একটি বরদজ্ঞাপক। বাহনস্বরূপ ইহার আসনে হংস বা ময়ূর-মূর্ত্তি খোদিত। এ প্রকার বৈচিত্র্য আমি কোথাও সন্দর্শন করি নাই বা কোন

---

* দশতালা কৃতযুগে ত্রেতায়াং নবতালিকা।
অষ্টতালা দ্বাপরে তু সপ্ততালা কলৌ স্মৃতা॥
শুক্রনীতি ৪র্থ অধ্যায় ৮১ শ্লোক।

পুরাণ বা তন্ত্রে পাঠ করি নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যে দেবের যে রূপ, তাঁহার শক্তিও মাতৃকারূপে সেই রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে লিখিত আছে যে, শ্রীহরি যে রূপে যজ্ঞবারাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তিও সেই রূপ ধারণ করিলেন। অতএব বারাহী মূর্ত্তি দশাবতারের অন্যতম বরাহমূর্ত্তির সদৃশ হওয়া উচিত। বরাহমূর্ত্তির আয়ুধ যে পরশু, আমি কোথাও তাহা পাঠ করি নাই। অগ্নিপুরাণে স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে যে, বরাহমূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ ও চক্র বিরাজমান, যথা—

"স তাড্যমানোঽতিবলৈর্দৈত্যৈঃ সন্নায়ুধোদ্যতৈঃ।
ন চচাল বরাহস্তু মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ॥
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ শঙ্খচক্রধরো হরিঃ।
ব্যবৰ্দ্ধত স বেগেন ব্যাপ্নুবন্ সর্ব্বতো দিশম্॥"

অগ্নিপুরাণের আর এক স্থলে উল্লেখ আছে—

"বারাহরূপিণং দেবং স্থিতং পুরুষবিগ্রহম্।
শঙ্খচক্রোদ্যতকরং দেবানামার্ত্তিনাশনম্॥"

দাক্ষিণাত্যে বারাহী মূর্ত্তির হস্তে হল এবং শক্তি দৃষ্ট হয় এবং ইহার বাহন হস্তী। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে বারাহীর ৬টি হস্তের উল্লেখ আছে; ইহার মধ্যে চারিটি হস্তে দণ্ড, খড়্গ, খেটক এবং পাশ বর্ত্তমান, এবং আর দুইটি হস্ত বরাভয়-ব্যঞ্জক। বিশ্বকর্ম্মশিল্পে বারাহীর দুই হস্তে শঙ্খ, চক্র এবং আর দুইটি হস্ত বর ও অভয়প্রদ উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহার বাহন মহিষ—"মহিষধ্বজবাহিনীম্।"

উপর্য্যুক্ত বচনগুলি হইতে বুঝা গেল যে, মূর্ত্তিপরিচয় ব্যাপারটি কত কঠিন; প্রায় সার্দ্ধচারি বৎসর পূর্ব্বে বিচারপতি উড্রফ্ মহোদয় মূর্ত্তিবিদ্যা বা Iconography সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিবার সময় সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, মূর্ত্তি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে যেন সহসা উপস্থিত হইবার চেষ্টা না করি; বিষয়টি বড় জটিল ও আয়ত্ত করা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। মূর্ত্তিপরিচয়জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। যে বিদ্যার প্রয়োজন, আমি ত সে রকম পণ্ডিত একজনও দেখি নাই, আছে কি না সন্দেহ; আমিও এতদিনে এ বিদ্যার বিশেষ কিছুই আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

বাঙ্গালোর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বামীজীরা লালবাগ উদ্যান দেখিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। লালবাগকে আমাদের বাঙ্গালাদেশস্থ শিবপুর ও আলিপুরের উদ্যানের মিশ্রণ বলা যাইতে পারে; ইহা একাধারে এখানকার পশুশালা ও বোটানিকাল উদ্যান; ইহার পুষ্পবৃক্ষের সারি ও লোহিত-কঙ্কর-নির্ম্মিত পথগুলি অতিশয় মনোজ্ঞ; আলিপুরের উদ্যান ও ইডেন্ গার্ডেন্‌স্ অপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; শিবপুর উদ্যানের বিশালতা ও উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য না থাকিলেও ইহার সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষত্ব আছে যাহা অন্যস্থানেই দেখিয়াছি; এত প্রকারের পুষ্পবৃক্ষ আমার বোধ হয় শিবপুরে নাই; এখানকার জল-বায়ু উদ্ভিদ্-বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী; এখানে চীন, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি সকল স্থানেরই উদ্ভিদ রহিয়াছে।

এই উদ্যানে অনেক প্রকারের পশু আছে; আলিপুর পশুশালার তুলনায় ইহা অবশ্য অতিশয় নগণ্য। এখানকার অর্কিড্ রুম্ দেখিবার জিনিষ। ইহার ভিতর বেশ শীতল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাজমহল

(১)

নহ নহ তুমি পাষাণের স্তূপ
হে তাজমহল! তুমি নহ প্রাণহীন,
তোমার নীলিমা-রাশি আনন্দ-স্বরূপ
কহে কথা গাহে গান অনন্ত নবীন।
যে গান ফুটিয়াছিল বিক্ষুব্ধ ব্যথায়
মূর্ত্তি ধরি' তার এই জগতের চোখে
সুখে দুখে জীবনের সকল চিন্তায়
উঠিয়াছ ফুটি' তুমি অদম্য পুলকে।

সীমাহীন ভালবাসা মানবের বুকে
তারি এক সুরে গাঁথি' জীবন্ত প্রতিমা
তোমারে গড়েছে কবি; বাজে বিশ্ব-বীণা
তার মাঝে মৌন তুমি গৌরব-আলোকে
দেখাইছ মানবের মর্ম্মতল খুলি'
যেথায় প্রশান্ত সব বিশ্বের কাকলি।

[২]

ভাষাহীন গান তব মৌন তব বাণী
হে রূপসী! ধনেশ্বরী! অনন্ত-যৌবনা!
প্রতি পাষাণেতে তব ব্যাকুল পরাণি
সংগোপিত মানবের অনন্ত কামনা;
প্রতি গৃহকোণে তার বিরহ-বেদন
কেঁদে কেঁদে উঠিতেছে প্রতি হর্ম্ম্যতল
সিক্ত করিতেছে তার ক্ষুব্ধ আঁখিজল
প্রতি সোপানেতে শুনি' নূপুর-গুঞ্জন।
তব প্রতি চূড়া হ'তে ভীম দীর্ঘশ্বাস
সহস্র কল্পনামাঝে যেতেছে মিলায়ে
কোন্ ঊর্দ্ধ স্বপ্নলোকে—কিসের আশ্বাস
তোমার সমাধিতলে রয়েছে লুকায়ে;—
নিবিড় বিরহমাঝে বিরাট মিলন
তব প্রতি প্রস্তরেতে রয়েছে লেপন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
